# জীবন অধ্যয়ন

শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক—
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার
২২৭।১, আপাব সারকুলার রোড
কলিকাতা-৪

প্রথম সংস্করণ

দাম তিন টাকা

শ্রীবিমলেন্দ্রনাথ চৌধুরী
কর্তৃক
২২৭।১, আপার সাবকুলাব রোড
এ্যাসোসিয়েটেড প্রিণ্টার্স হইতে
মুদ্রিত।

# উৎসর্গ

ছোট বোন বীণাকে আর তার সঙ্গে বিগত দিনের সেই
সব ছেলে মেয়েদের যারা দেশকে স্বাধীন করবার,
দুর্গত মানুষের দুঃখভার লাঘব করবার দুর্বার
আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একদিন এগিয়ে গিয়েছিল
সংগ্রামের পথে, সর্বস্ব ত্যাগের পথে,
মৃত্যু বরণের পথে।

যারা দুর্গম পথে চলতে গিয়ে কোন দিন পিছিয়ে
পড়ে নি, মরণের সামনে দাঁড়িয়েও শঙ্কিত হয় নি,
তাদের সকলকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম এই
বইয়ের ভিতর দিয়ে।

# ভূমিকা

বইটীর প্রথম দিকটার "কারাকাহিনী" মন্দিরার প্রথম দিকের কয়েকটী সংখ্যায় বার হয়েছিল। সেই বোধহয় প্রথম ছাপা অক্ষরে বার হয়েছিল আমার অপটু হাতের লেখা। এর সঙ্গে আরও কিছু সংযুক্ত করা হয়েছে।

বই ছাপানর মতন সাহস কোন দিনই ছিল না। সহোদর প্রতিম বিশ্বনাথ ও স্নেহের ভাই অমল অনেক বছর থেকে উৎসাহ দিয়ে আসছে—অনুরোধ করে আসছে—কারাগৃহের অভিজ্ঞতাগুলি যেন বই করে ছাপাই। পিতৃদেবেরও একান্ত ইচ্ছা আমার লেখা একটি বই যেন তিনি দেখে যেতে পারেন।

সেদিন বহুবৎসরের সহকর্মী শোভারাণী দীর্ঘ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করে চির শান্তি লাভ করেছে। পুলিশের অত্যাচারের চিহ্ন সমস্ত শরীরে বহন করে পক্ষাঘাতের যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে শয্যাশায়ী হয়েছিল অনেক বছর। গেলেই হাত দুটি ধরে হাসি মুখে গল্প করত। অনেকবার বলত—"কল্যাণী যে সব ছেলে মেয়েরা স্বাধীনতার জন্য সব দিয়েছে তাদের পরিবার আজ খেতে পাচ্ছেনা—দারিদ্র্যের পীড়নে শেষ হয়ে যাচ্ছে—তাদের জন্য দেশ'ত তেমন কিছু করল না—তাদের কথা দেশের ছেলে মেয়েরা কিছুই জানল না। আমি ভাল হয়ে উঠি—দুজনে মিলে একটা বই লিখে যাব—যাতে এঁদের জীবন ইতিহাস ছেলে মেয়েরা পড়তে পারে, জানতে পারে'—বন্ধুর আর ভাল হয়ে ওঠা হল'না।

মানুষ আমরা—ভাল ও মন্দে ভরা—মলিনতার ম্লান উজ্জ্বলতার ভাস্বর এই আমাদের মানব জীবন। এই জীবনই অধ্যয়ন করতে করতে চলেছি আমরা।

কারাগৃহে ও বাইরের কর্ম্মজীবনে ও চলার পথে জীবন—অধ্যয়নের মহাসুযোগ লাভ করেছি ও নিজেকে ধন্য মনে করেছি। সব জীবন-স্মৃতি থেকে সঞ্চয়ন করে যেটুকু রাখতে পেরেছি তাই রইল বাকি জীবনের অমূল্য পাথেয় হয়ে।

এই জীবন-অধ্যয়ন কিছুমাত্রও সার্থক হোক আমাদের জীবনে—জাতির জীবনে—এই প্রার্থনা।

৺বিপ্লবী দীনেশচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার নিজে থেকে আগ্রহ প্রকাশ করে নিয়ে গেলেন আমার এই লেখাগুলি ছাপাবেন বলে। সমস্ত দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছে অশেষ ঋণী হয়ে রইলাম।

পরিশেষে এই বইয়ের লেখায় যা কিছু ভুল ত্রুটি রয়ে গেল তার জন্য সকলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি।

কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য্য) বীণা দাসের দিদি, কিন্তু সেই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয় এই সত্যটি আমাদের মেয়েদের জীবনে যে যুগে প্রতিভাত হ'ল তখন আচার্য্য বেণীমাধব দাসের দুই কন্যাকে অগ্রণী রূপেই পেয়েছি। শুধু পুরুষই দাম দেবে কেন? মেয়েদেরও দিতে হবে—তাদেরও এক্ষেত্রে 'সমান অধিকার—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নগর সঙ্কীর্ত্তন থেকে এঁরা কি সেই সাম্য মন্ত্র শিখেছিলেন? ১৯২১ আন্দোলনের সময় এঁরা ইস্কুলের মেয়ে। কিন্তু কলেজে উঠেই জানান দিয়েছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা পুরুষ থেকে একটুও পিছপাও নন। ছোট বোন-টিকে নিয়ে কল্যাণী কত পরীক্ষার ভিতর দিয়েই গেছেন। কিছু তার পরিচয় পেয়েছি বীণার লেখায়; এবার অনেক নূতন তথ্য পেলাম কল্যাণীর "জীবন অধ্যয়নে"। সার্থক নামকরণ হয়েছে বইখানির: জীবনটা নিয়েই পরীক্ষা চলেছিল—মরণ-পথের যাত্রীনীদের মধ্যে। শুধু এঁরা চোখ দিয়েই দেখেন নি বুক দিয়েই অনুভব করেছেন স্বাধীনতার উদ্দাম আহ্বান।—তার কাছে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া স্নেহ ভালবাসা—এমনকি মা বাবারও স্নেহ কোল—যেন ঝাপসা হয়ে গেল—কী দুর্ব্বার এ প্রেরণা! সর্ব্বস্ব ত্যাগের পথে মৃত্যু-বরণের পথেই এঁরা নেমেছিলেন; তার ধারাবাহিক বিবৃতি দেবার সময় হয়ত এখনও আসেনি। তবু ঐতিহাসিক তাগিদেই আমি এঁদের লেখা পড়ি। মামুলী কাটামো দূরে ফেলে ভারতের তথা সারা এসিয়ার মুক্তি ইতিহাস যেন এক নূতন মোহনায় দেখা দিল—যখন নারী সজাগ হয়ে পুরুষের সঙ্গে মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপ দিলেন; হয়ত বিশ্বের অকাট্য নিয়মে, হয়ত শিক্ষার প্রভাবে মেয়েরা নেমেছিলেন।

কিন্তু কল্যাণীর বইখানিতে পাই আর এক তথ্য; অতি সাধারণ অশিক্ষিতা নারীদের অবদানও এক্ষেত্রে কম নয়। বাঙালী অবাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলমান—কত সামাজিক স্তরের নারী এই জেলের পটভূমিকায় ফুটে উঠেছে—দেখে বিস্মিত হয়েছি। শুধু গ্রন্থ রচনার নৈপুণ্যে নয়। বুকের রক্ত দিয়ে যেন কল্যাণী এই সব ভুলে-যাওয়া নাম-হারা মেয়েদের কাহিনী রচনা করেছেন। পড়তে সুরু করে থামা যায় না। এতকাল থেকে যে মেয়েদের দেখে এসেছি তাদের সেই পরিচিত সাধারণ মূর্ত্তির মধ্যে বিধাতা কী অসামান্য প্রাণ-শক্তির সঞ্চার করলেন - কেন করলেন? আজ শুধু নত মস্তকে সেই রহস্যময় আবির্ভাবের কথাই ভাবি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকার' যুগে যখন 'কল্যাণী' কবিতা লিখেছিলেন, তখন কি ভেবেছিলেন তারাই ঝাপিয়ে পড়বে অগ্নি যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে? স্বচক্ষে তিনি দেখে ত গিয়েছেন—মেয়েরা কী ভীষণ পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারে। মহাত্মাজীও যেন যথা সময়েই এসে ডাক দিলেন—মেয়েরা অকুণ্ঠচিত্তে নেমে পড়ল হাজারে হাজারে!—সেদিন স্পষ্ট বোঝা গেল ভারত স্বাধীন হবেই। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের যেন এক অভিনব তাৎপর্য্য এই নারীদের আত্মোৎসর্গে ফুটে উঠল।

অপরাধ থেকেই দেখছি আজ নূতন জগতে গড়ে উঠছে "অপরাধ-বিজ্ঞান"—কবির অমর ভাষায় "এ তোমার এ আমার পাপ"। পাপকে ঘৃণা করতে পার পাপীকে নয়—মহাত্মাজী বলেছেন। কল্যাণীর "জীবন অধ্যয়ন"-এক্ষেত্রেও একটি প্রামাণ্য দলিল হয়ে থাকবে। এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়—নিছক সত্য কাহিনী জেলের ভিতর দেখে যেগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন - সেগুলি বাংলা থেকে রাষ্ট্রভাষা হিন্দী তথা ইংরেজীতে অনুবাদ করে প্রকাশিত হওয়া উচিৎ। লেখিকার মত দরদী মানুষদের ভার দেওয়া উচিত জেল-সংস্কার কাজে। আইন

কানুন ও শাসনের নামে আজও স্বাধীন ভারতে হয়ত অজ্ঞাতসারে আমরা কত অন্যায় কত বিষম অপরাধ করে চলেছি - অপরাধীদের শাস্তি দিতে গিয়ে—সে বিষয়ে পূর্ণ সচেতন আমরা হয়েছি কি? অতীত কালের অত্যাচারের কালো পর্দ্দা সরিয়ে—মানুষেব বাঁচবার অধিকার কতটুকু আমরা দিতে পেরেছি—সেটি দেখতে হবে। হয়ত কল্যাণী দেবীর 'জীবন অধ্যয়নের' ফলে—আজ না হোক—অদূর ভবিষ্যতে উপবের 'মানুষ তথাকথিত নীচের মানুষদের নূতন চোখে দেখতে শিখবে:

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নিচে, সব-হারাদের মাঝে।"

কেশব জন্মতিথি
১৯ নভেম্বর ১৯৫১।

শ্রীকালিদাস নাগ

**মণিমেলার ছেলেমেয়েরা—**

তোমরা আমার কাছ থেকে গল্প শুনতে ভালবাস—আমিও তোমাদের সঙ্গে গল্প করে বড় আনন্দ পাই। "**জীবন অধ্যয়ন**" তোমাদের উদ্দেশ্যেই লিখে রাখলাম। তোমরা বড় হয়ে যদি বন্দী জীবনের অসহনীয় দুঃখ ভার লাঘব করার কাজে ব্রতী হও আর "পিসিমা" জেলখানায় সামান্য যা দেখেছেন ও বুঝেছেন সেগুলি যদি তোমাদের কোনও কাজে লাগাতে পার—তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

# কারাগৃহে কয়েক বৎসর

কয়েক বৎসর জেলে বন্দী ও গ্রামে অন্তরীন থাকার পর ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বরের শেষে মুক্তি পেয়ে বাইরের জগতে যখন এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন এই প্রশ্নই বারবার মনে জেগে উঠেছিল "আমরা কি সত্যিই সব পরাজিত সৈনিক? যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছি। স্বাধীনতা যে অনেক দূরে"। বাইরের এই মুক্ত বাতাসটুকুর জন্য প্রাণের আকুল বাসনা বন্দী জীবনকে কতখানিই না বিচলিত করে তুলত।

অথচ যখন সত্যিই কারা প্রাচীরের বাইরে মুক্ত আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালাম তখন তো বাইরের সেই স্নিগ্ধ বাতাস প্রিয়জনদের স্নেহালিঙ্গন আমাদের দুঃখ ভারাক্রান্ত শ্রান্ত জীবনে তেমন করে শান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দিতে পারল না। কেন এমন হয়? এই যে অবসন্নতা—এর কারণ কি ছিল? শুধু পেছনে যাদের ফেলে এসেছিলাম বা ফিরে এসে যাদের আর দেখতে পেলাম না—তাদের নিষ্পেষিত জীবনের করুণ স্মৃতি-না বাইরে এসে চারিদিকে দারিদ্র্য ও অভাবের যে নগ্নমূর্ত্তি আরও পরিস্ফুট ভাবে দেখতে পেয়েছিলাম তারই বিভীষিকা? হয় তো দুটোই—হয় তো আরও কিছু যা এখনও বিশ্লেষণ করে উঠতে পারিনি।

এখানে অন্ততঃ সে সব কথা'ত লিখতে চাইনি। চেয়েছি কারাগৃহের কয়েক বছরে যা কিছু সামান্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি—লেখার ভেতর দিয়ে সকলের সামনে তারি কিছু ছবি এঁকে রেখে দিতে।

আমার চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল বন্দীরা তাঁদের কারাজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তাঁদের ভাষার গতিভঙ্গিমা-তীব্র শ্লেষ ও সেই সঙ্গে মধুর প্রচ্ছন্ন, হাস্যরসোদ্দীপক ভাব তাঁদের বর্ণনাকে কত সুন্দর করেছে। এই লেখায় সেই সবের একান্ত অভাব থাকলেও মনে হয় এই বর্ণনা হয়তো একেবারেই বৃথা হবেনা।

এক জায়গায় পড়েছিলাম "যা হয়নি—যা হতে পারে মানুষের ইতিহাসে তারি জোর—তারি দাবী বেশী। তারি

আকাঙ্খা দুর্ণিবার হয়ে মানুষের সভ্যতাকে যুগে যুগে বর্ত্তমানের সীমা পার করে দিচ্ছে"। এখানে হয় তো তেমনি কোনও সুপ্ত আকাঙ্খাই লুকিয়ে আছে। স্বাধীন দেশে যাঁরা কারা সংস্কার কাজে ব্রতী হয়েছেন তাঁরা যদি এই আলোচনায় কিছুমাত্র সহায়তা লাভ করেন ও ভাগ্যহীন বন্দী জীবনে যদি কিছু সামান্য আরাম ও শান্তি এনে দিতে পারেন তবে এই লেখা সার্থক বলে মনে করতে পারব। বিশ্বকবি ৺রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "অনন্ত নরকের কল্পনা হিংস্র বুদ্ধির চরম প্রকাশ-সেই নরকের আদর্শ সভ্য মানুষের জেল খানায় আজও বিভীষিকা বিস্তার করে আছে। সেখানে শোধন করবার নীতি নেই আছে শাসন করবার হিংস্রতা"। আমাদের দেশে ও অন্যান্য অনেক দেশে কারা-শাসন প্রণালী যেভাবে প্রবর্ত্তিত হয়ে এসেছে, তাতে জেল কর্ত্তৃপক্ষ মনে মনে অনুভব করলেও বন্দীদের দুঃখ কার্য্যতঃ লাঘব করতে পারেন না। বন্দীদের যে অসহনীয় দুঃখ লাঞ্ছনার ভেতর জীবন কাটাতে হয় তার জন্য দায়ী এই কারা-শাসন প্রণালী। আর এই কারা-শাসন প্রণালী আমাদের দেশের প্রচলিত সাধারণ শাসন প্রণালীর একটি অঙ্গ মাত্র বলে মনে হতো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরাধীন ভারতবর্ষকে এক বৃহৎ কারাগারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সেখানে সকলেই কারাগারে বাস করে। কতগুলি নির্ম্মম নিয়ম কানুন সেখানে এমন একটা লৌহ প্রাচীর নির্ম্মাণ করে রেখেছে যে বাইরের মুক্ত আলোবাতাস প্রবেশ করতেই পারে না।

জেলেখানায় ঢুকে প্রথম কথাই মনে হয়েছিল "মনুষ্যত্বের এত বেশী অবমাননা আর বোধহয় কোথাও এমন ভাবে দেখা যায় না"। মানুষকে প্রতি মুহূর্ত্তে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে দেখেছি। মানুষ যত ভ্রষ্ট, যত পতিতই হোক্ না কেন তাকে তুলে ধরতে হলে সব চেয়ে প্রয়োজন তাকে মানবোচিত সম্মান প্রদান করা। তাতেই তার সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগায়ে তোলা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে কারা-শাসন-তন্ত্র যে প্রকাণ্ড বড় কারখানা খুলে রেখেছে—সেখানে শুধু লক্ষ লক্ষ মানুষকে বলি দেওয়াই হচ্ছে। আত্মসম্মান যে কতখানি ক্ষুণ্ণ হয়—মানুষের আত্মা যে কত বেশী নিপীড়িত, হয় তার সব চেয়ে বড় নিদর্শন পাওয়া যায় যখন দেখা যায় যে এই নির্ম্মম নিগড় হতে মুক্তি পাবার জন্য সময় সময় বন্দীরা মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করে নিয়েছে। "নির্ব্বাসিতের আত্মকথায়" দেখতে পাই আন্দামানের কারাগারে দুঃসহ অপমানের বোঝা আর বহন করতে না পেরে বন্দীরা নিজের জীবনকে কেমন করে শেষ করে ফেলেছে। অথচ মানুষের ভেতর এই ধরণীর বুকে বেঁচে থাকবার কি দুর্নিবার আকাঙ্খাই না জেগে থাকে। বোমা পড়বার ভয়ে সেই সুদূর ব্রহ্মদেশ থেকে মানুষ হেঁটে চলে এসেছে। চলার পথে পা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে, স্ত্রীর মৃতদেহ রাস্তায় ফেলে এসেছে—মৃতপ্রায় সন্তানকে পথে শুইয়ে এসেছে, তবু সে হেঁটেছে—প্রাণে বাঁচবে বলে।

বাংলার দুর্ভিক্ষে দেখেছি—ঘর বাড়ী জমি বাসন গরু শেষে সন্তান পর্য্যন্ত বিক্রী করে মাসাধিক কাল অভুক্ত থেকেও মানুষ হেঁটে এসেছে কলকাতার বুকে বাঁচতে পারবে এই আশায়। সে যেন সব সময় বলছে

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর এ ভুবনে"

অথচ এই মানুষকেই দেখেছি গলায় কাপড় বেঁধে মরতে যাচ্ছে। কোন রকমে দেখতে পেয়ে কাপড় খুলে বাঁচিয়েছি আমরা। বেঁচে উঠে কেঁদেছে—"আমায় বাঁচালে কেন তোমর ? বাঁচতে কি আমি চেয়েছি" ?

জেলখানায় ঢুকে মনে হয়—চারিদিকে একি দৈন্য—একি গভীর অন্ধকার! কারুর মুখে এতটুকু হাসির রেখা যেন ফুটে ওঠেনা— কারুর জীবনে এতটুকু বসন্তের হাওয়া দোল দিয়ে যায় না। কেবলই জীর্ণতা—শুষ্কতা। প্রকৃতির বুকে ফুল ফুটছে—আকাশে চাঁদ উঠছে। ঋতুর পর ঋতু আসছে—আবার কালের মন্দিরা বাজিয়ে চলে যাচ্ছে। বন্দীর বুকে জগদ্দল শীলা চাপান। সে হাসতেও জানেনা, কাঁদতেও জানেনা। আবার প্রতিবাদের চীৎকারে জেলের আকাশ বাতাস আলোড়িত করেও দিতে পারে না। সে মূক-বধির-অন্ধ। জেলের বন্দীদের দেখে মনে পড়ে যেত

"ম্লান মূক মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী
স্কন্ধে যত চাপে ভার বহি চলে মন্দগতি
যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার"

## কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলঃ—

১৯৩১ সনের ডিসেম্বরে আইন অমান্য আন্দোলনে ধরা পড়ার পর আমার আট মাসের জেল হয়। শেষ দিনের বিচারের আসর বসল আলিপুর জেলের একটি ঘরে। প্রকাশ্য বিচারালয়ে বিচার না হয়ে এমন গোপন ভাবে বিচার শেষ হবার বিশেষ কোন কারণই আমাদের জানতে দেওয়া হল না। বিচারাধীন অবস্থাতেই আমাদের প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

প্রথম যখন জেলে ঢুকলাম—তখন শীতকাল। বিচারাধীন বলে বাড়ীর বিছানা পত্র ভেতরে নিয়ে যাবার অনুমতি পেলাম। অনেকগুলি রাস্তা ও গেট পার হয়ে মহিলা জেলের প্রাঙ্গনের সামনে এসে দাঁড়াতে একটি ইঙ্গ-ভারতীয় মহিলা মেট্রণ জিনিষপত্র মিলিয়ে হাসি মুখে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। ভাবলাম মানুষটী ভালই হবেন বোধ হয়। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের একটি বড় ঘরে লোহার দরজায় তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল। জেলের দিন পঞ্জিকায় তখন সন্ধ্যা—যদিও বাইরে তখন বেশ বেলা। এই হল আমাদের জেল জীবনের প্রথম আঘাত। চারিদিকে আলো—আমাদের বন্ধ হয়ে যেতে হবে। মনে পড়ে গেল কলিকাতা নগরীর সায়াহ্নের কর্ম্মব্যস্তরূপ। দলে দলে ছাত্র ছাত্রীরা বেড়াতে যাচ্ছে। কেউ খেলার মাঠে, কেউ সিনেমার দিকে, কেউ পার্কের হাওয়া খেতে, কেউবা

বন্ধুর বাড়ী। ঠিক এই সময়টা বন্দীর জীবনে বড় পীড়াদায়ক, বড় করুণ। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে সবাই কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকতাম। তার পর ধীরে ধীরে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়ায় যখন চারিদিক আবৃত হয়ে যেত তখন মনটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসত—হয়তো আপনা থেকে গেয়ে উঠত—"মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ—তোমায় করিগো নমস্কার"।

প্রথম দিনই অন্ধকার ঘরে বসে আছি—"বন্দেমাতরম" বলে দুজন বৃদ্ধা মহিলা আমাদের ঘরে ঢুকলেন। পরিচয় নিয়ে জানলাম—একজন ৬০ বৎসর অতিক্রম করে গেছেন আর একজন ৫০র কোটায় প্রবেশ করেছেন। স্নেহ-পিপাসু প্রাণ—মা বাবা ভাই বোনদের স্নেহের আবেষ্টনী থেকে এমন ভাবে দূরে এসে যেন কিছু অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। এঁদের কাছে পেয়ে বড় তৃপ্তি লাভ করলাম। এঁদের জেলে আসার পেছনের ইতিহাসটা জানবার জন্য কৌতুহল হল। প্রথম মহিলাটী (ঠাকুমা বলে ডাকলাম) ব্রাহ্মণ বংশীয়া ও স্বামীহীনা। তিনি এসেছেন জেলে তাঁর আদরের নাতির অনুরোধে। অল্পবয়সের নাতি আইন অমান্য করে জেলে যাবার আগে ঠাকুমার কাছে অনুরোধ রেখে গিয়েছিল যেন সে যাবার পরই তিনি এসে তার শূন্যস্থান পূর্ণ করে আন্দোলনে যোগ দেন। পৃথিবীতে তার যে একান্ত প্রিয় ও আপন—তাঁর কছেই তার সবটকু দাবী রেখে গেছে। ঠাকুমার কাছে স্বাধীনতার কোন রূপ

ছিলনা, জেলে আসার পেছনে কোন আদর্শের প্রেরণা ছিল না। এটা শুধু কেবল ভালবাসার দাবীর কাছে আত্ম সমর্পণ। বসে বসে উপলব্ধি কবে নিলাম ঠাকুমা ও নাতির মধুর সম্পর্ক যা তাঁকে এই বৃদ্ধ বয়সে আজন্মের অভ্যস্ত শান্তিময় সংসার ভেঙ্গে এত অজানা দুঃখের ভেতর টেনে এনেছে। তাঁর সঙ্গিনী এসেছেন—আন্দোলনের জোয়ার তাঁর জীবনে কিছুটা ধাক্কা দিয়েছিল বলে। "বন্দেমাতরমে"র আহ্বানই তাঁকে ঘরেব বাহিরে এনে ফেলেছে।

আরও রাত্রে দুটি পনরো ষোল বছরেব ছাত্রী হাওড়া থেকে ধরা পড়ে আমাদের ঘরে ঢুকল। নাম তাদের সুষমা ও সুবমা। তাদেব জেলে আসার ইতিহাস খোঁজ করে জানলাম যে তাদের দাদা কংগ্রেসকর্মী। তিনিই মা বাবাকে বুঝিয়ে সব ব্যবস্থা করে তাদের জেলে পাঠিয়েছেন মনে মনে ভাবলাম স্নেহ ও সংস্কাবে দুর্ব্বল করেনি এই রকম ভাই যদি বাংলাদেশে আরও অনেক থাকত তবে আজ বাংলাব জেল কত বোন দিয়েই না ভরে যেতে পারত। আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধে কত এগিয়ে যেতে পারতাম।

সকালবেলা উঠে দেখি সেই "ভাল মনে হওয়া" মেট্রনটী আমাদের ঠাকুমা ও তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে টানাটানি করছে। আমরা জেলে গিয়ে দেখেছিলাম আমাদের যাবার আগেই শান্তিদি, তাঁর মা ও আরও কয়েকজন মহিলা কর্মী অল্প কয়েকদিনের শাস্তি নিয়ে সেখানে রয়েছেন। গোলমাল শুনে আমরা সবাই ছুটে গিয়ে দেখি ঠাকুমাদের বিচারে তৃতীয়

শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে বলে কয়েদী পোষাক ( খুব মোটা ছোট একটি ফ্রক অথবা গাউন ও প্রায় দেড় হাত লম্বা একটি গামছা ) পরান হচ্ছে। তাঁদের নিয়ে কিছুক্ষণ "টাগ্ অফ্ ওয়ার" খেলার পর আমরাই ছেড়ে দিলাম। কারণ আমাদের জানান হ'ল যে ওঁরা ঐ পোষাক পরতে অস্বীকৃত হলে ওঁদের জোর করে চট পরিয়ে অন্ধকার সেলের মধ্যে পাঠান হবে। জেল আইন সকলকে মেনে নিতেই হবে নয়তো খুব কঠিন শাস্তির বিধান লেখা আছে। রাত্রে তাঁদের মুখে যেটুকু হাসি দেখেছিলাম—দিনের আলোয় তা কোথায় মিলিয়ে গেছে।

পোষাক পরার ধাক্কা সামলানর পর তাঁদের আর এক ধাক্কা খেতে হল যখন তাঁদের ডাল ভাঙ্গবার ঘরে ঢোকবার হুকুম এল। কিছুক্ষণ খাটুনী ঘরে যাঁতা ঘোরাবার পর ঠাকুমা হাঁপাতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গিনী, আমাদের মাসীমা এসে আমায় বললেন যে কয়েক বছর আগে তাঁর ভারি শক্ত অসুখ ( যক্ষ্মা ) হয়েছিল। ডাল ভাঙ্গার ঘরে তাঁর নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। মেট্রণের কাছে ছুটে গেলাম—সে বললে—ইউ কমলানী তোমাকে ভাল মেয়ে মনে করেছিলাম। এখন দেখছি তুমি বড় সাংঘাতিক মেয়ে। তুমি অন্য আসামীদের নিয়ে কিছু গোলমাল না কর যদি তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব। সেখানে প্রতিকার না পেয়ে বাঙ্গালী ডাক্তার বাবুর কাছে গেলাম ও সমস্ত খুলে বললাম। ডাক্তার বাবুরা ইচ্ছে করলে এবং ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখালেই আসামীদের

কাজ কমিয়ে দিতে পারেন। এক কাজ থেকে অন্য সহজ কাজে বদলী করে দিতে পারেন। ডাক্তার বাবু রাজি হয়ে খাটুনী বদলে দেবার কথা টিকিটে লিখতে যাবেন এমন সময়ে মেট্রন সেখানে এসে ডাক্তার বাবুকে বোঝালেন যে ঐ মহিলার কোনরূপ অসুখ নেই এবং ঐ কাজের জন্য তিনি খুবই উপযুক্ত। ডাক্তার বাবু তখনি তাঁর মত বদলিয়ে আমায় বললেন—ইয়েস ইয়েস সি ইজ কোয়াইট ফিট ফর দি ওয়ার্ক। নীরবে সে স্থান ছেড়ে চলে আসতে হল। ডাক্তার বাবুর এই হঠাৎ মত বদলানোর কারণ বুঝতে কিছু বাকি রইল না।

তারপর এগারটা অবধি কাজ করার পর খাবার ঘণ্টা শুনে ঠাকুমাদের নিয়ে একদিকের উঠানে জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে এক লাইনে মাটিতে বসে পড়লাম। মোটা লাল চালের ভাত—কচু বেগুন (তার মাথাটাও বেশী) শুকনো কপি পাতা সেদ্ধ করে তাতে কাঁচা তেল দেওয়া এক তরকারী ও পেঁয়াজ দেওয়া মুশুর ডাল সেই বাংলার হিন্দু বিধবাদের খেতে দেওয়া হল। ঠাকুমা ভাতে হাত রেখে বসে আছেন, সে খবর মেট্রণের কাছে পৌঁছতেই বেত হাতে এসে বলল—"বুড়ী তোমাকে খেতেই হবে—নয়তো এই বেত দিয়ে তোমায় মারব"। ঠাকুমা একগ্রাস মুখে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

কয়েকদিন পরেই আমাদের বিচার শেষ হল। কোর্ট থেকে, শ্রেণী বিভাগ নির্দ্দিষ্ট করে না দেওয়াতে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী বলে জেল কর্তৃপক্ষ মেনে নিলেন। সেদিন আমরা জেলে ঢুকতেই মেট্রণ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল। বাড়ীর পোষাক ছেড়ে জেলের পোষাক পরতে হবে এই কথাটি জানিয়ে দিল। একে একে সব বাড়ীর জামা কাপড় হাতের চুড়ি চশমা সব খুলে নিয়ে সেই অদ্ভুত পোষাকটি পরান হল।

মেট্রণের মুখে (যদিও সে মুখে "দুঃখিত" বলেছিল) সেদিন একটা প্রতিহিংসার হাসি দেখতে পেলাম যাতে ওর জন্যই তখন মনে দুঃখ হল। এতদিন বিচারাধীন ছিলাম বলে—সুপারিণ্টেডেণ্ট সাহেবের কাছে বহু ভাবে অভিযোগ করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে নি আমাদের। এবার পেল আমাদের একান্ত হাতের মুঠায় - তার শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শনের পূর্ণ সুযোগ। যার যতটকু ক্ষমতা তার সম্পূর্ণ অপব্যয় করাই আমাদের চরিত্রগত ধর্ম্ম।

সেই সময়ের একটি করুণ ছবি আমার এখনও মনে পড়ে যায়। আমার সঙ্গে ধরা পড়েছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বছরের একটি সধবা মহিলা। তাঁকে মাসীমা বলেই ডাকতাম। তিনি ঐ জেলের পোষাক পরাটাকে সহজেই মেনে নিলেন। দশ বছরে বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যে সোণার লোহাটী পরেছিলেন আজও সেটী তাঁর মাথার সিঁদূরের সঙ্গে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। অন্য সব গহনা খুলে

নিলেও সেই সোণার লোহাটী অন্ততঃ রাখতে দেওয়া হোক্ বলে তিনি অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু মেট্রণ সেটী খোলবার জন্য বেশী করে উদ্যোগী হয়ে উঠল। লোহাটী খুব ছোট হয়ে যাওয়াতে বহুক্ষণ চেষ্টা করেও খুলতে না পেরে শেষে যখন সেটীকে জাঁতি দিয়ে কেটে ফেলতে হল—তখন সেই আজন্ম সংস্কারবদ্ধ মহিলা মাটিতে বসে আকুল ভাবে কেঁদে উঠলেন। সব কিছুর জন্যই হয়তো প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু লোহা খুলতে হবে—সিঁদূর মুছতে হবে এ দুটী কথা ভাবতে পারেন নি কখনও। "দেখবেন মাসীমা আপনার স্বামীর কোন অকল্যাণই এতে হবে না বরং আপনার এই দুঃখ বরণে তাঁর মঙ্গলই হবে" বলে হাত ধরে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে নিয়ে চলে গেলাম। অনেক বছর পরে বাইরে এসে যখন দেখলাম তিনি হাতে নতুন লোহা দিয়ে মাথায় চওড়া সিঁদূর পরে কাজ করে বেড়াচ্ছেন, তখন মনে ভাবলাম সেদিনকার সেই করুণ ঘটনার পুনরাভিনয় যদি আবার হয় কখনও—সেদিন আর স্বামীর অকল্যাণের ভয় অমন করে বিচলিত করবে না ওঁকে।

ক'দিন পরে বিভা জেলে এল—ষোল বা সতেরো বছরের মেয়ে। জেলের সমস্ত নতুন পারিপার্শিককে সে সহজে ও সানন্দেই গ্রহণ করল। বাহিরে থাকতেই বাবা মা ভাই বোনের স্নেহ কিছুই তাকে ঘরে বেঁধে রাখতে পারে নি। আমায় বলত "স্নেহ ভালবাসা আমার ধাতে সয় না—

তাই ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি"। চমৎকার আবৃত্তি করতে পারত। মার প্রতিষ্ঠিত "সরলা পুণ্যাশ্রমে"র সাহাযার্থে "বিসর্জন" অভিনয়ে রঘুপতির পার্ট খুব সুন্দর করে করেছিল। মেয়েরা জেলে যাচ্ছে শুনে সেও একদিন আইন অমান্য করে জেলে চলে এল। হাজরা পার্কের সামনে খুব প্রাঞ্জল ভাষায় একদিন দেশবাসীকে আন্দোলনে যোগ দেবার আহ্বান জানাল। পুলিশ প্রথম দিন ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দিল। দ্বিতীয় দিন গ্রেপ্তার করে দশ মাসের জেল দিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দিল। আমাদের মতন ফ্রক পরিয়ে দিলে, সে হেসে বলল—"এত বেশ ভালই হল—এখন যদি কাপড় দেয়ও—আমি কিন্তু পরছি না"। তার নাচ গান হাসি দেখে মেট্রণ আমায় বলল যে—ওকে নাকি ও ভালবেসে ফেলেছে। ওকে দেখলেই ওর নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে যায় ইত্যাদি। এইখানেই বলে যাই—অন্য জেলে আমরা চলে যাবার পর—কয়েক মাস পরেই আমরা শুনেছিলাম যে ঠিক "মেয়ের মতন মনে হওয়া" এই মেয়েটীকে দিয়েই মেট্রণ সমস্ত জেলের ময়লা পরিষ্কার করিয়েছিল। একদিন (অনেকের সামনেই) নিজের জামাটী তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলে বিপদসূচক শব্দ অর্থাৎ "সিটি" বাজিয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী সার্জেণ্ট এসে তাকে জোর করে মাটিতে ফেলে টানতে টানতে সেল ঘরে নিয়ে যায়। তারপর মেট্রণকে মারধর করেছে এই মিথ্যে অজুহাতে তাকে

পনরো দিনের "সেল" বাসের শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

জেলে গিয়ে কয়েকদিন পরেই দেখলাম আসামীদের ঘরে কতকগুলি নিয়ম লেখা রয়েছে। একটিতে রয়েছে—যদি কোন বন্দী অন্যদের নামে অভিযোগ আনতে পারে তবে তাকে কিছুদিন বেশী "মাফ" দেওয়া হবে।

ভাল মানুষের মতন জেলে থাকলে জেলের সাধারণ্ নিয়ম অনুসারে বন্দী ছয় মাসে ২৪ দিন করে মুকুব পায় অর্থাৎ তার অতদিন করে জেলবাসের সাজা কমে যায়। অন্যের দোষ ধরিয়ে দিতে পারলে এই মুকুব বেড়ে যাবে।

প্রত্যেক বন্দীই বাইরে যাবার জন্য আকুল হয়ে থাকে। সেখানে তার সংসার আছে—স্বামী পুত্র কন্যা আছে—তাদের কাছে পাবার জন্য ওর প্রাণের ব্যাকুলতা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই সে যখন বোঝে যে অন্যের ক্ষতির ভেতর দিয়েই তার নিজের লাভ ও মঙ্গল—তখন সে মিথ্যে বা অর্দ্ধসত্যের ওপর অনেক কিছু খাড়া করে অন্যের নামে। মানুষের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবার চেষ্টার এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিশেষ করে যখন সে বুঝতে পারে যে স্বদেশী দিদিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারলে শুধু মেট্রণ কেন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের কাছেও বিশেষ প্রিয় হতে পারা যায়, তখন সে প্রাণপন চেষ্টা করে আমাদের বিপদগ্রস্থ করতে। শত ভালবাসা ও উপকার দিয়েও তাদের এই দুর্ব্বলতাকে জয় করতে পারি নি। এই রকম অভিযোগ সংগ্রহের কাজে সফল হলে তারা কিছুদিন

পরে পাহারাওয়ালীর পদে উন্নতি লাভ করতে পারে ও শেষে "মেটের" পদে নিযুক্ত হয়। জেলে যে সব জিনিষের প্রবেশ নিষিদ্ধ—মেটরা জমাদারণীকে খোসামদ করে ভেতরে আনাবার চেষ্টা করে। সাধারণ আসামীরা সেই সব পাবার জন্য পাহারাওয়ালী বা মেটদের সন্তুষ্ট করতে কত রকম করেই না চেষ্টা করে। পাহারাওয়ালীরা আসামীদের খাবার চুরী করে জমাদারণীদের আহার যোগাচ্ছে—আসামীরা ভয়ে তার প্রতিবাদ করতে পারে না। আমাদেরও লুকোতে চেষ্টা করত না! কারণ ওরা জানত যে যত ক্ষতিই করতে চেষ্টা করুক ওরা—উল্টে ওদের ক্ষতি করবার মতন মনোবৃত্তি স্বদেশী দিদিদের নেই। চারিদিকে শুধু দেখতাম দুর্নীতি—আর এই দুর্নীতির আ হাওয়ায় নিজের ভেতরটা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে—দম বন্ধ হয়ে আসছে বলে মনে হত।

প্রেসিডেন্সি জেলে দেখেছি—যে মেয়ে বন্দীর এতটুকু নিজস্ব সত্বা আছে বা নীতিজ্ঞান আছে বা যে পাহারা-ওয়ালীদের মন যুগিয়ে চলতে পারছে না—তাকে কি অশেষ যন্ত্রণাই না ভোগ করতে হয়েছে। একদিন একটি আসামী পাহারাওয়ালীর অন্যায় জুলুম মেনে নিতে পারেনি। তখুনি তার নামে জমাদারণীর কাছে রিপোর্ট হল। জমাদারণী ভয় দেখাল—যে মামা (মেট্রণ) এলে তার কি দুর্দশাই না করা হবে। যথাসময়ে বিকেল বেলা বাইরে ঘণ্টা বাজিয়ে মেট্রণের শুভাগমন হল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রিয় জমাদারণীরা ও মেটরা বৃহৎ ছাতা খুলে তাঁকে নিয়ে এসে

উঠানের একটি চেয়ারে বসাল। একজন একটি বৃহৎ পাখা নিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল—আর একজন পদসেবা আরম্ভ করে দিল। তারপর সুরু হল সেই ভাগ্যহীনার নামে অভিযোগ। "মা মা" বসে বসে হুকুম করলেন—"ওকে এখানে নিয়ে এস"। তাকে আনার পরই, তাকে কিছুমাত্র বলতে না দিয়ে– মামা হাতের বেত দিয়ে মারতে লাগলেন। এমন অন্যায় যেন সে ভবিষ্যতে কোনদিন না করে একথাও বার বার জানিয়ে দিলেন। কি অন্যায় সে করেছে এবং আর করবে না তাও সে বুঝতে পারল না। কারণ তার নামে সম্পুর্ণ মন গড়া একটি মিথ্যে অভিযোগ খাড়া করা হয়েছিল তাকে শাস্তি দেবার জন্য। প্রথমে গিয়ে যাকে দেখেছি শাস্তি পেতে—কয়েকমাস পরে তাকেই দেখেছি অন্যের শাস্তির কারণ হতে। জেলখানায় বেশীদিন প্রয়োজন হয় না মানুষকে অমানুষ হতে। শাকিনা বলে একটি ছেলে মানুষ মেয়েকে প্রথমে গিয়ে বড় ভাল লাগত। সময় পেলেই আমার কাছে এসে বসত–তার দুঃখের জীবনের কাহিনী কিছু কিছু শোনাত। সে বেশী মন যুগিয়ে চলতে পারত না বলে তার লাঞ্ছনার সীমা ছিলনা।

আমায় বলত—"কিছুদিন আগে ছাড়া পাবার লোভে অন্যের ক্ষতি করি—যদি আর কিছু না হোক্ আল্লার দোয়া কোন দিনই পাব না"। কিছুদিন পরে দেখি—আমার কাছে আর আসে না—বসে গল্প করে না।

অনেকে ব'লল শাকিনা আমাদের নামে কত অভি-যোগই না করছে। প্রথমে বিশ্বাস করি নি। একদিন দেখি

জমাদারিণীর পা টিপছে আর অনর্গল কি বলে যাচ্ছে। আমায় দেখে এখন লজ্জায় মুখ নীচু করে বসে রইল। শেষের দিকে নাকি ওই মেট্রণের সব চেয়ে প্রিয়পাত্র হয়েছিল ও স্বদেশী বোনদের অনেক কষ্টের কারণ হয়েছিল। প্রকাশ্যেই নাকি মেট্রণের কাছে নালিশ করত।

জেলখানায়—"ফাইলের" উৎসবটা খুবই সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। সপ্তাহের একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে জেলের "বড় সাহেব" আসেন জেল পরিদর্শন করতে ও সমস্ত বন্দীদের সুখ দুঃখের কথা শুনে তাদের অভিযোগের প্রতিকার করতে। সাধারণতঃ সোমবারই ফাইল উৎসব হয়ে থাকে। রবিবার দিনে সাজি মাটিতে কয়েদীদের জামা কাপড় কাচা হয়। সমস্ত বাড়ীটা তাদের ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হয়। মাঝে মাঝে মনে হত রবিবারে ওদের অন্যদিনের চেয়ে বেশী কাজই বোধ হয় করতে হয়। সোমবার দিনে সকালে সেই ধোওয়া জামা পরে ওদের নিজ নিজ সম্পত্তি অর্থাৎ দুটি কম্বল একটি থালা ও বাটি– সব সামনে রেখে লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। একটি টিনের টিকিটে যাতে তাদের বন্দী জীবনের ইতিহাস লেখা থাকে—অর্থাৎ কবে ধরা পড়েছে কবে ছাড়া পাবে—কবে তার জেল শাস্তি হয়েছে ইত্যাদি। সেটাও জামার ওপর আটকে রাখতে হয়। দূর থেকে বড় সাহেবের বিরাট ছাতাটা দেখা যায়—সঙ্গে থাকেন জেলার বাবু, ডেপুটী জেলার বাবুরা– বড় ডাক্তার, ছোট ডাক্তার প্রভৃতি। তাঁর ঠিক ঢোকবার আগে মেট্রণ ছুটাছুটি করে

রিহার্সেল দেওয়াতেন যাতে অভিনয়ের সময় কোন ত্রুটিই না থাকে—যাতে তারা "সরকার সেলাম" বলেই মূক ও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কোন বন্দীই সাহস করে তার শত অভিযোগ থাকলেও কিছু বলতে পারত না। কারণ অভিযোগের প্রতিকার হতে পারে এমন আশা কারুর মনেই ছিলনা। তাছাড়া অভিযোগ করার ফলে জমাদারিণী মেট্রণ বা তার উপরের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের হাতে তাদের যতখানি নির্য্যাতন পেতে হবে তা সহ্য করবার মতন শক্তি বা সাহস তাদের কারুর মনেই থাকতে পারেনা।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরিদর্শন করে দেখতেন চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রিপোর্ট বইয়ে হয়তো লিখতেন—কোন বন্দীর কোন অভিযোগই নেই। সকলেই বেশ মানসিক ও শারীরিক সুখে আছে। আর গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগিতা করে জেলে এসে নিজেদের কষ্ট সম্বন্ধে অভিযোগ করতে আমাদের কোনও প্রবৃত্তি হোত না।

আমাদের কিছুদিন সমস্ত সাধারণ বন্দীদের সঙ্গে এক ঘরে রাত্রি কাটাতে হয়েছিল। খাটুনী ঘরে বসে ভোর থেকে এগারটা পর্য্যন্ত আবার বারটা থেকে চারটে পর্য্যন্ত তখন বড় ভারী লোহার চরকায় দড়ি পাকাতে হোত। পিঠের শিড় দাঁড়াটী মাঝে মাঝে এমন ব্যথা করে উঠত। ডান হাতটী যেন ছিঁড়ে পড়ে যেত। কিন্তু একমিনিট চরকা বন্ধ করতে পারতাম না। সামনে চেয়ার নিয়ে বসে থাকে মেট্রণ নিজে—পাছে আমরা কাজে ফাঁকি দিই। ছোট

টিনের একটি কৌটা সংগ্রহ করে তাতে একটু জল নিয়ে লুকিয়ে রাখতাম। যদি কখনও মেট্রণ চা খেতে উঠে যেত তখুনি ঘাড়ে একটু জল লাগাতাম বা মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তাম। পায়ের শব্দ শুনে আবার উঠে বসতাম। রবি-বার ছাড়া সপ্তাহের অন্যদিন স্নান করবার অনুমতি ছিল না। একটি জামাই সারা সপ্তাহ পরে থাকতাম—শুধু রবিবার সব আসামীদের কাপড়ের সঙ্গে আমার জামাটীও গরম জলে ফোটান হত।

ভাত খেতে বসবার আগে হাওদার জলে ভয়ে ভয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিতাম।

সেই ছোট ফ্রক পরে অফিসারদের সামনে দাঁড়াতে পারতাম না। তাঁরাও নাকি লজ্জা পেতেন—তাই অভিযোগ আছে কিনা জানবার জন্য সামনে আসতেন না। কাজেই অন্যদের ওপর অবিচারের প্রতিবাদ জানাবার কাজটী কিছু-দিন বন্ধ হয়ে গেল। আগে নিয়ম ছিল—অফিসার এলেই সেই ছোট গামছাটী মাথায় দিতে হোত। পরে আবার নিয়ম হল যে ফাইলের সময় বা অফিসারদের সামনে মাথায় কেউ কিছু দিতে পারবে না। জেল খানায় যেন সবই অদ্ভুত।

মেট্রণ খুব চেষ্টা করেছিল লাইনে দাঁড় করিয়ে আমাদের মুখ দিয়ে "সরকার সেলাম" বলাতে। কিন্তু কোনদিন তা বলাতে পারেনি। এই খানেই বলে রাখি যে আমাদের ঐ পোষাক পরান হয়েছে এই নিয়ে বাংলা দেশের আইন

সভায় নাকি আলোচনা হয়েছিল। তার কিছুদিন পরে মেয়ে বন্দীদের শাড়ী পরবার প্রথা অবলম্বন করলেন বাংলার জেল কর্তৃপক্ষ। সমস্ত জেলেই মেয়েরা কাপড় পেল। অত মোটা ও শ্রীহীন শাড়ী পেয়েও মেয়েদের মুখে যখন হাসি দেখেছিলাম তখন মনে হয়েছিল আমাদের সকলের অপমান ও দুঃখ বরণ বুঝি এমনি করে সার্থক হল।

সারাদিন অত পরিশ্রম করতে হোত বলে সন্ধ্যা বেলা কত যে শ্রান্ত হয়ে যেতাম। শীতের দিনে মাটিতে একটি কম্বল পেতে ও আর একটি গায়ে দিয়ে শুতে হোত। মাটি ফুঁড়ে যেন ঠাণ্ডা উঠছে। ঘরে বন্ধ হয়ে বন্দীরা প্রায়ই ঝগড়া আরম্ভ করত। কোনও দিন মারামারিতে রক্ত স্রোত বয়ে গেল, তাও দেখেছি। কোনও দিন ঝগড়া মারামারীর পর্ব্ব শেষ হলে আবার গানও আরম্ভ হোত। খালি ভাবতাম শীতকালের দীর্ঘ রাত্রির কয়েক ঘণ্টার জন্য অন্ততঃ যদি ওদের পড়াশুনার ও গানের ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহলে হয়তো ওদের মনটা একটু শান্ত ভাব গ্রহণ করতে পারত। ওরা যেন পশুর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। পরে হিজলী জেলে তাই পড়াবার ব্যবস্থা করতে খুব সচেষ্ট ছিলাম। ঠিক ঘরের লোহার দরজাগুলি বন্ধ হয়ে যাবার পর—একটি এক বছরের ছেলে "জেলী" (সে জেলে জন্মেছিল বলে তাকে ঐ নামে ডাকা হোত) নিয়ম করে কান্না জুড়ে দিত। তার মা ছিল বিশবছরী—স্বামীকে খুন করার অপরাধে তার এতদিনের শাস্তি। কোন দিন তাকে হাসতে বা কথা বলতে

দেখেছি বলে মনে পড়ে না। হয়তো দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়া ছেলেটির পছন্দ হোত না। তার মা তাকে কোলে নিয়ে বসে থাকত। ছেলে থামছে না এই অপরাধে পাহারাওয়ালী এসে মাকে শাসন করে মেরে যেতো। মাও শেষে অপমানটা ছেলের ওপর দিয়ে শোধ নিতো—কোনও কথা না বলে মারতে আরম্ভ করতো। এ দৃশ্য আর কতক্ষণ দেখা যায়? মাকে গিয়ে বলতাম—"তুমি ঘুমিয়ে নাও ছেলেকে দেখছি"। পরিশ্রান্ত মা তখুনি মুখে কম্বল ঢেকে ঘুমিয়ে পড়ত। সে ঘুম সহজে ভাঙ্গবার লক্ষণ কিছু দেখতে পেতাম না। ছেলে-টীও কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়ত। কিছুক্ষণ পরে এক হাঁপানী রোগী সজোরে কাশতে আরম্ভ করতো। তাকে দেখতাম সারাদিন ঘুমিয়ে থাকতে আর রাত্রে বসে বসে কাশতে। অথচ তাকে কোন দিনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেখিনি। প্রেসিডেন্সি জেলে এত মশা যে ঘুমান এক কঠিন ব্যাপার ছিল। অথচ অন্যদের মতন মুখ ঢেকে ঘুমুতেই পারি না। ভোর পাঁচটায় আমাদের ঘর খুলে দেওয়া হোত। জেলের নিয়ম অনুসারে সাড়ে চারটার সময় কম্বল তুটী পাট করে সামনে রেখে বসে থাকতে হয় ঠিক আধ ঘণ্টা। বসে বসে নিদ্রা যাও বা ভগবানকে ডাক। কিন্তু শুয়ে থাকতে পার-বে না। বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে ভোরের বেলা মনের ভেতর শান্ত ভাব এনে ভগবানের নাম করা কারুরই সাধ্যের ভেতর ছিল না। অথচ এই "ব্রহ্ম মুহূর্ত্তটী" ঋষিদের কাছে কত সুন্দর ভাবেই না দেখা দিত।

দিন রাত্রি এইরকম ভাবে কাটিয়ে যখন শরীর মন একটু শ্রান্ত হয়ে আসছে ঠিক সেই সময়ে দ্বীপান্তরের কারাবাস মাথায় নিয়ে ছুটি কিশোরী মেয়ে ঢুকলো আমাদের পাষাণ পুরীর দরজা দিয়ে। তাদের প্রাণের বাঁশী, তাদের হাসির কলরোল আমাদের ক্লান্ত জীবনে আর সেই অচলায়তনের পাষাণ বুকে একটা প্রকাণ্ড বড় দোলা দিয়ে দিল। তারা ঢুকল গান করতে করতে "অত্যাচার অত্যাচার ধ্বংস কর শক্তি তার"। জেলের প্রতিটি ইট-পাথর আর তার সঙ্গে সঙ্গে বন্দীর উৎপীড়ন-ক্লান্ত আত্মাও যেন তাদের সেই গানের সুরে প্রতিধ্বনি করে গেয়ে উঠল

"অত্যাচার অত্যাচার ধ্বংস কর শক্তি তার"।

এরা কুমিল্লার ছাত্রী শ্রীমতী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। আমরা সবাই তাদের ঘিরে বসে আছি—এমন সময় জেলের একটি কর্ম্মচারী এসে আমায় ডেকে বলে গেলেন যে ওদের বিচারে পঁচিশ বছরের শাস্তি হয়েছে। বিচারপতি ওদের সামনে রায় দেন নি—ওরা চলে আসার পর দিয়েছেন। আমি ওদের এই কথাটী বলার পর ওরা যেন বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। একজন আমায় বলল "কল্যাণী দি আমরা যে মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম"। অনেক বিপ্লবীর মতন ওরাও পণ করেছিল—সর্ব্বস্ব পণ—জীবন পণ—দেশ মাতৃকার বেদীমূলে। আমি বললাম—এত বছরের জন্য কারা-জীবন, এও যে খুব বড় কঠোর সাধনা—একেও মাথা পেতে গ্রহণ কর!

তারপর মেট্রণ এসে জানাল যে ওদের সঙ্গে আমরা মিশতে পারব না ওরা গান করতে পারবে না—আমাদের সঙ্গে খেতে পারবেনা ইত্যাদি। দুই একদিনের ভেতর বিকেল বেলা এলেন ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে আইন অমান্য করে বহু ছাত্রী ও মহিলা। তাঁদের হাসি ও কলকোলাহলে আমাদের আগের কদিনের অবসাদ প্রায় সবটাই কেটে গেল। জেলের আইন কানুনের গণ্ডি আর কেউ মেনে চলছে না—মানানর জন্য কোন চেষ্টাও আর হল না। ১৯৩০ সনের আন্দোলনে জেলে এসে যে গাছটির ওপর পতাকা উঠিয়েছিল একটি সত্যাগ্রহী মেয়ে, সেই গাছটির আশে পাশে যাওয়া এতদিন বারন ছিল। এখন সবাই সেখানে গিয়ে বসি, গল্প করি। মাঝে মাঝে খুব হাসির রোল উঠতে থাকে। আমাদেরই একজন নাকি জেলের জমাদারনীকে বলেছেন ঘরের ময়লা পরিষ্কার করতে। জেলের বাহিরে যারা আবর্জ্জনা পরিষ্কার করে তাদের জমাদারনী বলা হয়। জেলের জমাদারনী যে অন্য জিনিষ সে তো আমাদের জানা ছিল না। সেত ক্ষেপে আগুন। সে হল জেলের কর্ত্রী—তাকে এই অপমান। অনেক করে তার রাগকে শান্ত করি।

আমরা পুরান বাসিন্দারা নতুন অতিথিদের সব রকমের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিতে লাগলাম। এই সময় হঠাৎ জেল কর্ত্তৃপক্ষ আমায় তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করলেন। সঙ্গিনীদের মধ্যে

অনেকে তৃতীয় শ্রেণীতে রয়ে গেলেন বলে মনটা খারাপ হয়ে রইল খুবই।

তারপর প্রেসিডেন্সি জেলে আর আমাদের জন্য স্থান সঙ্কুলান করা সম্ভব হল না। তা ছাড়া জেলের সাধারণ শ্রেণীর বন্দীদের সঙ্গে মিশে আমরা নাকি তাদের ভিতর রাজনৈতিক চেতনা এনে দিচ্ছি। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। কর্ত্তৃপক্ষ সত্যিই শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কয়েক দিনের ভেতর একটি নতুন মেট্রণকে সব বিষয়ে তৈরী করিয়ে নিয়ে—আমাদের বেশীর ভাগ বন্দীদের হিজলী জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। প্রেসিডেন্সি জেলে প'ড়ে রইলেন তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরা—অসহায় ও নিরুপায় হয়ে দিন কাটাবার জন্য। সেখানকার ঐ নির্ম্মম অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্য বা প্রতিবাদ করবার জন্য পেছনে তাঁদের কেউ রইলনা।

## হিজলী জেলে—

আমরা অনেকে মিলে হিজলী জেলে এলাম। খড়্গপুর ষ্টেশনে নেবে সেখান থেকে বাসে বা ট্যাক্সিতে হিজলী যেতে হয়। মেয়েদের জেল থেকে অল্পদূরেই ছেলেদের বন্দী শিবির। দূর থেকে তার শিখরের চূড়াটী দেখা যায়। সেখানে রোজ সন্ধ্যায় একটি আলো জ্বালা হোত। সেই জেলে ঢুকেই মনে পড়ে গেল রাজবন্দীদের ওপর গুলি করার দিনটি। অসহায় বন্দীদের গুলি করে মারা বোধ হয়

পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম ঘটনা। সমস্ত দেশবাসীর বুকে কি আলোড়নই না এনেছিল সেদিনের এই দুর্ঘটনা। বিমলদির সঙ্গে খবর পেয়েই হিজলীতে চলে এসেছিলাম। বন্দীদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পাই নি বলে সারাদিন লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁদের অবস্থা দেখে গিয়েছিলাম। কারুর হাতে গুলি লাগাতে হাতটি কেটে ফেলা হয়েছে। তবু তাঁর মুখে কি হাসি। কারুর পায়ে, কারুর মাথায় ব্যাটনের আঘাত। যাঁরা গুলির আঘাতে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন—তাঁদের সেবা করতে এসেছিলেন যে বন্দীরা—উন্মত্ত সেপাইরা তাঁদেরও ব্যেয়নেট দিয়ে গুরুতর ভাবে আঘাত করেছিল। তার পর মনে পড়ে গেল সেই শহীদ সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন গুপ্তের মৃতদেহ নিয়ে রাত্রির গভীর অন্ধকারে মশাল জ্বালিয়ে কলিকাতা নগরীর পথ দিয়ে শ্মশান যাত্রার দৃশ্য। কেওড়াতলার শ্মশান ঘাটে গঙ্গার তীরে রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে চিতার আগুন জ্বলে উঠল আর জনতা চিৎকার করে বলতে লাগল—"অত্যাচারীর রক্ত চাই"। তারপর মনুমেন্টের নীচে বিরাট জনতার সামনে দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের সেই গম্ভীর বাণী—

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু—নিভায়েছে তব আলো
তুমি কি তাদের করিয়াছ ক্ষমা বেসেছ তাদের ভালো"

প্রেসিডেন্সি জেলের ঐ টুকু উঠানে এক এক সময় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত। হিজলী জেলের বড় বড় সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ—বড় বড় ঘর—মনে হল একটু ডানা মেলে

থাকতে পারব এই বড় খাঁচাটীতে।

কিন্তু জেলে শান্তিতে থাকা আমাদের বিশেষ করে আমার কপালে যেন লেখা ছিল না। কলকাতা জেলের মেট্রণের একজন বান্ধবী এখানে মেট্রণ হয়ে এসেছিলেন। কলকাতার মেট্রণ আসবার সময় বলেছিলেন "ইফ উড বি কাইণ্ড টু হার—সি উইল বি কাইণ্ড টু ইউ"। দ্বিতীয় দিন থেকেই কিন্তু তার সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্রপাত হল একটি মেয়ে কয়েদীকে নিয়ে। আমাদের কাজ করবার জন্য প্রেসিডেন্সি জেল থেকে দশ বারটী সাধারণ শ্রেণীর বন্দীদের আনা হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে সকাল বেলা তাদের ঘর থেকে একটি কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে অনেকে সেখানে গেলাম। গিয়ে শুনলাম একজনের পেটে সারারাত কিসের এক যন্ত্রণা হয়েছে। সব শুনে মনে হল হয়তো কলিক পেন। ডাক্তার বাবুকে দেখান দরকার। তাকে ময়লা পরিষ্কারের কাজ করতে হোত। এই কাজটী করলে মাসে বেশী দিনের মাফি পাওয়া যায়—তাই ব্রাহ্মণ কন্যাকেও ঐ কাজ বেছে নিতে দেখেছি।

মেট্রণ ঘরে ঢুকেই বল্লেন ওর কোন অসুখ নেই, সমস্তটা ও অভিনয় করছে। অতএব তাকে কাজে যেতেই হবে। আমাদের অনেক বার "গেট আউট" বলে সরাতে না পেরে বলল "জান এরা সব আমার সম্পত্তি—আমি এদের নিয়ে সব কিছু করতে পারি। এদের বাঁচিয়ে রাখতে পারি—মেরে ফেলতে পারি। তোমরা এসব ব্যাপারে হাত দিতে

এস না"। আমরা কিছুতে সে স্থান ত্যাগ করলাম না দেখে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করতে চলে গেল।

আমাদের জেলের বাড়ীর গায়ে লাগান সেই মেট্রণের ঘর। পাঁচিলের নীচে একটি ছোট গর্ত্ত মতন ছিল। বেড়ালরা ওর ভেতর দিয়ে যাতায়াত করত। তারপর প্রায়ই দেখতাম কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটা হাত ওদিক থেকে বার হয়ে আসছে—আর এদিক থেকে কোন কয়েদী বা জমা-দারিণীর হাত থেকে রুটী মাখন চলে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য আমাদের বরাদ্দ রুটী মাখনের সংখ্যা রোজই কম পড়ত। আমরা কোনদিনই এ সব নিয়ে অভিযোগ করিনি।

মেট্রণ আমাদের নামে রিপোর্ট লিখে একটি মস্ত বড় খাতা শেষ করে ফেললেন—তবু আমাদের শাস্তি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না। একদিন সুপারিণ্টেডেণ্ট সাহেবের কাছে নিবেদন জানালেন যেন আমাকে দিয়ে সমস্ত জেলখানাটী পরিষ্কার করা হয়। মুলাকাত (বাড়ীর সকলের সঙ্গে দেখা করা) বন্ধ করিয়ে বা প্রাপ্য মাফি কমিয়ে দিয়ে আমাদের দমন করা সম্ভব হবে না। জেলার বাবু একদিন হাসতে হাসতে এই কথাটি আমাকে বলেছিলেন। ঠিক কি কারণে জানি না একদিন চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে মেট্রণকে চলে যেতে হল। ওর প্রতি কাইণ্ড হওয়া আর হয়ে উঠলনা—ওরও আমার প্রতি কাইণ্ড হওয়া সম্ভব হল না। দেওয়া ও পাওয়ার ওপরই জগতটা চলছে।

অল্প কয়েকদিন পরে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে আরও কয়েকটী রাজনৈতিক বন্দীদের আমাদের কাছে নিয়ে আসা হল। তাঁরা এসেই খবর দিলেন যে ট্রেণে তাঁরা শুনতে পেয়েছেন বীণা নামে একটি ছাত্রী কনভোকেশন হলে গভর্ণরকে গুলি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ১৮ বছর বয়স হয়নি বলে শান্তি স্নীতির ফাঁসি হয়নি—কিন্তু নতুন অর্ডিন্যান্সের বলে বীণার ফাঁসি অনিবার্য্য এ কথাও তাঁরা শুনে এসেছেন বললেন। বীণা আমারই ছোট বোন।

পরদিন পুলিশ ইন্সপেক্টর এসে আমায় জেরা আরম্ভ করলেন—জিনিষ পত্র তল্লাসী করলেন। বাড়ীর সঙ্গে কোন যোগই আর রাখতে পেলাম না। চিঠি পত্র দেখাশুনা সব বন্ধ হয়ে গেল। তার পর থেকে প্রতিদিনই ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেত। বাল্যবন্ধু সুলতা কি আভাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতাম। তারা আমার বুকের ভেতর কি ঝড় বইছে তার আভাস পেয়েও মুখে কিছু বলত না। স্নেহের স্পর্শ দিয়ে মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে দিত। সেই ভোর রাত্রে চোখের সামনে ভেসে উঠত বীণার জীবনের এক একটি ঘটনা। সাত কি আট বছরের মেয়ে নিয়মিত চরখা কাটে মোটা খদ্দরের জামা কাপড় পরে—বিলিতি জিনিষ স্পর্শ করে না। একদিন মা ও দিদিদের সঙ্গে ৺দেশবন্ধুর বাড়ীতে গেছি,—গান্ধীজীকে দেখতে। বীণা চরখা কাটে শুনে গান্ধীজী ওকে কোলে নিয়ে বসিয়ে কত যে আদর করেছিলেন। তার পর একবার মেয়েদের সভায় গান্ধীজী দেশের কাজের

জন্য মেয়েদের কাছে ভিক্ষা পাত্র ধরলেন। ছোট মেয়ে বীণা এগিয়ে গিয়ে তার হাতের সোনারচুড়ি সব খুলে দিয়ে এল।

আর একদিনের ঘটনা। পুরীতে আমাদের বাড়ীর সকলে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়েছি। সঙ্গে স্বামীহীনা মামীমা তাঁর একমাত্র কন্যাকে নিয়ে গেছেন। বীণা আর তাঁর মেয়ে অনু একসঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে সে বছর। একদিন দুপুরে কাউকে না বলে নুলিয়াকে নিয়ে সমুদ্রে স্নান করতে চলে গেছে। মামীমা ওদের খুঁজতে গিয়ে দেখেন দুজনে অতল জলে পড়ে গিয়ে ওরা আর ফিরে আসতে পারছে না। নুলিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করছে দুজনকে বাঁচিয়ে রাখতে। হঠাৎ বীণা নুলিয়ার হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে দিয়ে বলল—"ওকে নিয়ে তীরে চলে যাও"। দুজনকে বাঁচান সম্ভব নয়—তখন একজনই বাঁচুক। দূর থেকে যখন দেখা গেল বীণা ধীরে ধীরে গভীর জলে মিলিয়ে যাচ্ছে—তখন তীরের নুলিয়ারা ঝাঁপিয়ে গিয়ে উঠিয়ে নিয়ে এল। মনে পড়ে গেল—বালিগঞ্জের বাড়ীর সামনে একটি ঘটনা। গাড়ীতে বেশী বোঝা হওয়াতে গরু যেন আর গাড়ী নিয়ে চলতে পারছে না। গরু চালক তাদের মেরেই চলেছে। ওপর থেকে বীণা নেবে এসে গাড়ী থামিয়ে ইটের বোঝা অর্দ্ধেক নামিয়ে নিল। সেগুলি যথাস্থানে পৌছে আবার ফিরে আসা পর্য্যন্ত বাকি ইটগুলি পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রায় এক ঘণ্টা।

আর একটি ঘটনা—বাবার বাড়ীর পাশের মাঠে ছোট চালা ঘরে দিন মজুরের বৌ কমলা শাশুড়ীকে নিয়ে থাকত। প্রতি দিনই তার ওপর কত নির্য্যাতন চলত। কতদিন স্বামী মার কাছে নালিশ শুনে মারতে আরম্ভ করত। কমলার দুঃখে বীণা যেন পাগল হয়ে উঠল। একটি প্রথম ভাগ নিয়ে চুপি চুপি তাকে পড়াতে যেতেও দেখেছি। মা বলতেন—"অমন গোঁয়ার রাগী ওর স্বামী—তোকে যদি কোন দিন অপমান করে দেয়"। একদিন হঠাৎ শুনলাম কমলা তার দুঃখের সংসার ফেলে কোথায় যেন চলে গেছে। কিছুদিন পরে মা ও ছেলে চালাঘর ভেঙ্গে দয়ে নতুন বাসা গড়তে চলে গেল।

তারপর সেই চট্টগ্রামের বীর তরুণদের গৌরবময় সংগ্রাম ইংরেজের প্রবল শক্তির সামনে সোজাসুজি দাঁড়িয়ে। বীণার আর সেই সব কথা শুনে শুনে তৃপ্তি নেই। ছোট ছেলে মেয়ে যেমন করে শোনে রাজার গল্প—তেমনি করে "বল ফনীদাদা আরও বল—আরো শুনি"। বাবা বলতেন—এবার তোমার ফনীদাদাকে ছুটি দাও মা—উনি যে শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

"আচ্ছা বাবা ওরা তোমার দেশের ছেলে তোমার গর্ব্ব হচ্ছে না? হলই বা তারা হিংসা পন্থী"। বাবাকে হেসে স্বীকার করতেই হোত যে তারা বীর—তাদের জন্য তাঁকে গর্ব্ব করতেই হয়।

শান্তি সুনীতির ধরা পড়ার কথা, তাদের ওপর অত্যাচারের কথা সবই শুনতে পেলাম। মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখি—জানালার গরাদে ধরে বসে আছে। "তুই কি ঘুমুবি না—মা বাবাকে কাল সব বলে দেব"। "কি করব ছুটুদি—ঘুম যে আসে না। এত দুঃখ মানুষ আর যে সহ্য করতে পারে না। এত অত্যাচার অন্যায় চারিদিকে—কিসে এর প্রতিকার? কি করলে মনে শান্তি পাব ভেবে পাই না, এমনি কতদিনের ছোট বড় কত ঘটনাই না একটি একটি করে মনে পড়ে যেত। বাবা মা ভাই বোন ও বন্ধুদের কি গভীর ভালবাসাই না ওর জীবনটিকে ঘিরে রেখে দিয়েছিল।

—খেতে বসলে বাবা মা বৌদি এসে বসে খাওয়াতেন। ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গবার আগেই বাবা বাড়ীর গাছের বেল ফুল তুলে ছোট থালায় করে আমাদের বিছানার পাশে রেখে যেতেন। তাঁর মেয়েরা ফুলের গন্ধে জেগে উঠবে। আজ সেই বীণা—কি কঠোর জীবনকেই না বরণ করে নিল। অতখানি স্নেহ ভালবাসা তাকে ঘরে শান্তি দিল না। অশান্ত করে ঘরের বাইরে নিয়ে এল। প্রতিটি ভোর রাত্রে ভাবতাম আজকের ভোরবেলা বোধ হয় এক অনন্ত ব্যবধান নিয়ে আসবে এই পৃথিবীতে, এত বছর একসঙ্গে এক বাবা মার বুকে মানুষ হওয়া দুটি বোনের মধ্যে। যখন ডাকবে তাকে ফাঁসির মঞ্চে যাবার জন্য— কি তৃপ্তিই না ফুটে উঠবে ওর মুখখানিতে। সে যে মরতে চেয়েছিল—একান্ত ভাবে চেয়েছিল মানুষের দুঃখ

যদি এতটুকু দূর হয়—পরাধীনতার শাপ মুক্ত যদি হয় তার পরাধীন দেশে এই আশাই বুকে নিয়ে।

বাবা মার কথা বড় মনে হত। আমকে ধরতে পারে এই অনিশ্চিৎ সম্ভাবনার কথা ভেবে মাঝে মাঝে বাবা অস্থির হয়ে পড়তেন। মা বলতেন বাবাকে—"মেয়েত তোমর কোন অন্যায় কাজ করছে না—কত ছেলে মেয়ে দেশের জন্য জেলে যাচ্ছে তোমার মেয়ে যদি যায়ও—তুমি অস্থির হবে কেন?" আজও কি মা তেমনি করে বলতে পারছেন—"মেয়েত তোমার অন্যায় কিছু করেনি তুমি অস্থির হচ্ছ কেন"? পরে শুনেছিলাম বাবার মাথার চুল নাকি এক রাত্রে সাদা হয়ে গিয়েছিল।

ঘটনার আগের দিন সমস্ত রাত বীণা ঘুমায়নি। ডায়-সেসান কলেজের হোষ্টেলে একটি মেয়েকে বলেছে ক্রমাগত গান করনা ভাই—ভাল ভাল স্বদেশী গান। বড় শুনতে ইচ্ছা করছে। বন্ধু তাকে গানের পর গান শুনিয়েছে। তার পর ঘুম ভেঙ্গে বন্ধু দেখেছে বীণা আকাশের দিকে তাকিয়ে জেগে বসে আছে।

ঘটনার পরের দিন বাবা মাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বীণাকে দেখতে ইলিশিয়াম রোডের বাড়ীতে। বীণাকে বলা হল—দেখুন আপনার বাবা মার কি অবস্থা হয়েছে। বলেদিন শুধু কে আপনাকে রিভলভারটি দিয়েছে—তাহলে ওঁরা বাড়ী নিয়ে যাবেন। বীণা নাকি একটু হেসে বলে-ছিল—"আমার বাবা মা এমন শিক্ষা দেননি আমায় যাতে

আমি বিশ্বাস ঘাতকের কাজ করব। বাবা শুনে বলে ছিলেন "না মা আমি তোমায় সে কথা কখনও বলব না। যা করেছ তার সম্পূর্ণ দায়ীত্ব তোমার ওপরই নিও। আর কারুকে যেন কোন ক্ষতিই স্পর্শ না করে"। এ কথা শুনে পুলিশ ইন্সপেক্টর বাবু মা বাবাকে সেখান থেকে নিয়ে চলে যান।

তাই হয়তো পুলিশ আমার সঙ্গে বাড়ীর কোন সম্বন্ধ রাখতে দিতে চাইত না। অনেকদিন কারুর কোন খবরই পেলাম না।

এমনি এক অনিশ্চয় দুর্ভাবনার ভেতর দিয়ে যখন দিন রাত্রি কাটাচ্ছি—তখন একদিন জেলের এক কর্ম্মচারী এসে খবর দিলেন আড়ালে ডেকে নিয়ে "আপনার বোনের ফাঁসি হয়নি—নয় বছরের জেল হয়েছে। স্পেশাল ট্রাইবুলেনের সামনে চমৎকার একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। সরকার সেটি ছাপান বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনার বোনকে ফাঁসি দিতে সরকার ভয় পেয়েছেন।" তাঁকে আমার মনের কৃতজ্ঞতা জানাবার আগেই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

আইন অমান্য করে হিজলী জেলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে গুজরাট মহারাষ্ট্র ও মাড়োয়ার প্রদেশের মহিলারাও ছিলেন। আমার শোবার জায়গার ঠিক বাঁ পাশটীতে একটি মাড়োয়ার দেশের বর্ষিয়সী মহিলা থাকতেন। রাত্রে প্রায় তাঁর ছোট মেয়েটীর নাম করতেন আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতেন। ওর জন্য তাঁর মনটা সব সময় উদ্বিগ্ন থাকত। কত সময় দেখতাম রাত্রে

উঠে বসে আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে বোলতাম "মাতাজী আপনার মেয়ে সুস্থ আছে, তাকে গিয়ে সুস্থই দেখতে পাবেন। বড় ভালবাসতেন আমাদের। দিনের বেলা তাঁর নিজের জন্য তৈরী করা রুটি ও তরকারী আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। ছয় মাসের জেল জীবন শেষ করে বাড়ী গেলেন তাঁর মেয়ের কাছে। আমরাও যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তারপর অনেক বছর পরে মুক্তি পেয়ে যখন বাড়ী ফিরলাম—তখন খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে তাঁর সেই কন্যাটী নাকি কিছুদিন পরেই মারা গিয়েছে। তাঁর সঙ্গে আর দেখা করতে পারিনি। কিন্তু বার বার মনে হোতো—ছয় মাসের বিচ্ছেদে যে মার বুক থেকে কত দীর্ঘশ্বাস পড়ত—চিরদিনের এই ব্যবধানের বেদনা সেই মা কি করে সহ্য করছেন।

বিদেশী মহিলারা আমাদের কাছে বাংলা পড়তেন। বাংলা শেখবার জন্য তাঁদের বেশ আগ্রহ দেখতাম। তাঁরা ছিলেন সকলেই নিরামিশাসী। দু একদিন একটু অপ্রিয় ঘটনাও ঘটত তাঁদের নিয়ে।

সকলকে টিকে দেওয়া হচ্ছে। অমুক "বেন"—প্রায় বৃদ্ধাই বলা যায় কিছুতেই টিকে নেবেন না। বলেন ওর ভেতরে গরুর রক্ত আছে—গান্ধিজী পছন্দ করতেন না ইত্যাদি। সকলে মিলে সারাদিন ধরে বোঝানতেও তিনি সম্মত হলেন না। জেলকর্তৃপক্ষ হয়তো শাস্তি দেবেন ভেবেছিলাম। কিন্তু ওঁর বেশীদিন আর বাকি নেই ভেবে হয়তো চুপ করে গেলেন।

বন্ধু আভা জেলের মধ্যে সব চেয়ে বেশী শক্তি রাখত শরীরে। তার চেহারা দেখে সত্যিই তৃপ্তি পেতাম। শরীরের মতন মনেও অপর্য্যাপ্ত উৎসাহ ও আনন্দ। এতটুকু অন্যায় সহ্য করবার শক্তি নেই—আবার পরের উপকার করবার অদম্য উৎসাহ। টাগ্ অফ ওয়ার বা হাডুডু খেলায় তার দলকে কেউ কোনদিন হারাতে পারেনি। ছয়মাসের শেষে মুক্তি পেয়ে বাইরে চলে গেল। ছয় বছর পরে ফিরে এসে শুনলাম ওর খুব অসুখ হওয়াতে মধুপুরে আছে। নিজের জীবনের সঙ্গে বহু সংগ্রাম তাকে করতে হয়েছিল। স্বামীর সাহায্য সে অনেকদিনই নেয় নি—একাই তিন চার জায়গায় টিউসানী করত—ছেলেকে ও মাকে প্রতিপালন করেছে —রাজনৈতিক বন্ধুদের সাহায্য করেছে। ভেতরে ভেতরে ভাল খাদ্যাভাবে দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছিল। রোজ একটি ছোট দোকান থেকে তেলেভাজা বড়া কিনে ক্ষিধে মেটাত। শেষে বেরি বেরি হয়ে—অনেক ভুগে মারা গেছে। পৃথিবীর কারুর কাছ থেকেই এতটুকু সাহায্য সে নেয়নি। আমায় যে অত ভালবাসত—তবু চিঠিতে ওর অসুখের কথা জানাল না। নিজের সামান্য গহনা সবই বিক্রি করে চিকিৎসাও কিছু করিয়েছিল। হিজলী জেলের সেই অপূর্ব্ব বুদ্ধি ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়ের ঐ ভাবে মৃত্যুর কথা ভাবলে সকলেরি চোখে জল আসে। আভার কত কথা যে মনে পড়ে। একদিন হিজলী জেলে সন্ধ্যাবেলা বন্ধ হয়ে রয়েছি। প্রায়ই অত মেয়ের মধ্যে কেউ না কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তেন। আমরা

সব পালা করে তাঁর পরিচর্য্যার ভার নিতাম। সেদিন দেখি ঘরের ভেতর একটি বড় বিছা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আভা দেখতে পেয়ে চটি দিয়ে তাকে মেরে ফেলল। মারা মাত্রই হঠাৎ সে পিঠের ওপর একটি কিসের এক আঘাত পেল। আমাদের একটি গুজরাট প্রদেশের বন্ধু বিছে মারায় বিরক্ত হয়ে ওর পিঠের ওপর প্রতিবাদ জানালেন। এর প্রতিবাদ জানাবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠলে জোর করে সেখান থেকে নিয়ে এলাম ওকে। হাসি গল্প দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে শক্তি থাকলে সেটা বাজে অপচয় করতে দিতে নেই- বড় কাজের জন্য জমিয়ে রাখতে হয়।

ঘটনার চক্র এমন ভাবেই ঘুরতে থাকে। ঠিক কদিন পরে রাত্রির অন্ধকারে কেমন করে যেন একটি ছোট সাপ ঘরে ঢুকে পড়লো। সেদিন ঐ বন্ধুটী অন্য সঙ্গিনীদের সঙ্গে ডাকা-ডাকি সুরু করলেন "আভা দেবী জলদি আইয়ে" মুহুর্ত্তের জন্য আভার বোধ হয় আগের দিনের অপমানের কথা মনে পড়ে গেল– কামড়াক্ না সাপ আমাদের সকলকে—সাপ মারলে বুঝি হিংসা করা হয় না? তারপরই একটু মিষ্টি হেসে চলে গেল সাপ মারতে। এমনি নানান রকম বৈচি-ত্র্যের ভেতর দিয়ে দিন আমাদের কেটে যাচ্ছিল। সব চেয়ে মধুগন্ধে জেলের আবহাওয়া ভরে রেখেছিল আরতি আভার মতন কয়েকটি সবুজ প্রাণ। তারা সৃষ্টি করত সব সময় একটা অনাবিল আনন্দ। একদিনের ঘটনা মনে হলে এখনও এত হাসি পায়।

আইন অমান্য আন্দোলনে নানান জেল থেকে বহু মহিলা ধরা পড়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বর্ষিয়সী মাসীমা স্থানীয়া অনেকেও এসেছিলেন। তাঁরা প্রায়ই জেলের ভেতর কোন বিশেষ দিন উপলক্ষে সভা আহ্বান করতেন ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করতেন। আমাদের সবাইকে সেই সভায় যোগ দিতে হোত। আরতিদের প্রায় বলতে শুনতাম—"জেলে এসে বসে বসে ঐ বক্তৃতা শুনতে আর ভাল লাগে না"। একদিন ঐ রকম এক সভা আহূত হয়েছে। অমুক মাসীমা এসে আমাদের যোগ দিতে অনুরোধ করে গেলেন ও বলে গেলেন আমি যেন নবীনদল নিয়ে অমুক স্থানে উপস্থিত হই। আরতিদের ডাকলে ওরা জানাল যে আমি যেন এগিয়ে যাই—তারা কিছু পরেই আসছে।

মনোযোগ সহকারে বসে বক্তৃতা শুনছি—হঠাৎ চেয়ে দেখি পতাকা হাতে আরতি—পেছনে একটি ছোটখাট দল। "বন্দেমাতরম্" বলে তারা সভায় বসে পড়ল। অল্পক্ষণ পরেই ওদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল—"সাপ সাপ" আর আভা তার চটিটা খুলে ছুটল সাপকে মারতে। আমি'ত তাকে যত শক্তি আছে তাই দিয়ে ধরতে চেষ্টা করলাম। চটি দিয়ে বিছে মারা যায়—কিন্তু সাপ? কেউ বললেন সাপটা পাঁচিলের ওপর দিয়ে উঠে চলে গেল—কেউ বললেন সাপটার রং কিন্তু কালোয় সাদায় মেশান ইত্যাদি। সাপটা পালিয়ে গেছে—সভাও ভেঙ্গে গেছে। তরুণীদল গম্ভীর মুখ করে ঘরে ঢুকলো। আবার সেই সন্ধ্যাবেলা বন্ধ

ঘরে বসে গান গল্প ও আলোচনা। ওদের দলের একজন বলল —যদি আমি অভয় দিই তবে ওদের একটি গুপ্ত সংবাদ আমার কাছে প্রকাশ করতে পারে। কাউকে কিছু বলব না বলাতে সে বলল যে সভা ভাঙ্গবার সঙ্কল্প নিয়েই ওরা সভায় গিয়েছিল। গোড়া থেকে সমস্ত ওদের পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুসারেই অভিনীত হয়েছিল। আমাকে বলার পর দেখি ওদের সকলেরি মুখে হাসি। ওদের প্রথমে অত ভয় পাবার কিছু ছিল না। মাতৃস্থানীয়ারা সকলেই কন্যাদের এই ছেলে মানুষী খেলাটীকে স্নেহভরে ক্ষমা করে নিতেন।

জেলখানায় একটি বড় দুঃখের ব্যাপার ছিল যে আমাদের অসুখের কথা কর্ত্তৃপক্ষ প্রায়ই বিশ্বাস করতে চাইতেন না। রাত্রে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে গরাদ ধরে আমাদের সমস্বরে চিৎকার করতে হোত—"জমাদারিণী, ডাক্তার বাবুকে খবর দাও। ঠিক সেই সময় আমরা যে বন্দী সেটা যেরকম ভাবে অনুভব করতাম—বোধ হয় তেমন আর কোন সময়েই করতাম না। জমাদারিনী হয়তো অনেকক্ষণ চিৎকারের পর ঘুম থেকে উঠে জমাদারকে খবর দিত। জমাদার ধীরে সুস্থে জুতা পরে জামা গায়ে দিয়ে যেত জেলার বাবু কি ডেপুটী জেলার বাবুকে খুঁজতে। তাঁরা কেউ উপস্থিত না থাকলে ডাক্তার বাবুকে আবার জেলের ভেতর প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। তার পর চলত ডাক্তার বাবুর সন্ধান। তিনি হয় তো থাকেন দুই কি তিন মাইল দূরে। চাবি আবার থাকে জেলার বাবুর কাছে। তাঁরা যদি বেড়াতে চলে গিয়ে থাকেন

ত ডাক্তার বাবুর সাহায্য পাওয়ার কোন আশাই থাকেনা। আমাদের অসুখ করলে—ডাক্তার বাবুরা তবু শীঘ্র আসতে চেষ্টা করতেন বা এসে চেষ্টা করতেন আমাদের কষ্ট লাঘবের জন্য। সাধারণ কয়েদীর অসুখ হলে ডাক্তার বাবুর আগমনের আশা খুব কমই থাকে। ডাক্তার বাবুরা অনেক সময়ে বন্দীদের অসুখকে মানসিক পীড়া বলে অগ্রাহ্য করতেন।—বহরমপুর জেলে দেখেছি কোন বন্দীর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। ডাক্তার বাবুকে—সিভিল সার্জেনকে কত অনুরোধ করেছি চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার জন্য। তিনি সোজা বলে দিলেন– "এত ওঁর মনের অসুখ"। আমাদের কত সময়ে গামলায় রাখা রক্ত জমাদারিনী বা পাহারাওয়ালীকে দেখিয়ে তারপর পরিষ্কার করতে হয়েছে। তারা ডাক্তার বাবুকে বললে তবে তিনি বিশ্বাস করেছেন।

হিজলী জেলে আমাদের সঙ্গে একটি অল্প বয়সের মুশলমান মেয়ে ছিল। তার স্বামীই তাকে উৎসাহ দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। জেলে আসার পর তার অন্য আত্মীয়েরা দেখা করতে এসে কত বুঝিয়েছিলেন ক্ষমা চেয়ে বাইরে চলে যাবার জন্য। সে কিন্তু কিছুতেই রাজি হয়নি। আমাদের কাছে পড়াশুনা করত—এক সঙ্গে গল্প খেলা ও বেড়ানর ভেতর দিয়ে ও আমাদের সকলের এত প্রিয় ও আপন হয়ে গিয়েছিল। একদিন একটি সঙ্গিনী প্রশ্ন করেছিল—"তুমি ভাই ফাঁসি যেতে পারবে"? সরলা বালিকা উত্তর দিয়েছিল —"আমার স্বামীও যদি সঙ্গে থাকেন তবে নিশ্চয়ই পারব—

তবে একা ভাই পারব না"। ও যে মুসলমান মেয়ে সে কথা মনে পড়িয়ে দেবার মতন কিছুই ছিলনা ওর ভেতর। যখন মুক্তি পেয়ে নিজের গ্রামে গিয়েছিল—একদিন শুনেছি পুকুর ঘাট থেকে ফেরবার সময় হঠাৎ মাথায় লাঠির আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার সমাজের কোন লোকেরা নাকি তাকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবার অপরাধের শাস্তি দিয়েছিল এইরকম ভাবে।

ওরই সমবয়সী আর একটি মেয়ে জেলে এসেছিল ২৬শে জানুয়ারী মনুমেণ্টের তলায় ধরা পড়ে। চারিদিকে পুলিশের লাঠি—ঘোড় সোয়ারের আক্রমণ—সব দেখেও একটুও ভয় পায়নি। তার কাছেই শুনেছিলাম যে দশবছর বয়সে তাকে গৌরীদান করা হয়। মৃত স্বামীকে তার কিছুই মনে ছিলনা। বড় দিদির স্বামী তাকে ছোট বেলা থেকে কোলে করেছেন, আদর করেছেন। বাড়ীতে ওর বৈচিত্রহীন জীবনে কিছু নতুনত্ব আনতে আর বাহির জগতে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে মনের প্রশস্তি লাভ করবার জন্য তিনিই ব্যবস্থা করে ওকে জেলে পাঠিয়েছেন ওর মামার সাহায্য নিয়ে। অন্য সঙ্গিনী-দের সঙ্গেও পড়াশুনা করত—খেলা করত—গান করত। অন্য-দের সঙ্গে ওকে কতদিন সাজিয়ে দিতাম। প্রথম প্রথম লোকের নিন্দাকে ভয় পেয়ে ও সাজতে চাইত না। বাড়ীতে তাকে রাখা হত সন্ন্যাসিনীর মতন। দেখতে খুবই সুন্দর। কখনও হয়তো ঘুমিয়ে আছে মনে করে কোন মাসীমা বলতেন—"আহা অমন সুন্দর দেখতে—কিন্তু কপাল খানা

কি পোড়া—কোন দিনই কোন সাধ আহ্লাদ করতে পারবে না"।

কিছুদিন পরে মনের দিক দিয়ে ও অসুস্থ হয়ে পড়ল। সংসার ও সমাজ তার স্বাভাবিক যত ইচ্ছা ও বাসনা সবগুলিকে এতদিন টুটি চেপে রেখে দিয়েছে। ও খালি ভাবত —কোনদিনই সাজতে পারবে না, কোন আনন্দে যোগ দিতে পারবে না। তারপর শরীর যখন দুর্ব্বল হোল—চাপা দেওয়া ওর সব অতৃপ্ত বাসনাগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তাদের সংযত করে রাখার মতন মনের শক্তিও আর রইল না। কিছুক্ষণ পরে পরেই তাকে নতুন নতুন বেশে সাজাতে হোত। নয়তো চিৎকার করত—বা অজ্ঞান হয়ে যেত। কিছুদিন দরজা বন্ধ করে রাখতে হত। আরতিদের দলের ও সভ্যা ছিল। উৎসাহী সভ্যা। তার এই রকম অসুস্থতায় সকলেই বড় নিরুদ্যম হয়ে গেলাম।

একদিন ওর অসুখ খুব বেশী হওয়াতে মাঝরাত্রে ডাক্তারবাবু এসে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ঘরের দরজা খোলা হয়েছে—সকলেই আমরা বাইরে মাঠে এসে গেছি। এই সুযোগে জেলের এক কোণে ছোট একটি ঘরে আমরা চুপি চুপি ঘুরে এলাম। সব সময়ে জমাদারিনীরা বলত—তারা নাকি দেখেছে যে রোজ মাঝরাত্রে ঐ ঘরে লাল রংয়ের শাড়ী পড়া একটি বৌ চরখা কাটে। আমরা গিয়ে দেখি কোথাও কিছু নেই। হাওয়ায় ভাঙ্গা দরজাটী খোলে আর বন্ধ হয়। একটি শব্দ হয় সত্যি—

তবে চরখার শব্দের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য পেলাম না—কারুর কান্নার সঙ্গে তুলনা করা যেতেও পারে।

নলিনীদের সমবয়সী আর একটি মেয়ের কথা বড় মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা অনুশোচনার ভাবও মনে এসে যায়। বড় শান্ত ধীর মেয়েটী—মুখে হাসিটী লেগেই থাকত। সেও আমাদের ছাত্রী ছিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে নাকি বড় কষ্ট পেয়েছিল। মা বাবার অমতে জেলে এসে-ছিল বলে তাঁরা ফিরে যাবার পর ওকে বেশী ভাগ সময়ে তালা চাবি দিয়ে বন্ধ রাখতেন। ভয় ছিল মেয়ে বুঝি আবার কাজে যোগ দেয়। আমি ছাড়া পাবার পর—একজন বন্ধু অনুরোধ করেছিলেন যে আমি যেন গিয়ে ওর বাবা মার সঙ্গে কথা বলে বুঝিয়ে আসি। কেমন যেন একটু ভয়ও হয়েছিল তাঁদের কাছে যেতে—তাছাড়া অল্প দিনের মধ্যে আবার ধরা পড়ায়—ওর দুঃখের জীবনে আর গিয়ে পড়তে পারিনি। ও হয় তো আমরা যাব আশা করেছিল। তাই এখনও মনে পড়লে বড় দুঃখ হয়। বিরাট জগতে ওকে এখন হারিয়ে ফেলেছি। শুধু কামনা করি যেখানেই থাকুক—সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক।

এমনি সুখ দুঃখের ভেতর কয়েকমাস হিজলী জেলে থাকার পর একদিন খবর এল যে সেখানটা হবে রাজবন্দী মেয়েদের বন্দীনিবাস, আমাদের বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে।

# বহরমপুর জেলে

আমাদের শেষের দল হিজলী ছাড়বার আগেই রাজবন্দী মেয়েরা সব এসে গেলেন। সবাই এতদিন নানান জেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এখন একত্র করে তাঁদের এখানে রাখা হল। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী হয়েছেন তাঁরা। প্রকাশ্য কোন বিচারই হয়নি। ওঁদের দেখে মন সহানুভূতিতে ভরে উঠত। প্রিয়জনদের কাছ থেকে কতদূরে কতদিন রয়েছেন। আরও কতদিন থাকতে হবে তাও জানেন না। অনিশ্চয়তা বড় পীড়াদায়ক। ভাগ্য বিধাতা হয়তো তখন মনে মনে হেসেছিলেন। কয়েকমাস পরেই ওঁদের সঙ্গিনী হয়ে আসতে হয়েছিল।

বহরমপুরে যাবার পথে একটি ষ্টেশনে আমাদের বসিয়ে রেখেছিল অনেকক্ষণ। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে কয়েকটী ছেলে বন্দীকে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম। তাদের পায়ে ডাণ্ডা বেড়ি লাগান—তাই অতি কষ্টে দাঁড়াচ্ছে নয় শুয়ে পড়ছে। রাজশাহী জেল থেকে ওদের স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। আমাদের জানিয়ে দিল যে রাজশাহীতে বন্দীদের ওপর অত্যাচার চলছে। চট পরিয়ে—ফ্যান ভাত খাইয়ে ঠাণ্ডা ঘরে রাখা হচ্ছে। বয়সে তারা খুবই ছোট। যা সামান্য পাথেয় দেওয়া হয়েছে তাতে তাদের অর্দ্ধভুক্তই থাকতে হয়েছে। মাথায় বহুদিন তেল নেই—মুখগুল যন্ত্রণায় ম্লান হয়ে গিয়েছে। তাদের সেই করুণ মুখগুলি যেন আজও চোখে ভাসে।

বহরমপুর জেলে গিয়ে দেখি—সেখানে যেন এক প্রকাণ্ড মহিলা সম্মেলন আরম্ভ হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে মেয়ে বন্দীদের এনে সেখানে একত্র করা হচ্ছিল। সব শুদ্ধ আমরা বোধহয় দুইশত জনের বেশী ছিলাম। সেখানে খাটুনী আমাদের অল্প—দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ তকলী কাটা।

তারপর আমরা গেটের সামনে "বন্দেমাতরম্" শুনলেই ছুটতাম নতুন অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করতে। হাত ধরে সব জেলটা ঘুরিয়ে দেখাতাম। তাঁদের কাপড় জামা কম্বল বিছানার ব্যবস্থা করে দিতাম। কোন্ জেলা থেকে আসছেন—সেখানে কেমন আন্দোলন চলছে ইত্যাদি প্রশ্নের ধূম পড়ে যেত। আস্তে আস্তে জেলটাকে যেন স্কুল সংলগ্ন বোর্ডিং বাড়ী করে ফেললাম। সকালে উঠে সকলকে নিয়ে জেলের মাঠে প্যারেড করতে আরম্ভ করলাম। কর্তৃপক্ষ প্রথম দুই একদিন আপত্তি জানিয়ে শেষে নীরব হয়ে গেলেন।

তারপর স্নানাহারের পর বড় বড় ঘরগুলিতে স্কুল বসে যেত। শিক্ষয়িত্রী আমরা সংখ্যায় খুব কম—কিন্তু ছাত্রী অনেক বেশী। বিকেল হলেই মাঠে খেলার ধূম। হাডুডু খেলাটাই সব চেয়ে প্রিয় ছিল। সন্ধ্যাবেলা ঘরে বন্ধ হয়েই জাতীয় সঙ্গীতের ক্লাস।

জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের নাম দিয়েছিলেন "সুভাষ বোসের দল। কখনও বা আমাদের কিছু জানাতে হলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলতেন—"সুভাষ দলের" নেত্রীকে এটা জানাও"।

মাঝে মাঝে কয়েকটি অপ্রিয় ঘটনা ছাড়া দিনগুলি আমাদের আনন্দের স্রোতেই কেটে যেত।—অমুক মাসীমা বিকেল বেলা চেয়ারে বসে গ্রাম থেকে আগতা মহিলাদের মাটিতে বসিয়ে গল্প করতেন। আমরা তাতে আপত্তি জানালাম। অমুক মাসীমা জেলের অফিসে গিয়ে জেল কর্ম্মচারীদের সামান্য কিছু সাহায্য করতেন। আমরা তাতে আপত্তি করলাম।—একদিন এক মাসীমা এসে বললেন যে তৃতীয় শ্রেণীর মেয়েরা তারপর দিন থেকে দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর মেয়েদের জল তুলে দেওয়া, কাপড় কেচে দেওয়া প্রভৃতি কাজ করে দেবে—এই কথা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁকে ডেকে বলেছেন। তিনি সেই ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়ে এসেছেন। রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত বন্দীদের ভেতর এই শ্রেণী বিভাগ ব্যাপারটা আমাদের কাছে বড় কষ্টকর ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদেরও উচ্চ শ্রেণীর বন্দীদের ভেতর কেমন করে যেন একটা অভিমানের প্রাচীর গড়ে উঠত। আমরা শত চেষ্টা করেও সেটা ভাঙ্গতে পারতাম না। তৃতীয় শ্রেণীদের খাবার খুবই খারাপ। তাই সকলের খাবার এক জায়গায় এনে আমরা একসঙ্গে বসে খেতাম। এতে কিন্তু তাঁরা কোনদিনই খুসী হতেন না। ভাবতেন তাঁদের প্রতি অনুকম্পা করেই বুঝি এই ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা যে কতখানি লজ্জা ও মানসিক অশান্তি থেকে বাঁচতাম সে খবরটা তাঁরা হয়তো বুঝতে পারতেন না।

মাসীমা যে ব্যবস্থা মেনে নিয়েছেন ওদের ভাল হবে ভেবে—আমরা তার প্রতিবাদ করে আলোচনা সভা করলাম এবং ঐ ব্যবস্থা আমরা মেনে নিতে অস্বীকৃত সেটাও জানিয়ে দিলাম। মাসীমা বোঝালেন গান্ধিজী ময়লা পর্য্যন্ত নিজে হাতে পরিষ্কার করেছেন। অতএব এসব কাজে কোনও অমর্যাদা থাকতে পারেনা। গান্ধিজীর ময়লা পরিষ্কার করার সঙ্গে এই ব্যাপারের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম না। সেচ্ছায় ময়লা পরিষ্কার করায় কোন অমর্যাদা নেই। কিন্তু বাধ্য হয়ে অপমানকর কাজ করায় আমরা সাহায্য করব কেন? আমাদের ভেতর বিভেদ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? একটু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল।

বড়দের সঙ্গে শ্রদ্ধার সম্পর্ক যতখানি রাখা দরকার তা আমরা সব সময়েই রাখতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু মত বিরোধটাকে মেনে নেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। আমরা সব সময়ে এই কথাটি মনে রাখতে চাইতাম—"মত ভিন্ন হলেও তার সঙ্গে বিনয় ক্ষমা ও শ্রদ্ধা সংযুক্ত করতে হয়"। বহরমপুর জেলের ভেতরে প্রায় পঁচিশ কি তিরিশটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ের শুভাগমন হয়েছিল। মায়েরা অনেক সময়ে ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে আসতেন। স্বামীরও হয়তো জেল হয়েছে—বাড়ীতে কার কাছে রেখে আসবেন। মেদিনীপুরের একটি পরিবার থেকে মা, জ্যেষ্ঠপুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাই, নাতি, নাতনী সবাই ভিন্ন ভিন্ন জেলে এসেছিলেন। একটি বন্ধু তিন মাসের মেয়ে নিয়ে জেলে ঢুকলেন।

ফিরলেন যখন—তখন সে তিন বছর পার হয়ে গেছে। তার নামকরণ উপলক্ষ্যে আমরা একদিন উৎসবের আয়োজনও করেছিলাম। নাম দেওয়া হয়েছিল "ঝঞ্ঝা"। গাইবান্ধা থেকে একজন মহিলা ধরা পড়ে এলেন—সঙ্গে তাঁর চার বছরের ছেলে। বিপ্লব বলে তাকে ডাকা হোত—আর সেই ছিল ছোটদের নেতা। একটি পতাকা হাতে নিয়ে চলত—পেছনে যত ছেলে মেয়ে "বন্দেমাতরম্" বলে প্রশেসন করে চলত। দৃশ্যটী এত সুন্দর ও উপভোগ্য হোত। "কারার এই লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট" গানটী ওদের শেখান হয়েছিল। একদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (বাঙ্গালী) যখন জেল পরিদর্শনে এসেছেন, বিপ্লব তার বাহিনীকে দাঁড় করিয়ে ঐ গানটী করতে সুরু করল। তাঁর মুখ এমন গম্ভীর হয়ে গেল—অন্য অফিসারদের কি যেন বলে চলে গেলেন। শিশুদের এই নির্ম্মল খেলায় যোগ দিয়ে ওদের একটু আদর দেখিয়ে যদি চলে যেতেন তাঁর উচ্চ মর্য্যাদা কিন্তু এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হোত না।

আমাদের জেলের একদিকে ছিল পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। মন একটু শ্রান্ত হলেই যে জানালা দিয়ে গঙ্গাকে দেখতে পাওয়া যেত—সেখানে গিয়ে সবাই দাঁড়াতাম। নদীর স্নিগ্ধ জল দূর থেকেই আমাদের প্রাণ মনকে সিক্ত করে তুলত। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরসে মানুষ যে অমন ভাবে আপ্লুত হয়ে যেতে পারে—নিশ্চল হয়ে তাকে উপভোগ করতে পারে—বহু বৎসর জেলে কাজ করে সেখানকার কর্ম্মচারীরা তা

বোঝবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁরা মনে করলেন আমরা বুঝি বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা করছি। একদিন দেখি মহা সমারোহের সঙ্গে যে জানলাগুলি দিয়ে গঙ্গার সৌন্দর্য্য উপভোগ করতাম সেগুলি দরমা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সেই দরমা দিয়ে বন্ধ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথম দিন আমাদের চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমরা সত্যিই বন্দী।

জেলে সমস্ত জেলার একনিষ্ঠ কর্ম্মীদের সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে জেল জীবনটা খুবই সার্থক বলে মনে করতাম।

ঢাকা থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কারুর কারুর শরীরের অনেক স্থানে অত্যাচারের চিহ্ন ছিল। বাঙ্গালী বড় কর্ম্মচারীর হাতে তাঁরা নির্য্যাতিত হয়েছিলেন। বরিশাল থেকে এসেছিলেন মনোরমা মাসীমা। আটমাসের কারাবাস মাথায় নিয়ে। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি বীণার স্পেশাল ট্রাইবুনালের সামনে পড়া বাজেয়াপ্ত জবানবন্দীটী জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করছিলেন। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম যে ঐ জবানবন্দীটী পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে।

মেদিনীপুরের গৃহস্থের মা বোন ছাড়াও অনেক কৃষক মহিলারাও সেবারকার আন্দোলনে যোগ দিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের অনেকের বাড়ী ঘর পুলিশ পুড়িয়ে দিয়েছিল। কারুর বা বাড়ী তল্লাসী করে কাপড় জামা গহনা সব নিয়ে চলে

গেছে। একদিনও কিন্তু তাঁদের অনুশোচনা করতে দেখিনি। সর্ব্বস্ব তাঁরা হারিয়েছেন—তাঁদের ত্যাগের তুলনায় আমরা ত' কিছুই করি নি। মাথা যেন আপনিই নত হতে চাইত তাঁদের সঙ্গে কথা বললে।

কোনও বন্ধু একদিন হেসে বললেন—"ওঁরা মেদিনীপুর থেকে এসেছেন বলে—ওঁদের এত খাতির বুঝি। ওঁরা যে আপনার বোনের শ্বশুর বাড়ীর লোক" (বীণারা তখন মেদিনী পুরে) মেদিনীপুরের একটি বৃদ্ধা মহিলা আমায় একদিন বললেন—"বিশ্বাস করবে মা—মেদিনীপুর জেলে—রোজ ভোর বেলা উঠে আমি বীণা, শান্তি, সুনীতিকে প্রণাম করতাম। তারাই যে আমার ইষ্টদেবতা।"

জেলে প্রায় সকলের সঙ্গে কিছু না কিছু সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছিলাম। বৃদ্ধাদের বলতাম ঠাকুরমা বা দিদিমা। বয়স্কা-দের মাসীমা পিসীমা ইত্যাদি। অল্প বয়সের বধূদের ডাকতাম বৌদিদি বলে। কেউ বড়, কেউ মেজ, কেউ বা ছোট। তাঁদের আমরা ইংরাজী পড়াতাম। তাঁদের অনেকের কাছে প্রথমে দেশ বা স্বাধীনতার সংগ্রামের কোন জ্ঞানই ছিল না। তাঁদের স্বামীরা যখন জেলে গেলেন যাবার সময় বলে গেলেন তাঁদের অনুগামিনী হতে। ওঁরাও সানন্দে সে কথা শুনে জেলে এসেছেন। আজ এতদিনে নিশ্চয় তাঁদের কাছে দেশ মূর্ত্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। স্বামীর আহ্বান ছাড়াও আজ হয়তো ওঁরা দেশের জন্য দুঃখবরণ করতে প্রস্তুত।

ধীরে ধীরে আমাদের ওখানকার ঐ মহা মেলার উৎসব বাতি যেন নিভে আসতে লাগল। একে একে অনেকের বন্দী জীবনের আয়ু শেষ হয়ে এল। সেই অনুপাতে নতুনের আগমন প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। আমারও জেল ছেড়ে চলে যাবার দিন এগিয়ে আসছে শুনে সবাই যেন দুঃখিত হয়ে উঠলেন। ঠাকু'মারা এসে রোজ তেল দিয়ে চুল বেঁধে দিয়ে যান। বৌদিরা তাঁদের লেখা পড়া শেখার চিহ্ন রেখে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একটি খাতায় সবাই এক একটি কবিতা লিখে দিলেন। একজনের একটি কবিতার প্রথম দুটি লাইন শুধু মনে পড়ে এখনও

"তুমি জেল ছেড়ে চলে যাবে ঠাকুরঝি--
তোমার মতন এত ভাল দেখি নাই ঠাকুরঝি।

কবিতার প্রতিটী লাইন তিনি "ঠাকুরঝি" বলে মিলিয়ে গেছেন। সেই খাতাটী পরে একবার বাড়ী থেকে তল্লাসী করে পুলিশ নিয়ে চলে গেল। আমার কাছে সেটা ছিল "অমূল্য সম্পদ"। এতজনের এত অকৃত্রিম প্রীতির নিদর্শন সেই জিনিষটীকে আবার ফিরে পেতে ইচ্ছে করে।

জেল থেকে চলে যাবার দিনে ঠিক বিদায়ের ক্ষণে মেয়েরা একটি বিদায় সঙ্গীত করবে বলে ঠিক করেছিল। নতুন বন্ধুদের মধ্যে একজনের তৈরী সেই গানটী। কদিন ধরে নিয়মিত ভাবে রিহার্সেল হল তাও শুনতে পেলাম। ঠিক বিদায় বেলায় আমায় ফুল দিয়ে সাজিয়ে যখন সেই গানটী গাওয়া

হবে —চোখের জলের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। গান গেয়ে আর বিদায় দেওয়া হলনা।

"অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে
কবে কখন একটুখানি পাওয়া
সেই টুকুতে জাগায় দখিন হাওয়া"।

## কংগ্রেস অধিবেশনের সময়
## একমাসের জন্য প্রেসিডেন্সি জেল—

১৯৩৩ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন যখন বে-আইনী বলে ঘোষিত হল—তখন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ থেকে আগতা মহিলাদের গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে আসা হল। সেবারে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তাকে সভানেত্রী করা হয়েছিল। প্রকাশ্য অধিবেশনে যোগ দেবার সুযোগই যাতে না পেতে পারি এই উদ্দেশ্যে ভোর রাত্রে বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে গেল।

এবার মনে হল যেন এক নিখিল ভারতীয় মহিলা সম্মেলন হচ্ছে আমাদের জেলের ভেতর। এবারও আমাদের জন্য সেই সকালে লপসী, দুপুরে তরকারী সেদ্ধ ও কাঁকরে ভরা ভাত। অন্য প্রদেশের মহিলাদের অভ্যর্থনা করার ও তাঁদের সুখ স্বাচ্ছন্দের দিকে লক্ষ্য রাখবার ভার আমরা সানন্দে গ্রহণ করলাম।

সেই সময়ে অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত মায়াও প্রেসিডেন্সি জেলে থাকত। প্রথমে দেখে তাকে চিনতেই পারিনি। গায়ের রং একেবারে কালো। আর শরীরও যেন ঠিক অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। হাজতেও ওকে খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। পনরো দিন এক কাপড়ে স্নান না করে মাটিতে শুয়ে কাটাতে হয়েছিল। জেলে দেখতাম ওর ওপর খুব কড়া পাহারা থাকত। কথা'ত বলতে পেতামই না—কত সময় ওর দিকে তাকিয়েই মুস্কিলে পড়ে যেতাম। শুধু তাকানও যে একটা দোষের ব্যাপার সে কথাত আগে জানা ছিল না। দূর থেকে মায়াকে দেখলেই বুঝতে পারতাম ও কতখানি অসুস্থ। মুখে যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণা ফুটে বার হচ্ছে। বুকে হাত দিয়ে একদিন দেখিয়েছিল যে সেখানে প্রায়ই একটা ব্যথা অনুভব করে। ভাতের থালা নিয়ে মাটিতে বসত—তারপর কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে উঠে গিয়ে থালা মেজে ফেলত। ওর শরীরের ঐরকম অবস্থা দেখে একদিন ডাক্তার বাবুকে বলেছিলাম—ওকে কেন তৃতীয় শ্রেণীতে রাখা হয়েছে? ওকি মানুষ হয়েছে ঐকরম দারিদ্র্যের ভেতর? কিছুই যখন খেতে পারছে না—হাসপাতাল থেকে কিছু দুধের ব্যবস্থা করা যায় না কি? ডাক্তার বাবু অবশ্য কিছু করেননি বা করতে পারেননি। কারণ জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নাকি খবর পেয়েছিলেন মেট্রণের কাছ থেকে যে মায়ার অসুখের সবটাই হচ্ছে মন গড়া। বিনা প্রয়োজনে দুধ দেবার কোন দরকার তিনি মনে করেন না। সেই

দুর্ব্বল শরীর নিয়ে কত পরিশ্রম করে তাকে সূতা দিয়ে টাকার থলি তৈরী করতে দেখেছি। জেল থেকে তাকে ঐ "খাটুনী" দিয়েছিল। তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়া হাত দুটি দিয়ে যে টাকার থলি তৈরী হচ্ছিল তাতে কার টাকা থাকবে—বসে বসে ভাবতাম।

একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে ওর সঙ্গে একটু কথা বলে জানলাম যে সত্যিই তাকে ইলিশিয়াম রো'তে কোন পুরুষ অফিসারের হাতে মার পর্য্যন্ত খেতে হয়েছে। ওর মাকেও সন্দেহ করে হিজলী জেলে রাজবন্দী করে রেখেছে। কয়েক মাস পরে যখন হিজলী জেল থেকে শুনতে পেয়েছিলাম মায়া মৃত্যুশয্যায়—আর তাকে বাঁচানর জন্য জেল কর্ত্তৃপক্ষ কিছু কিছু চেষ্টাও নাকি করেছেন তখন শুধু মনে হয়েছিল "এখন আর কেন?" প্রেসিডেন্সি জেলেত দেখেছি কেমন করে ধীরে ধীরে মরণের পথে ওকে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। যখন ওর শরীর চেয়েছিল একটু ভাল খাওয়া ভাল ব্যবস্থা—ওর মন চেয়েছিল একটু পড়াশুনার সুবিধা—একটু সুব্যবহার—তখন তো তোমরা কিছুই দিলে না। জল বাতাসের অভাবে গাছ যখন শিকড় শুদ্ধ শুকিয়ে যায় তখন তাকে বাঁচানর চেষ্টা একান্ত প্রহসন বলেই মনে হয়। মায়াকে জেলখানায় কতখানি লাঞ্ছিত জীবন কাটাতে হয়েছে—সেত আমি জানি—নিজের চোখেওত দেখেছি। কংগ্রেস অধিবেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে যারা গ্রেপ্তার হয়ে-

ছিলাম প্রায় একমাসের মধ্যে তারা মুক্তি পেয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম।

## ১৯৩৩সনের প্রেসিডেন্সি জেল

১৯৩৩ সনে আবার ধরা পড়ে প্রথম গেলাম লাল-বাজার থানায়। আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের দরজায় এক বৃদ্ধা পাহারাওয়ালী বসে ঝিমোচ্ছিল। অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখি সামনে একজন সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে হাসছে। আমাকে না জানিয়ে অমন করে ঘরে ঢোকার কারণ জিজ্ঞেস করলে--জানাল, যে আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা দেখবার জন্যই সে এসেছিল। আমার সঙ্গে আরও কয়েকটী ছাত্রীও ধরা পড়েছিল। তাদের জন্য মনে অনেক রকমের দুশ্চিন্তা হতে লাগল। পরে যখন শুনলাম একটি ছাত্রীর হাত ধরতে গিয়েছিল একটি সার্জেন্ট---তখন কর্ত্তৃ-পক্ষের কাছে আরও ভাল ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেও কোন ফল পাইনি।

রোজ দুপুর বেলা লর্ড সিংহ রোডে এস বি অফিসে আমাদের নিয়ে যাওয়া হোত আর পুলিশ ইন্সপেক্টার বাবুদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুনে যেতে হোত। রিপোর্টে ভরা প্রকাণ্ড খাতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সরকারের সময়,ও শক্তির কি অপচয়। একদিন হয়তো ছাত্রী সঙ্ঘের মেয়েদের নিয়ে সাঁতার কেটে ভিজে কাপড় কাগজে

মুড়ে নিয়ে কোথাও গেছি। সেদিনকার রিপোর্টে লেখা হয়েছে —অমুক দিন অমুক সময়ে কল্যাণী দাশ এক বাণ্ডেল রিভলভার নিয়ে অমুক স্থান থেকে বার হয়ে গিয়েছিলেন অমুক গলির অমুক বাড়ীতে।

আমার দাদাকেও পরে প্রায়ই এস বি অফিসে যেতে হত। সেখানকার বড় কর্ত্তা তাঁকেও আমার নামের রিপোর্ট লেখা ওয়েবষ্টার ডিক্‌স্‌নারীর মতন খাতা দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন "আপনার বোন কি ভীষণ লোক তা'ত জানেন না। আমাদের কাছে সব প্রমাণ আছে। অন্য দেশ হলে মাটীতে অর্দ্ধেক পুতে ডাল কুত্তা দিয়ে খাওয়াত" দাদা হেসে বলেছিলেন--"কল্যাণী ডালহাউসী স্কোয়ার কেসএ বা স্টিভেন্স মার্ডার কেসে জড়িত কিনা জানিনা--তবে বীণাকে রিভলভার জোগাড় করে দিয়েছে বলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনা।

আপনাদের অন্য প্রমাণগুলিও যদি এই রকমের বিশ্বাসযোগ্য হয় এ বিষয়ে আর আলোচনা না করাই ভাল। আর আপনাদের দয়ার কথা যা বলছেন অনেক বড় মনস্তত্ত্ববিদের মতে কুকুর দিয়ে খাওয়ানর চেয়ে এইরকম অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করে রাখা তো বেশী নিষ্ঠুরতা।"

সেদিন রাত্রে এগারটা নাগাদ আত্মীয় বোনের বিয়ের পর মেজদাদার জন্য কিছু খাবার নিয়ে ছোটভাই খোকার সঙ্গে বাড়ী ফিরে এলাম। তখুনি আই বি অফিসে খবর গেল

অনেকগুলি রিভলভার ও কার্তুজ নিয়ে বাড়ী ফিরেছি। বড় সাহেব সেই রাত্রেই বললেন **"Thus far and no further** আর এগুতে দেওয়া হবেনা—কাল ভোরেই ওকে গ্রেপ্তার করতে হবে।" পুলিশ ইন্‌সপেক্টার বাবু ঘুমুচ্ছিলেন। তাঁর কাছে ওয়ারেণ্ট পৌঁছুলেই—তিনি ভোর চারটে থেকে আমাদের বাড়ীটী পুলিশ দিয়ে ঘিরে রাখলেন। কোনদিক দিয়ে যাতে পালাতে না পারি। তাঁকে পরে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম "অতোগুলো রিভলভার যে নিয়ে রাত্রে বাড়ী ফির লাম সেগুলি গেল কোথায় ? বাড়ী অত করে তল্লাসী করলেন। মা'র বাক্সটী পর্য্যন্ত বাদ দেননি"। তিনি বললেন "ছোট ভাইটীকেত এখন থেকে মনের মতন করে তৈরী করেছেন -- সেই কোথায় সরিয়ে ফেলল। মার আশ্রমের বাজার বলে বৌদি যা বাড়ীর বার করিয়ে দিলেন তার ভেতরই যে ছিল না তাই বা কে জানে ? বৌদিটীও আপনার সাধারণ মহিলা নন্। এস বি অফিসে—

দিনের বেলা একদিন বাঙ্গালী বড় সাহেব তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন, পুলিশ ইন্সপেক্টার বাবু বললেন—"এঁর পরিচয়—লীলা নাগের প্রতিদ্বন্দ্বী—তাঁর হল ঢাকা -এঁর হল কলকাতা। দুজনে আমাদের অস্থির করে তুলেছে"। লীলাদির সঙ্গে তুলনা করাতে লজ্জা পেলাম। তাঁর কর্ম্ম জীবন কতদিন আগে আরম্ভ হয়েছে—কত দিক দিয়ে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বড় সাহেব ফোনে কাকে বললেন—“ও—তাহলে ধরা পড়েছে। আচ্ছা আমার কাছে পাঠিয়ে দিন—আমি একবার দেখে নেব”। যাকে পাঠা'নর হুকুম দিলেন—তাকে হাতের মুঠায় পেয়ে কি ভাবে যে অত্যাচার করবেন ভেবেই শিউরে উঠলাম। পর মুহুর্ত্তেই আবার আমার সঙ্গে হেসে কি যেন একটা কথা বলে উঠলেন।

এই লর্ড সিংহ রোডে একটি পীড়ন ও অত্যাচার কর বার ঘর আছে বলে শুনেছিলাম। পৃথিবীতে যতরকম অত্যাচার করার উপায় আছে সবই নাকি এখানে অব-লম্বিত হয়। বরফের উপর বসিয়ে রাখা—হাত পুড়িয়ে তার ওপর লঙ্কা বাটা দেওয়া—সমস্ত শরীরে ব্যাটারী চার্জ করা—অবিশ্রান্ত উঠ-বস করান—পা ওপরে বেঁধে মাথা ঝুলিয়ে বেত মারা—এ কিছুই এখানে বাদ যায়না।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের কোর্টে উপস্থিত করার নিয়ম ছিল। সেখানে নিয়ে যাবার আগে মনে হল যেন অফিসে খুব সোরগোল পরে গেছে। সবাই যেন ব্যস্তভাবে ছুটাছুটী করছে। প্রশ্ন করে জানলাম যে বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারকেও ( তার কিছুদিন আগে ধরা পড়েছেন ) সেদিন কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাঁকে শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে। লালবাজারেও শুনেছিলাম তাঁকে ধুতি পরতে দেওয়া হয়নি পাছে আবার পলাতক হবার চেষ্টা করেন। একজন ইন্‌সপেক্টার বাবু আমায় বললেন “আপনার

গুরুদেবকে কোর্টে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি। এইবার ওকে মরতেই হবে—আর আমরা ওকে বাঁচতে দিতে পারিনা"।—মুখে তাঁর একটা প্রতিহিংসা ভরা হাসি। তিনিও একজন বাঙ্গালী যুবক।

কোর্টে গিয়ে দেখি একটি আঠারো কি উনিশ বছরের ছেলেকেও আনা হয়েছে বিচারের জন্য। শরীরের এমন অবস্থা হয়েছে যাতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। দেওয়ালের ওপর পিঠ ও মাথা রেখে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। কপালে মুখে সর্ব্বাঙ্গে মারের চিহ্ন। ভাবলাম কত নীরবেই না—সে সমস্ত পীড়ন সহ্য করে গেছে। গত রাত্রেও ঘরে ঢোকবার সময় দেখেছি সুস্থ ছেলে আমার পাশের ঘরটীতে বেড়াচ্ছে। এত কাছে থেকেও কিছু জানতে পারলাম না। সঙ্গের পুলিশ ইন্সপেক্টর বাবুটীর অল্প বয়স—নূতন এই কাজে ঢুকেছেন। তাঁকে অনুরোধ করলাম ওর বসবার একটু ব্যবস্থা করে দিতে—ও যে আর দাঁড়াতে পারছে না, আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বল্লেন—"বন্দীর অত আবদারে আর কাজ নেই—দাঁড়িয়ে থাকুক।"

তারপর লর্ড সিংহ রোডে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাত্রে কয়েদ গাড়ীতে পার্কসার্কাসের থানায় পাঠিয়ে দিল। গাড়িতে উঠে দেখি খুব বিশালকায়া গাউন পরা এংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা বসে আছেন। এঁকেই না আরও দুজন মহিলার সঙ্গে এস বি অফিসে ঘুরতে দেখেছি?

তিনিও যখন থানায় নাবলেন—তখন মনে মনে স্থির করে নিলাম যে এর আসবার কারণ আর কিছু নয়—মারধরের পালাটা বোধ হয় একে দিয়েই সম্পন্ন করা হবে।

থানাতে উৎকণ্ঠিত মনে বসে আছি। শেষে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকতে না পেরে প্রশ্ন করে জানলাম ঐরকম থানায় মেয়েদের পাহারা দেবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় রাত্রের জন্য তাকে রাখা হয়েছে। মাধুরী, জ্যোতি, বনলতা প্রভৃতি ছাত্রীদের অন্য থানায় রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল।

অতএব আর কোনও ব্যাঘাত হবে না জেনে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে গেলাম। কিন্তু ঘুমান আর সম্ভব হল না। একটি ছোট ঘরকে ভাগ করে তিনটী ঘর করা হয়েছে। দুপাশের ছোট ছোট খুপরী হয়েছে আমাদের বাসস্থান—একদিকে আমি—অন্যদিকে পুরুষ কয়েদীরা। মধ্যের ঘরটীতে অফিসের কাজ চালান হত।

সেখানে কত রকমের লোককে যে ধরে আনা হচ্ছে। ফেরিওয়ালাদের দলে দলে ধরে এনে জরিমানার ব্যবস্থা হচ্ছে। চোর বলে একজনকে ধরে এনে নির্দ্দয়ভাবে মারা হচ্ছে। সে চীৎকার করে কাঁদছে আর বলছে "আমি কিছুই জানিনা বাবু আমায় শুধু শুধু ধরে নিয়ে এসেছে। "ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্টের" সেই বৃদ্ধকে মনে পড়ল—যাকে বৃদ্ধাকে খুন করবার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এক একটী চিৎকারের শব্দ শুনি আর দুহাত কানে দিয়ে বসে থাকি। একটি ভদ্রলোক মাতলামি করে রাস্তায় পড়ে

ছিলেন—সেই অবস্থায় তাকে তুলে আনা হয়েছে। কিছুক্ষণ ইংরাজীতে কিছুক্ষণ বাংলায় তিনি চিৎকার করে চলেছেন। বাড়ীতে তাঁর স্ত্রীর করুণ অবস্থা কল্পনা করে শিউরে উঠলাম। এই স্বামীকে নিয়ে তাঁর বিবাহিত জীবন কাটাতে হচ্ছে।

সামনের দিকের ছোট ঘরটীতে দেখি একটি ছোট ছেলে—বয়স ১৮ হবে। ওয়াটগঞ্জের একটি বোমার মামলায় ধরা পড়েছিল। ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে সে এইসব লক্ষ্য করে যাচ্ছে। কাপড় জামা ময়লা, মাথায় তেল নেই, মুখে এক অব্যক্ত বেদনার ছবি। খোঁজ নিয়ে শুনলাম কোন এক দরিদ্র বিধবার সন্তান। তার বিরুদ্ধে একটি মামলা খাড়া করে কতদিন যে তাকে ভোগাচ্ছে। একদিন কোর্টে নিয়ে আবার তুই তিন মাস পরে দিন ফেলছে। বাড়ী থেকে কোন উকিল ঠিক করা বা খোঁজখবর নেবার জন্য কেউই আসেনি। দিনের পর দিন মাসের পর মাস এইরকম নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে। কিসের জোরে ও বেঁচে রয়েছে এই কথাটি বারবার মনে হতে লাগল। ওর জন্য ভাববার বা করবার কেউ নেই। কোন দিন কোন সম্মান বা পুরস্কার ওর ভাগ্যে জুটবে না। এদের মতন নীরবে যারা তুঃখ ভোগ করে যাচ্ছে—তাদের ত্যাগ অনেক বড় অনেক মহান। দেশ হয়তো একদিন স্বাধীন হবে—এদের নাম কেউ জানতেও পারবে না। অথচ স্বাধীনতার পেছনে থাকবে এদেরই সম্মিলিত ত্যাগ ও কর্মশক্তি।

আমাকে যে ঘরটীতে রেখেছিল—তার দেওয়ালে কোন একটী বন্দী লিখে রেখে গিয়েছিলেন "বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন না করি ভয়"। গানটী আগে কত শুনেছি। কিন্তু সেদিন গানটীর ভিতরকার ভাবটী অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলাম। কবি আমাদের জন্যই যেন গানটি রেখে গেছেন।

বিপদে রক্ষা করবার প্রার্থনা'ত ভীরুর প্রার্থনা, বঞ্চিতের প্রার্থনা।

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণ সজ্জা
ব্যাঘাত আসুক নব নব—আঘাত পেয়ে অচল রব
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয় ডঙ্ক
দেব সকল শক্তি লব অভয় তব শঙ্খ"

এই প্রার্থনাই কবি—আমাদের জন্য রেখে গেছেন। একই পথের পথিক—অজানা বন্ধুকে ঐ লেখাটুকুর জন্য সেদিন মনে মনে অনেকখানিই কৃতজ্ঞতা জানালাম।

কয়দিন থানায় থেকে আবার প্রেসিডেন্সি জেলে যেতে হল। আবার সেই জেল—সেই নরকের প্রতিচ্ছবি। আমার আগেই জ্যোতিকণা (বিপ্লবী উল্লাসকরের ভাইঝি) ও বনলতাকে নিয়ে রাখা হয়েছিল।

বনলতাকে ওপরের একটি নির্জ্জন সেল ঘরে রাখা হয়েছে। মাসাধিক ধরে তাকে কারুর সঙ্গে একটি কথা

পর্য্যন্ত বলতে দেওয়া হোতনা। একে বলে নির্জ্জন কারাবাস। থানাতেও ওকে উপর্য্যুপরি তিন দিন ও রাত্রি ঘুমোতে না দিয়ে একটি ছোট টুলের ওপর বসিয়ে রাখা হয়েছিল। পাশে সেপাই দাঁড়িয়ে থাকত—একটু ঘুমের ভাব দেখলেই বা মাথাটি টেবিলে ঝুঁকে পড়ছে দেখলেই সে চীৎকার করে উঠত। এতে নাকি মানুষের স্নায়ুশক্তি শিথিল হয়ে পড়ে—মস্তিস্ক দুর্ব্বল হয়ে যায়।

এস বি অফিসের একজনকে বলতে শুনেছিলাম "বনলতার ভেতর এমন শক্তি আছে যে তাকে সারা জীবন নির্জ্জন কারাবাসের শাস্তি দিলেও তার মুখ দিয়ে কোন স্বীকারোক্তিই করান যাবে না" ডাওসেশান কলেজের ছাত্রী বোর্ডিং তল্লাসী করতে গিয়ে জ্যোতিকণার বালিশের নীচে কয়েকটী রিভলভার পাওয়া গিয়েছিল। বনলতা তার বিশেষ বন্ধু। সে সাইকেল চড়তে পারে—মোটর চালাতে পারে—এয়ারোপ্লেন চালান শিখছে। সে নিশ্চয়ই জানে কি করে বালিশের নীচে রিভলবার এল। তাই ওর ওপর এত উৎপীড়ন। ও শুধু একবার বলুক যে কল্যাণীদির কাছ থেকে ঐগুলি পেয়ে জ্যোতির কাছে রাখতে দিয়েছিল তাহলে নির্দ্দোষী জ্যোতির সঙ্গে বনলতাও মুক্তি পাবে।

বনলতা ওপরের সেল ঘরে বসে আপন মনে কবিতা বলে যাচ্ছে

"শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে
দিব তালি।
এতকথা আছে—এত গান আছে এত
প্রাণ হয়ে আছে ভোর—
ভাঙ্গ ভাঙ্গ ভাঙ্গ কারা—আঘাতে আঘাত কর
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি
এসেছে রবির কর"।

কখনও বা জুলিয়াস সিজার থেকে এন্টনী বা ব্রুটাসের পার্ট আবৃত্তি করে যাচ্ছে। বিকালে ঠিক দশ মিনিটের জন্য তাকে নীচে সামনের ছোট উঠানটীতে নিয়ে আসত। আমাকে তখন নীচের সেলে দরজা বন্ধ করে রাখা হোত। কর্ত্তৃপক্ষের আশঙ্কা ছিল যদি আমি দূর থেকে ওর সঙ্গে কোনো কথা বলার চেষ্টা করি বা স্বীকারোক্তি করতে বারণ করি।

সারাদিন জ্যোতির সঙ্গে বসে বসে গল্প করতাম। মনটা একেবারে সরলতায় ভরা। পৃথিবীর কোন দৈন্য কোন কলুষতার সঙ্গেই ওর পরিচয় নেই। মানুষের ওপর অপরিসীম বিশ্বাস। প্রায় ওর কাকার গল্প করত। আন্দামানেই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। এখন হঠাৎ এক এক সময়ে এসে বলেন "তুলো দাও তুলো দাও—আমার কান দিয়ে সব

বুদ্ধি পালিয়ে যাচ্ছে” মনে পড়ে গেল “আসন্ন বিপদের মধ্যেও যিনি চির নির্ব্বিকার---তীব্র যন্ত্রণায় যাঁহার মুখ হইতে কখনও হাসির রেখা মুছে নাই—তিনি আজ উন্মাদগ্রস্ত” ( নির্ব্বাসিতের আত্মকথা - )

সেল ঘরের সামনে বসে বসে অন্য বন্দীদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা লক্ষ্য করে যেতাম। তারা জেলখানাকে “দুঃখের ঘর” বলে ডাকত। সত্যিই জেলটা তাদের দুঃখের ঘর। ঠিক যেন একটি কারখানা— যন্ত্রের মতন ওদের কাজ করে যেতে হচ্ছে। সেই অন্ধকার থাকতে উঠে বসা তারপর ঘর খুললে উঠান প্রভৃতি ধুয়ে জাল ভাঙ্গতে সুরু করা - আবার ভাত খাওয়ার পরই কাজে বসা। বিকেল বেলা কোনরকমে খেয়ে ভেড়া ছাগলের মতন ঘরে বন্ধ হওয়া। ওদের দেখতে দেখতে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত; মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠত।

একদিন জানতে পারলাম বনলতা বন্দীদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট সাহেবকে জানিয়েছে। আমিও সেই দিনই তাঁকে বললাম “জেল কোডে লেখা আছে যে ভাত খাওয়ার পর কয়েদীরা এক ঘণ্টা ছুটী পাবে। এখানে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে কেন? তিনি বলে গেলেন যে জেলার সাহেবকে সেই দিনই দুপুরে পাঠাবেন খোঁজ নিয়ে যেতে।

বলা বাহুল্য যে মেট্রণ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং বিশেষ করে ব্যবস্থা করে গেলেন যাতে সেদিন খাওয়ার

পর কয়েদীদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। জেলার সাহেব যথা সময়ে এসে দেখে গেলেন যে সকলেই বিশ্রাম করছে। এক ঘণ্টার জায়গায় সেদিন দুই ঘণ্টা পরে তাদের ঘর খোলা হল। একজনের কাছে খবর পেলাম খাটুনী বাবুকে বলে সেদিন বেশী পরিমাণ ডাল আনাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সময় ছিল কম ও ডালের পরিমাণ বেশী। কাজেই কয়েদীরা কেউই বিকেল বেলার মধ্যে কাজ শেষ করতে পারল না। মেট্রণ বিকেলে এসেই খাটুনী ঘরে ঢুকে প্রায় প্রত্যেককে এক একবার করে বেত মারল। সে যে কি নিদারুণ দৃশ্য! কাজ শেষ করতে পারে নি বলে সেদিন তাদের অর্ধেক খাওয়ারও হুকুম হোল। ভাল করতে গিয়ে কষ্ট তাদের বাড়িয়েই দিলাম। জেলে বোধ হয় এমনি ভাবে কারুর ভাল কিছু করা সম্ভব নয়। রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে গাছে পোকা ঢুকেছে তাকে শিকড় শুদ্ধু উঠিয়ে না ফেললে—গাছটীকে ভাল করা যায় কি?

পরের দিন মনে হল—বন্দীদের কাছে যেন কি মস্তবড় অপরাধ করেছি। অন্যদিন যারা অন্ততঃ একটুখানি হাসি দিয়ে আমাদের অভিবাদন করত, সেদিন তারাও আমার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। একজনকে চুপি চুপি ডেকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম—মামা গত রাত্রিতে জমাদারিণীকে দিয়ে সকলকে জানিয়েছেন যে স্বদেশী দিদিমনিরা সাহেবকে বলে তাদের কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে সেই মেয়েটী কথা বলছে খবর পেয়ে মেট্রণ ছুটে এসে

তাকে এমন ভাবে পা দিয়ে ধাক্কা দিল যে সে মাটিতে পড়ে গেল। কয়েক মাস পরে হিজলী জেলে বসে খবর পেয়েছিলাম যে ঐ মেয়েটী নাকি একটি মৃত সন্তান জন্ম দিয়ে অসুস্থ হয়ে রয়েছে।

দু, এক দিন পরে মেট্রণ নিজেই আমাকে ডেকে জানিয়ে দিল—সব বন্দীরা পরামর্শ করেছে আমায় একদিন মারবে বলে। আমি যেন সাবধানে থাকি—একলা না বেড়াই ইত্যাদি।

আর এক।দনের একটি করুণ ঘটনা মনের ভেতর প্রচণ্ড একটা আঘাতের ছাপ রেখে গিয়েছিল। সোমবার বড় সাহেব সমস্ত দেখাশুনা করে চলে যাবার পরই দেখি একটি বয়স্কা মহিলা কয়েদীকে সাত আট জন মিলে মাটিতে ফেলে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। তাকে আমাদের পাশের সেল ঘরটীতে বন্ধ করে রাখা হল। সারাদিন অভুক্ত রেখে ডাল ভাঙ্গবার আদেশ দেওয়া হল। খবর নিয়ে জানলাম আগের দিন তাকে বিনা অপরাধে মারার বিরুদ্ধে সে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছে নালিশ করবার জন্য দাঁড়িয়েছিল। অন্যরা বুঝতে পেরে তাকে বলতে দেয়নি। মেট্রণের নামে নালিশ করার স্পর্দ্ধা রাখে বলে আজ তাকে এই শাস্তি পেতে হচ্ছে।

তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম। দুপুর বেলা কার কান্না শুনতে পেলাম—"ওগো কে আছ—একটু জল দাও তেষ্টায় যে মরে গেলাম"। প্রায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে জ্যোতির সঙ্গে

পরামর্শ করলাম—লাঞ্ছনা হয়তো বেড়ে যাবে—কিন্তু আপাততঃ ওকে আকুল পিপাসার হাত থেকে বাঁচাইতে। চারিদিকে তাকিয়ে চুপি চুপি একটি ভাঁড়ের মতন পাত্র জোগাড় করে তাইতে হাওদার জল ভরে ওর ঘরের সামনে রেখে এলাম। আমাদের দেখে ও কেঁদে ফেলল। পাছে কেউ দেখে ফেলে এই আশঙ্কায় কোন সান্ত্বনা না দিয়েই সেখান থেকে সরে এলাম। ভাবলাম বাঁচা গেল—কেউ দেখতে পেল না।

বিকেল বেলা মেম সাহেব এসেই আমাদের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করলেন—কেন ওকে জল দিয়েছি, কথা বলেছি ইত্যাদি। আমাদের কাছে ও জল চায়নি ওর কষ্ট দেখে নিজে থেকে গিয়ে জল দিয়ে এসেছি বলা সত্ত্বেও মামাজী সদলবলে ওর সেলের দরজা খুলে—সারাদিন অভুক্ত মানুষকে বেত দিয়ে মারতে লাগল। আমাদের সেদিনকার সেই প্রতিকারহীন অবস্থাটা মনে করলে এখনও মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই কবিতার লাইনটী মনে পড়ে যায় **"What man has made of man"**—মানুষ মানুষের কত বড় ক্ষতিই না করেছে!

পরের সপ্তাহে বড় সাহেবের পরিদর্শনে আসবার আগেই ওকে সেল ঘর থেকে বার করে লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। কারণ তাঁর লিখিত অনুমতি ছাড়া কাউকে সেল ঘরে রাখার নিয়ম নেই। মেট্রনের অবাধ্য হওয়া, পাহারাওয়ালীদের

মারধর করার মিথ্যে অভিযোগে ওকে অভিযুক্ত করে ন্যায়-সঙ্গত ভাবে সেদিন আবার তাকে সেল ঘরে ঢোকান হল। এই হল জেলখানা—ওদের ভাষায় "দুঃখের ঘর"। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফলে ওদের ভাল করার প্রবল ইচ্ছাকে দমন করতে চেষ্টা করছি। তাই কর্ত্তৃপক্ষকে এ সব বিষয় জানাতে আর ইচ্ছা হল না। "বিপদে পড়িলে আর কিছু লাভ না হোক মানুষ নিজেকে চিনিবার অবসর পায়। কঠোর নিস্পে-ষণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তাহাই আরম্ভ হইল"। (নির্ব্বাসিতের আত্ম-কথা)।

নীচেকার একটি ছোট সেল ঘরে—একাই থাকতে হোত। দিনের বেলায়ও ঘরটীতে আলো বাতাস কিছু প্রবেশ করতে পায় না। ঘরের দেওয়ালটী লালবাজারের থানার মতন কালো রংয়ের। বন্দীদের মনে একটা ভীতি ও বিষাদের ছাপ এঁকে দেবার জন্যই নাকি এসব ঘরে কাল রং দেওয়া হয়। সন্ধ্যা থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেলে—গরাদে ধরে বসে থাকতাম—ঘরে একটি হ্যারিকেন পর্য্যন্ত দিত না পাছে আমরা আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করি। মশার কামড়ে শুতে পারতাম না। এত অন্ধকার যে নিজেকেই নিজে দেখতে পেতাম না। পাশের একটি সেলে একটি পাগলী সারারাত চিৎকার করত। দিনের বেলা ঘুমিয়ে রাত্রে সে জেগে ওঠে। বাইরে নাকি যেখানে যা জিনিষ দেখত তাই উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া তার একটি অভ্যেস ছিল। সেবারে কোন বাড়ীর বারাণ্ডায় শুকোতে দেওয়া কাপড় উঠিয়ে নেওয়াতে তার জেল হয়েছে। অল্প

দিনের জেল হয়—মুক্তি পেয়ে চলে যায়—আবার কদিন পরেই এসে যায়। এমনি ভাবেই তার জীবনটা কেটে যাচ্ছে। চোর সে ঠিক নয়—ব্যাধিগ্রস্ত একটি উন্মাদ মাত্র। সুচিকিৎসা পেলে নিশ্চয়ই সেরে উঠতে পারত।

অনেকদিন না ঘুমিয়ে আর অন্ধকারে বাস করার পর বুঝলাম বিকাল হলে চোখ জ্বালা করে জ্বর আসে। গলার ভেতর বেশ ব্যথা। সেই সময় রাজসাহীর কোন একটি মামলায় জড়িত হয়ে শান্তি বিচারাধীন অবস্থায় প্রেসিডেন্সী জেলে থাকত। তাকে আমরা দেখতে পাইনা এমন একটি ঘরে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে রেখেছিল। অন্যদের কাছে খবর নেওয়া ছাড়া ওর আর কিছুই করতে পারি নি। একদিন কয়েদীদের ভেতর খুব মারামারি হচ্ছে শুনে ছুটে গিয়েছিলাম। একজন আর একজনকে কামড়ে দিয়েছে—রক্তস্রোত বইছে। শান্তির বয়স খুবই অল্প। তার সেদিন-কার ভয়-বিহ্বল মুখ যেন এখনও চোখে ভাসে। এমন দৃশ্য সে হয়তো কোনদিন দেখেনি বা শোনেনি। বেশী কথা ওর সঙ্গে বলতে পারিনি।

একদিন কোর্টে গিয়ে শুনলাম যে প্রমাণাভাবে বনলতা ও আমি ছাড়া পেয়েছি। জ্যোতির মামলা তখনও শেষ হয়নি। আমাদের কিন্তু কোর্টের ঘর থেকে বাইরে আস-তেই বিনা বিচারে অবরোধের পরওয়ানা দেখান হল। আমরা হলাম রাজবন্দী। দাদা এসেছিলেন গাড়ী নিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন বলে। কতখানি ব্যথা যে

বুকে নিয়ে ফিরে গেলেন। তাঁর মুখে তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। বাবা মা বারাণ্ডায় অপেক্ষা করে বসে আছেন। যেদিন ধরে নিয়ে গিয়েছিল বাড়ী থেকে— পুলিশ ইন্সপেক্টারবাবু মাকে বলেছিলেন "আপনি কাঁদছেন কেন—মেয়েকে'ত আমরা তু'ঘণ্টার ভেতর ফিরিয়ে দিয়ে যাব"। দাদার সঙ্গে বাড়ী ফিরিনি—ফেরবার আর আশাও নেই শুনে মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। অনেক যত্নে মাকে সেবার বাঁচিয়ে তুলেছিলেন দাদা ও বৌদি। দিদিরাও সব পরে এসে পড়েছিলেন। তুঘণ্টা পরে না হোক— কয়েক বৎসর পরে'ত ফিরে গিয়েছিলাম বাবা মার কোলে। কিন্তু চট্টগ্রামের চৌধুরীদের মা সন্তানের বন্দী হওয়ার খবরে পাগল হয়ে গেলেন। অনেক বছর পরে বন্দী ছেলে মুক্ত হয়ে যখন বাড়ী ফিরে এসে মার কাছে দাঁড়াল— মায়ের তখন সন্তানকে বুকে নেওয়ার ক্ষমতা আর নেই। আরেকটী পরিবারেও ত দেখেছি তুটি ছেলেই রাজবন্দী হয়েছেন। তাঁদের মাকেও উন্মাদ অবস্থায় দিবারাত্র চিৎকার করতে দেখেছি। পিতা কর্মশক্তি হারিয়ে যেন পঙ্গু হয়ে গেছেন। সেই অচল হয়ে যাওয়া সংসারের যত দায়িত্ব —যত ঝড় ঝাপ্টা কেমন করে মাথায় নিয়ে নীরবে হাসিমুখে দিন কাটাচ্ছে বড়ছেলের সহধর্মিনী—কিশোরী বধূ। আবার সেই ভাঙ্গা সংসার জোড়া লেগেছে—ছেলেরা ফিরে এসেছে—কিন্তু উন্মাদ মা এখনও ছাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমনি কত সংসার যে ভেঙ্গে গিয়েছিল তার ইতিহাস কজনই বা জানতে পেরেছে?

আমাদের দুজনকে একসঙ্গে ডেটিনিউ করে হিজলী জেলে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হল। আজ আর আমাদের ভেতর কোন ব্যবধান নেই। পুলিশ ইন্সপেক্টারবাবু বললেন—"যান গুরু শিষ্যা মিলে জেলে গিয়ে ঢুকুন"। তারপর বনলতাকে বললেন "জ্যোতিকণাকে একা শাস্তি ভোগ করবার জন্য রেখে চললেন। আপনি'ত রাজবন্দী হলেন—আমরাও দেখে নেব কেমন করে আপনি জেল থেকে ফিরে আসতে পারেন"। শেষের কথাগুলি শুনে মনের ভেতরটা প্রথমে এমন একটা অজানা ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠল। ওর দুই দিদি চারু ও শান্তি আমাদের বন্ধু। তাদের আদরের ছোট বোনকে রক্ষা করবার দায়িত্ব যেন ওরা দিয়েছিল আমাদের ওপর। বনলতা যদি আমার কাছ থেকে সব কিছু পেয়েছে শুধু এই কথাটুকু স্বীকার করে দিত—তবে হয়তো ও মুক্তিও পেতে পারত। কিন্তু সে মুক্তিত ওকে এতটুকু শান্তি দিত না। বালিকা বয়স থেকে বিপ্লবীর হাতে গড়া যে মেয়ে তার কাছে এ দুঃখ বরণ'ত কিছুই না। ঝড়ে যদি ভেঙ্গেও যায় তবুও নুইয়ে পড়েনি—পড়বেও না। উজ্জ্বল ভাস্কর হয়েও বেঁচে থাকবে। তবে অত শঙ্কিত হবার কারণ কি?

# আবার হিজলী জেল।

বন্দী নিবাসের সকলেই আমাদের অভ্যর্থনা করে নিলেন। জেলের কোণের দিকে একটি ঘরে বীণা, কল্পনা ও শান্তিকে কদিন আগে এনে রেখেছে। শুনেছিলাম মেদিনীপুর থেকে বীণাদের অন্যত্র সরিয়েছে। কিন্তু কোথায় নিয়ে গেছে জানতাম না।

মেদিনীপুরে ওদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে রেখে—সুনীতিকে তৃতীয় শ্রেণীতে রাখাতে ওদের মনে অশান্তির আর শেষ ছিল না। তা ছাড়াও জেলার সাহেব প্রায়ই মেয়েদের ওয়ার্ডে আসতেন। মেট্রনের সঙ্গে আচরণ সমস্ত শ্লীলতাকে ছাড়িয়ে যেত। দিনের পর দিন এই দৃশ্য বীণাদের দেখতে হত। সাধারণ শ্রেণীর বন্দীরা ভয় পেয়ে ওদের বলেছিল "তোমরা এখানে থাকতে এর প্রতিকার কর—তোমরা চলে গেলে আমাদের ওপরও ত অত্যাচার হতে পারে"। বীণা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে বার বার এ বিষয়ে জানিয়েও কোন ফল পায়নি। শেষে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জ জেল পরিদর্শন করতে আসলে তাকেও বীণা সব কথা জানায়। তিনি শুনে হেসে বলেছিলেন। ( "মেট্রণের ওপর তোমার হিংসে হচ্ছে বুঝতে পার্চ্ছি"। বীণা গম্ভীরভাবে বলেছিল— "আচ্ছা তুমি দেখতে পাবে আমি কি করতে পারি"

সেই দিনই ওরা ইন্সপেক্টর জেনারেলকে জেলের ভেতর এই অন্যায়ের প্রতিকার না হলে তাদের অনশনের সংকল্পের কথা জানালেন। চৌদ্দ দিনের ভেতরও কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন প্রতিকার করলেন না বলে বীণারা সকলে অনশন আরম্ভ করলেন। ওদের অবস্থা অল্প কিছুদিন পরে সঙ্কট-জনক হওয়াতে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল। প্রথমে সাধারণ কয়েদীরাও এই অনশনে যোগ দিয়েছিল। পরে ওদের ওপর নানান রকম অত্যাচার স্থুরু হওয়াতে বীণারাই ওদের খেতে রাজি করালেন। জেলের ইতিহাসে বোধহয় সাধারণ শ্রেণীর বন্দীদের অনশনে যোগ দেওয়া এই প্রথম। প্রতিদিন দুবেলা ভাত বীণাদের সামনে রেখে দেওয়া হোত। কর্ত্তৃ-পক্ষ ভাবতেন হয়তো ওরা সামনে খাবার দেখলে আর সংযত থাকতে পারবে না। মানুষ চেনবার মতন শক্তিও নেই জেল কর্ত্তৃপক্ষের। দোল উপলক্ষ্যে বীণার জন্য বৌদি দিদিদের তৈরী খাবার ও ফল নিয়ে দাদা মেদিনীপুরে গেলেন। জেল অফিসাররা সমস্ত গ্রহণ করাতে দাদা কল-কাতায় ফিরে আসছেন। ঠিক ট্রেনে ওঠবার আগে একটি জেল কর্ম্মচারী ছুটে গিয়ে তাঁকে বলে গেলেন—“আপনার বোন ও শান্তি স্থনীতি এতদিন হল উপোষ করে আছেন—তাঁদের অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক”। তারপর কলকাতার কাগজে যখন এ বিষয়ে সমালোচনা হল—স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে পলিটিকেল সেক্রেটারীর তার আসল—তখন জেল কর্ত্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙ্গল। স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেয়েদের জেলে ঢুকলেন—

কিন্তু জেলার বাবুকে ঢুকতে দিলেন না। তাঁর কাছ থেকে চাবিও নিয়ে নেওয়া হল। বীণাদেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল যে তাদের অভিযোগের প্রতিকার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হবে। হাসপাতালে বাবার একটু প্রার্থনা ও বৌদির গানের পর ওরা বেদানার রস খেল। সেবার কংগ্রেসী কর্মী শ্রীমন্মথ দাসের বাড়ীতেই মা বাবাকে ওঠান হয়েছিল। লাহোর থেকে সেজদি এসেছিলেন। তিনিও সঙ্গে ছিলেন। দিদিও কলকাতায় এসে পড়াতে দাদার ঘোরাঘুরীর কাজে সাহায্য হয়েছিল।

কদিন পরে ওরা একটু সুস্থ হলে—ওদের হিজলী জেলে পাঠান হল। সুনীতিকে একা অন্য জেলে পাঠান হল বার্জ। সাহেব ইতিমধ্যে বেনামী চিঠি পেয়েছিলেন যে বীণা দাসকে অপমানের শোধ নেবে তার বাংলা দেশের ছেলেরা। কদিন পরেই তাঁকে কে যেন গুলি করে মারল—খেলার মাঠে। এদিকে মেদিনীপুরের সেই জেলার সাহেবকে সেই বৎসরই তাঁর ভাল কাজের জন্য অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন তখনকার বাংলা সরকার।

প্রথম প্রথম হিজলী জেলের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটল। বনলতা তার গান নাচ ও আবৃত্তি দিয়ে সকলকে আনন্দে ভরে রাখত। একটু গম্ভীর আবহাওয়া দেখা দিচ্ছে বুঝতে পারলেই হারমোনিয়াম নিয়ে বসে ভাঙ্গা গলায় গান আরম্ভ করত "অল্প বয়সে পীরিতি করিনু—

যাঁরা অনেকদিন হাসেন নি তাঁরাও সব হেসে উঠতেন। কল্পনাও রোজ এক একটি মজার ব্যাপার করে একঘেঁয়ে

টানা জীবনে নতুনত্বের স্বাদ এনে দিত ও চমৎকার নকল করতে পারত—কোন দিন হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে "আল্লা হো আকবর" বলে নমাজ পড়তে লাগল। এত সুন্দর করে বলত যে মুসলমান কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত তা উপভোগ করতেন ও প্রশংসা করতেন। কখনও হয়তো আমরা বসে পড়ছি—( বীণা ইংরাজী ইতিহাস পড়ে শোনাত—আমরা অনেকে শুনতাম ) দরজার পাশ থেকে করুণ সুরে গান আরম্ভ করত "মা নেই বাবা নেই ভাই নেই বোন নেই—নাই বলিতে কেহ নাই আমার" আমি বলেছিলাম অমন গান করতে নেই—তাই গানটী করেই শেষে জুড়ে দিত "জেলে"। আমরা সবাই হেসে উঠতাম। এইখানেও সেই প্যারেড শেখানর ব্যবস্থা হল। একবার সবাই মিলে রবীন্দ্রনাথের "মালিনী" ও আর একবার "তপতী" অভিনয় করা হল।

অভিনেত্রীদের চেয়েও কিন্তু শ্রোত্রী সংখ্যা ছিল কম। হিজলীর সাধারণ কয়েদীদের যে কী আনন্দ দিতে পেরেছিলাম। "মালিনীর" সময় জেল কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ দেখতে এসেছিলেন কর্ত্তব্যের খাতিরে। কল্পনা বিদ্রোহী সৈনিকের পাঠ করেছিল। রাজা যখন তাকে প্রশ্ন করলেন—"যদি তোমায় মুক্তি দেওয়া হয় তবে তুমি কি করবে"? উত্তরে সে বলল "পুনর্ব্বার তুলিয়া লইতে হবে কর্ত্তব্যের ভার"। এই কথাটায় জেল কর্ম্মচারীরা যেন বেশ বিচলিত হয়ে উঠলেন।

পরে আমাদের জানান হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের বই হলেও এর পর থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না নিয়ে কোন নাটক অভিনীত হতে পারবে না।

শান্তির গান ছিল আমাদের জেলের একটা বড় সম্পদ। ভোর বেলা বিশেষ করে কোন বিশেষ দিনে—ওর গানের সুর জানালা দিয়ে ভেসে এসে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিত। কোন দিন—"ভেঙ্গেছ দুয়ার এসেছে জোতির্ম্ময়" কোন দিন বা "তিমির দুয়ার খোল"। রাত্রি বেলা এক একদিন গাইত "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে"—জমাদারিণীরা মাঝে মাঝে এসে বলত—তারা কয়েদী, তাদের গান করবার অধিকার নেই ইত্যাদি। কিন্তু কে তাদের কথা শোনে? একদিন বর্ষা উৎসবের আয়োজনও করা হল।

প্রথম প্রথম হিজলীতে বীণারা খুব পড়াশুনা করবার সুযোগ পেলেন। বাড়ী থেকে নতূন নতূন বই কিনে দাদা দিয়ে যেতেন। ওরা যেন এক জ্ঞানের সমুদ্রে ডুবে গেল। বীণা সোমবার দিনটাতে মৌন হয়ে থাকত।

কিন্তু এই মৌনতাও—ভাঙ্গতে হোল যখন কিছুদিন পরেই বনলতা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। বিকেল হলেই জ্বর হয়—গলা ফুলে হার্টের অবস্থাও খুব খারাপ হল। সবাই মিলে দিন রাত সেবা করি—বীণাদির সঙ্গটাই সব চেয়ে তার প্রিয়। একদিন বলেছিল—"বীণাদিকে এত শ্রদ্ধা করি যে এক এক সময়ে মনে হয় অদেয় আমার কিছু নেই তাঁর কাছে"। ডাক্তার বাবু বললেন—অত্যন্ত হাসি খুসী মেয়ে

ছিল কিনা—জেলের চারিদিকের এই দেওয়াল ওর স্বাস্থ্যে ভাঙ্গন আনল। তাই সব সময় তাকে হাসি গল্প দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হত। যেদিন খুব বেশী অসুখ বাড়ত—আমাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য সেই নিজে কত যে হাসাতে চেষ্টা করত।

এমনি ভাঙ্গন আসল অনেকের জীবনে। এর, কোন দিন ওর কোনদিন জীবন সঙ্কটময় হয়ে উঠল। আমরা সবাই একে অন্যকে সেবা করে যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করতাম। সেই মাঝরাত্রে "ডাক্তার ডাক্তার" বলে চিৎকার করা—তার পর জেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া আমাদের কাছে যেন একটা সাধারণ ঘটনা হয়ে গেল।

কয়েক মাস পরে খবর পেলাম—বন্ধু শোভারাণীকে উজ্জ্বলাকে আশ্রয় দেবার অপরাধে গ্রেপ্তার করে লাল বাজার থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে নাকি সে একদিন অনে-কের ঘরে ঢোকার শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়ানর সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় কি যেন আঘাত পেয়ে পড়ে যায়। তারপর থেকে সে উন্মাদ। প্রেসিডেন্সি জেলে অনেক কষ্ট দিয়ে তাকে রাঁচির পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঢাকার জেলে বন্দী অনিল দাশ অত্যাচারের ফলে তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তাওত শুনেছি। তাই শোভারাণীর কথা শুনে দুঃখ পেয়েছি কিন্তু আশ্চর্য্য হইনি। শুধু চাইতাম ওকে হিজলী জেলে অন্ততঃ পাঠিয়ে দিক—সবাই মিলে স্নেহ ও সেবা দিয়ে ঘিরে রাখি। আর কিছু করবার ত আমাদের ক্ষমতা নেই।

আরও কিছুদিন পরে খবর পেলাম—গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক মামলায় বহু বিপ্লবী ছেলে মেয়েকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শান্তি, সুধা —সুলতা, প্রভাতদি, লীলা, অমিয়া প্রভৃতি সকলেই ধরা পড়লেন। তারপর কিছুদিন বিচারাধীন রেখে কাউকে বা দেশ থেকে বহিষ্কৃত কাউকে বা অন্তরীণ করে রাখা হল।

প্রভাতদির অন্তরীণ অবস্থাতেই যক্ষা হল। অনেকদিন ভোগার পর আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতালে বিনা যত্নে বিনা সেবায় তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। মৃত্যু সময়ে একটিও প্রিয়জনের মুখ বা এক বিন্দু চোখের জল তিনি দেখতে পেলেন না। শেষ সময়ে আমাদের কথা নাকি বড় বলতেন।

শান্তি সুধা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা ঈশান স্কলার হওয়া ছাত্রী। পরাধীনতার গ্লানি তাকেও তাব জ্ঞানের সাধনা থেকে সরিয়ে এনে করেছে এই দুর্গম পথের যাত্রী। ওকে দলে পেয়ে আমরা সবাই খুব গর্ব্ব অনুভব করতাম। সুলতা ছিল বড় সরকারী চাকুরীজীবির স্ত্রী। সংসারের অনাবিল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, তার স্বামীর চাকরী যাবার আশঙ্কা—কিছুই তাকে বেঁধে রাখতে পারে নি। মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র্য ওকে চঞ্চল করে ঘরের বাইরে টেনে এনেছিল। লীলা মহারাষ্ট্রের মেয়ে। ছোট থেকে শান্তি নিকেতনে ও কলকাতার কলেজে শিক্ষা-লাভ করে একেবারে বাঙ্গালী মেয়ে হয়ে গিয়েছিল। বাংলা জানত আমার চেয়েও ভাল। বলে না দিলে কেউ জানতেই পারতনা যে সে বাঙ্গালী নয়—এমনি ছিল তার বাংলার কৃষ্টির ওপর শ্রদ্ধা ও বাঙ্গালীর প্রতি প্রীতি। বাঙ্গালী

বিপ্লবী ছেলেদের প্রতি তার গভীর দরদ ও শ্রদ্ধা দেখে এক এক সময় ভাবতাম—কোনও বাঙ্গালী মেয়ে এর চেয়ে আর বেশী কি শ্রদ্ধা দেখাতে পারত?

অমিয়াকে স্বামী পুত্র সব ছেড়ে জেলে আসতে হল। তার বাড়ীতে বিপ্লবীরা আশ্রয় পেত—সেখানে তাদের গোপন সভা বসত। এই অপরাধে তার এই শাস্তি। অন্য বন্দীদের থেকে ভিন্ন করে ওকে তৃতীয় শ্রেণীতে রেখে বেশী কষ্ট দেবার কোন সঙ্গত কারণই আমরা খুঁজে পেলাম না। তাই বেশী কষ্ট হত ওর জন্য। জেলখানায় মেডিক্যাল বিভাগ ও জেল বিভাগ ভিন্ন কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে। ডাক্তারের বিরুদ্ধে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অভিযোগ করতে পারেন। কিন্তু তাকে সরাতে পারেন না। অনেক সময় ডাক্তার বাবুদের সগর্ব্বে বলতে শুনেছি—"আমরা জেলের অফিসার দের সঙ্গে কাজ করি সত্য কিন্তু আমরা ত তাঁদের অধীন নই। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যেত সব সময়েই তাঁরা জেল কর্ত্তৃপক্ষকে সমর্থন করে চলতেন। এমন অনেক ঘটনা হয়েছে—কোন আসামীর ওপর অবৈধ অত্যাচার হয়েছে যার ফলে তাঁর অঙ্গহানি হয়েছে বা মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তাররা তা ভালভাবে বুঝতে বা জানতে পেরেও— চেপে গেছেন। এমনও হয়েছে শুনেছি—ডাক্তার বাবু একজনকে তার টিকিটে অসুস্থ লিখে দিলেন। জেলার বাবুদের সেটা মনোমত না হওয়াতে তাকে নিয়ে এসে আবার কাজে বসিয়ে দিলেন। ডাক্তার বাবু কোন প্রতিকার করলেন না।

ডেটিনিউ অবস্থায় থাকাকালীন একদিনের ঘটনা আমরা উপভোগ করেছিলাম। আমাদের একজন সঙ্গিনী অনেক মাস ধরে অসুখে ভুগছিলেন। সুশ্রূষার ভার আমাদের ওপর থাকাতে তার খাটের কাছে বসেছিলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়ম অনুসারে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে এসেছেন। রোগীর খাটের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন "হাউ ইজ সি"? ডাক্তার বাবু কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"শ্লাইটলি বেটার সার"। সাহেব কানে একটু কম শোনেন। সজোরে প্রশ্ন করলেন—"হোয়াট" ডাক্তার বাবু সভয়ে উত্তর দিলেন—"বেটার সার" অর্থাৎ একটু ভাল। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এবারও শুনতে পেলেন না। আরও চিৎকার করে বললেন "হোয়াট"। ডাক্তার বাবু তখন বলে দিলেন—"সি ইজ্ অল রাইট সার"। সাহেব খুসী হয়ে মাথা নেড়ে সে স্থান ত্যাগ করলেন। আর একদিনের একটি ঘটনাও মনে পড়ে বড় হাসি পায়। ঐ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই একদিন একটি রোগীর সামনে দাঁড়িয়ে খুব বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর জন্য যা করেছে তার তুলনা নেই। ভারতীয়দের আগে মুশলমানদের রাজত্বে কত দুরবস্থাই না ছিল ইত্যাদি। বোঝান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত একটি মুশলমান কর্ম্মচারীকে সজোরে সম্বোধন করে বললেন "ইউ মোগল"—অফিসারটীর বক্তৃতা শুনতে শুনতে একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল—তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন "ইয়েস সার"। সাহেব বললেন "তোমাদের হাতে

খুব লাঞ্ছনা পেয়েছে না? অফিসারটী উত্তর দিলেন "ইয়েস সার"।

আমাদের রাজবন্দীদের মাসে দশ টাকাতে ( পরে সেটা সাত টাকাতে নেবেছিল ) সমস্ত চালাতে হোত—কাপড় জামা, সাবান, তেল, চিঠি পত্র, খবরের কাগজ, স্পোর্টস ফাণ্ড, বই, একটু দামী ওষুধ ইত্যাদি। কাজেই যাদের পরীক্ষা দিতে বই কিনতে হবে বা অসুস্থতার জন্য বার মাস টনিক খেতে হবে—তাদের প্রায় সময় ছেঁড়া কাপড়ও পরে থাকতে হোত। কনট্রাক্টর বাবুরা তাঁদের বরাদ্দ পাওনার চেয়ে অনেক বেশী লাভ নিতেন। যে চিনামাটির গেলাস বাইরে এসে দুই আনায় কিনেছিলাম জেলে তার জন্য আটআনা পয়সা দিয়েছি। কনট্রাক্টার বাবুর বাড়ী থেকে পালা করে সব অফিসারদের বাড়ী তত্ত্ব আসত বলে শোনা যেত। কয়েকটী বন্ধু সে খবরটীও সংগ্রহ করেছিলেন। একদিন সেই রকম একটি তত্ত্ব আমাদের বাজার বলে ভুলে ভেতরে চলে এসেছিল। মেয়েরা সেটা ভাল করে বুঝতে পেরেও তাড়া তাড়ি সেগুলি রান্না করে ফেললেন।

একবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জিনিষের দুমূল্যতা সম্বন্ধে অভিযোগ করে বড় মুস্কিলে পড়া গিয়েছিল। তিনি বললেন অমুক সময়ে তিনি হাটে যাবেন দাম জানতে। কনট্রাকটার বাবুর লোক জন বোধ হয় হাটে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিলেন। সাহেব ঠিক সময় মোটর করে দুই এক জায়গায় প্রশ্ন করে জানলেন যে দাম ঠিকই নেওয়া হয়—অর্থাৎ একটি কপির

দাম চোদ্দ আনার কম নয়। তারপর থেকে আর কোন কিছু বলবার চেষ্টা হয়নি।

প্রতি জেলে কয়েদীদের দিয়ে শাক তরকারী উৎপন্ন করানো হয়। তারা সকাল থেকে ১১টা আবার একটা থেকে সন্ধ্যা অবধি রোদে পড়ে বাগানের কাজ করে। অথচ তাদের ভাগ্যে সে তরকারীর এক টুকরো জুটতো কিনা জানি না। প্রেসিডেন্সি জেলে কচুর তরকারী খেতে খেতে হয়রাণ হয়ে একবার অভিযোগ করাতে—কিছুদিন কচু বন্ধ ছিল। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীদের অভিযোগ আর কে শুনছে? এক একদিন দেখা যেত সাধারণ কয়েদীদের ভাতে এত কাঁকর থাকত যে—ভাত চিবোতে গেলে রীতিমত মটর কড়াইয়ের মতন শব্দ হত। এক একজনকে দেখতাম বড় বড় গ্রাস করে ভাত গিলে ফেলছে। অত কাঁকর বাছবার সময় কোথায় তার?

জেলে আমরা কাগজের মধ্যে পেতাম—দৈনিক ষ্টেটস-ম্যান, সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী—মাসিক বসুমতী। মাঝে মাঝে দেখতাম ষ্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় বা অন্য কলমগুলি একেবারে কাটা। বিশেষ করে কোন রাজনৈতিক মামলার শুনানীর কথা থাকলে সেদিনের পত্রিকাটীর অবস্থা শোচনীয় হোত। নয় তো ঐ শ্রেণীর পত্রিকা আর কি লিখতে পারত যাতে আমাদের রাজনৈতিক চেতনা বা দেশপ্রীতি আরও বৃদ্ধি লাভ করতে পারে? সব বাদ দিয়ে আমাদের কাছে হয়তো পৌঁছত—পঞ্চম জর্জের চতুর্থ পুত্রের বিবাহের বর্ণনা—বা মহারাণীর সামান্য অসুস্থতার খবর। সেই সবগুলিই

আমরা মনযোগ সহকারে পড়ে যেতাম। বসুমতীর সব বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত আমাদের মুখস্থ ছিল।

হিজলী জেলে বড় আনন্দ দিত সেখানকার বিস্তৃত আকাশ। মাঝে মাঝে পরস্পরকে বলতাম "আকাশ কি সব জায়গাতেই এত সুন্দর? মানুষের নির্ম্মমতায় মনটা যখন ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়—তখন তার মনের ওপর প্রকৃতির মাধুর্য্যরস দিয়ে কিছুটা প্রলেপ দেবার এটা কি চমৎকার আয়োজন। মনটা হয়তো এক গভীর অবসন্নতায় ভরে উঠেছে—তবু সকাল বেলার আলোভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আপনা থেকেই মনটা বলে উঠত "আমি কেমন করিয়া জানাব আমার হৃদয় কি নিধি কুড়াল"

নিতান্ত এক ঘেয়ে বিকাল বেলাটা আর কাটতে চায় না তখন মাঠের সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে চলতে চলতে মনে হত "ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে পথে"। শরৎ কালের সাদা মেঘের রূপৈশ্বর্য্যে, বর্ষাকালের বিদ্যুতের খেলায় আর রাত্রির তারাভরা আকাশের স্নিগ্ধতায় ডুবে যাওয়ার আনন্দের যেন আর তুলনা পাওয়া যেত না। মাঝে মাঝে প্রায়ই মনে পড়ে যেতো প্রেসিডেন্সি জেলের সেই ছোট জানালা বিহীন নীচের সেল ঘরে কাটান দিনগুলি। রাত্রে অন্ধকারে পাগলীর চিৎকার শুনতে শুনতে গরাদে ধরে বসে থাকা।—দূরে গেটের কাছে হ্যারিকেন কখন নিভে গেছে। পাগলীও কখন চিৎকার থামিয়েছে—আমিও গরাদের ওপর মাথা রেখে হয়তো একটু ঘুমিয়ে পড়েছি। আবার মশার

কামড়ের জ্বালায় উঠে পড়তাম। সামনের খাটুনী ঘরের পাশ দিয়ে অল্প একটু তারা ভরা আকাশ দেখা যাচ্ছে। অমা-বস্যার দিনে একেবারে অন্ধকার। একটা রাত যেন আর কাটতে চায় না। তবুও সে সব দিনগুলি আজ আমার জীবনে যেন স্বপ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু যে সব বন্দীদের বছরের পর বছর সেল ঘরে কাটাতে হচ্ছে তাদের দিনগুলি কেমন করে কাটছে? ফাঁসির আসামীরা যে বড় একা। অনেক দিন তাঁদের এমনিভাবে একা থেকে মৃত্যুর দিন গুণতে হয়। তাঁদের ছোট ঘর থেকে একটুখানি আকাশও কি দেখতে পাওয়া যায়?

বর্ষাকাল এলে ছোট ছোট মেয়েদের ভেতর একটা মহা উৎসব দেখা দিত। শিল পড়লে তাদের ঘরে রাখে কে? এক একটি পাত্র নিয়ে ছুটত শিল কুড়োতে আর বৃষ্টিতে লাফালাফি করে ভিজে নিতে। আমরা প্রথমে খানিকটা দিদির মতন শাসন করে পরে নিজেরাও কখন দলে ভিড়-তাম। শান্তি নিয়োগী বলত মেঘের ডাক শুনলেই তার ময়ূরের মতন নাচতে ইচ্ছে করে। কারুর আবার মেঘলা দিনে মনটা কি এক অজানা বেদনায় ভরে ওঠে। মানুষের মন যে কত ভিন্ন ভাবে গড়া!

আমাদের মধ্যে একটা উৎসবের সাড়া পড়ে যেত যেদিন বাইরে থেকে কোন নতুন মেয়ে ধরা পড়ে জেলে আসত। কোন দেশে শুনেছি ছেলে মেয়েরা যখন পৃথিবীতে আসে তাদের বাবা মা আত্মীয় স্বজনরা কাঁদে। এই দুঃখ দৈন্যে

ভরা পৃথিবীতে যারা আসছে তাদের জন্য সেদিন শোক করা হয়। আবার কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হলে সে দেশে আনন্দোৎসব করা হয়। "দুঃখের ঘরে" কেউ আসলে আমাদের তার জন্য শোক করাই স্বাভাবিক। নতুন অভ্যাগতকে দেখে আনন্দিত হয়ে যাওয়ার ভেতরে স্বার্থপরতা হয়তো কিছুটা ছিল। আমরা অতসব তলিয়ে না ভেবে নিতান্ত খুসী হয়ে ছুটাছুটি করতে আরম্ভ করতাম। উত্তেজনার বসে কেউ হয়তো প্রশ্নই করে ফেলত—"কলকাতার রাস্তায় এখনও ট্রাম বাস চলছে?" কিছুক্ষণের জন্য হয় তো তার মনে হয়েছে যে "বাইরের জগৎ বুঝি আন্তর্জাতিক", তাকে বাদ দিয়ে তার প্রিয় কলিকাতা নগরী যে ঠিক তেমনি ভাবেই চলছে এই অপ্রিয় বাস্তব সত্য থেকে সে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়।

আবার যেদিন কোন বন্দী মুক্তি পেত সেদিনটাও অন্য দিনের চেয়ে একটু বিশেষ রূপে দেখা দিত। সেদিনের আনন্দের ভেতর সুখের সঙ্গে দুঃখের অনুভূতিটাও যেন মেশান থাকত। যে যাচ্ছে তার জন্য অপেক্ষা করছে কত বিচ্ছেদকাতর উৎসুক প্রাণ। প্রিয়জনদের সঙ্গে মধুর মিলনোৎসব কল্পনা করে আমাদেরও মনটা আনন্দে ভরে উঠত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যথাও মনকে বিচলিত করত।

জেলে আমরা যা কিছু নিয়ে থাকতাম—সবই খুব অল্প ও সীমার মধ্যে। তাই কাছ থেকে একজন চলে গেলেই

মনে হত "যাহা যায় তাহা যায়"। একজনের উপস্থিতি আর একজনের ওপর প্রভাব আনবেই—আবার একজনের অভাব আর একজন অনুভব করবেই। হয়তো কেউ বেশী কেউ বা কম।

আবার এই দুঃখের ঘর যিনি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তাঁর চোখেও দেখেছি জল। কত দিনের কত প্রতীক্ষার পর তাঁর মুক্তির দিন এসে পড়ল। কারাগৃহের বিরাট ঘর তাঁকে বলল—"আর তোমায় বন্ধ রাখব না, দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম"।

তবে আজ কিসের জন্য এত অশ্রুজল? এই জেলখানা তাঁর কাছে ছিল একটা মরুভূমি। প্রতি মুহুর্ত্তে তিনি পোষণ করেছেন একে ছেড়ে যাবার দুর্নিবার আকাঙ্খা। আজ যাবার দিনে তাঁকে বিচলিত করছে তাঁর সব দুঃখের সাথীদের ব্যথাতুর মুখছবি, বহু স্মৃতিজড়িত জেলের প্রত্যেকটী ইঁট পাথর পর্য্যন্ত। হোক্না তারা দুঃখের স্মৃতি, অপমানের স্মৃতি—তবুও তারা হয়ে উঠেছিল নিতান্ত আপন। বাইরে যে অনাগত ভবিষ্যৎ তাঁকে আহ্বান করছে তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় কতটুকু? সে যে তাঁকে আনন্দের ডালি সাজিয়ে অভ্যর্থনা না করে আরও গভীর দুঃখ জ্বালার কণ্টকময় পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে না তাই বা কে বলতে পারে? এই সব নানা চিন্তার জাল হয় তো তাঁকে মুক্তির অবিচ্ছিন্ন আনন্দ ধারায় স্নান করতে বাধা দিত।

জেলের সাধারণ শ্রেণীর বন্দীদের সঙ্গেও আমরা অন্তরঙ্গ ভাবে জড়িয়ে পড়তাম। তাদের বিড়ম্বিত অসহায় জীবনের

দিকে তাকিয়ে আমাদের মন সব সময়েই ওদের জন্য সহানুভূতি ও তার সঙ্গে নিবিড় প্রীতিতে ভরে থাকত। জেল কর্তৃপক্ষ মনে করতেন ওরা ওদের—আমরা মনে করতাম ওরা যে আমাদেরই। তারা মুক্তি পেলেও আমাদের মনে হত—জেলের জীবনটা যেন কত শূন্য হয়ে গেল। তাদের সুখ দুঃখ, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা সবের সঙ্গে পরিচয় হোত খুব বেশী করে। তাদের ভাল করতে গিয়ে ওদের কাছেই লাঞ্ছনা পেয়েছি কতবার। একবার মাসোহারার টাকা দিয়ে সবাই মিলে ওদের মশারী কিনে দিলাম। কিন্তু ওরা ম্যালেরিয়ায় ভুগবে তবু আমাদের স্নেহের দান ব্যবহার করবেনা। ম্যালেরিয়া হলে শরীর যে তাদের ভেঙ্গে যায় সে কথা বোঝাই কি করে।

কেউ আমাদের জব্দ করার জন্য ফেলে রেখে দিল—কেউ বা বলল "যত শীঘ্র আমাদের মরণ হয় তাইত চাই দিদি"। তোমরা বাড়ী যাবে—কত তোমাদের আদর। আমাদের যে মাথা রাখবার আশ্রয়টুকুও হারিয়ে ফেলেছি। মা বাবা নেই—স্বামীর আবার নতুন সংসার হয়েছে। আবার কি ভিখিরী হতে বাইরে যাব"? উত্তর দিতে পারতাম না। কাজ বেশী নেই ওদের। সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে কত করে বলে ওদের পড়ানর অনুমতি পেয়েছি—বই শ্লেট আনান হয়েছে। সবাইকে কি রাজি করাতে পারি? দুচার জনকে পড়াতে পারি। অনেকে জমাদারিনীরা পছন্দ করেনা বলে আমাদের অনুরোধ এড়িয়ে যেত। লেখা পড়া করতে খাটুনীর মত যদি বাধ্য করা যেত।

আবার কত সময়ে মিথ্যে অভিযোগ করে কত না বিব্রত করে দিত। একদিন তাদেরি দু একজন অফিসারদের খবর দিল যে একটি গাছের পাতা নিয়ে আমরা দিন রাত যেন কি করি। তখুনি হুকুম এল শিকড় শুদ্ধ গাছ তুলে অফিসে নিয়ে এস। তারপর তাঁদের কাছে নিয়ে যাওয়া হল একটি লজ্জাবতী লতা। ওর পাতা একটু ছুঁলেই নুইয়ে পড়ে। তাই মেয়েরা অনেকে ঐ পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে খেলা করত।

আর একবার হিজলী জেলের একটি খড়ের ঘরে কেমন করে যেন আগুন লেগে যায়। আমরা তখনও আমাদের বড় ব্যারাকটীতে বন্ধ হইনি। বীণা শান্তিদের বিকাল হলেই বন্ধ হতে হোত। দিনের বেলা ওদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হোত—সন্ধ্যার পর সেদিকে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তাদের ঘরটী যাতে খুলে দেওয়া হয় তার জন্য সবাই মিলে ছুটোছুটি চিৎকার করতে লাগলাম। পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠল—আগুন নেবান হল। তার অনেক পরে ডেপুটী জেলার বাবু চাবি নিয়ে এলেন ঘর খোলবার জন্য। সাধারণ কয়েদী মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ অফিসারদের জানাল যে আমরাই ঐ ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলাম—ঐ সুযোগে পালিয়ে যাব বলে। অবিশ্যি জেল থেকে পালানর চেষ্টা যে একেবারে হয়নি তাও বলতে পারি না। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তবু তার সঙ্গে এ আগুন লাগানর কোন সম্পর্কই ছিল না।

জেল থেকে পালাবার চেষ্টার পেছনে মনোভাব কাজ করেছিল। একটি ছিল নিতান্ত এক ঘেঁয়ে দিনগুলিতে একটু

বৈচিত্র'ত আসবে। হলোই বা সেই বৈচিত্রভরা যাত্রাপথ আরও অনেক কণ্টকাকীর্ণ। তবুত তাতে থাকবে নতুনত্বের স্বাদ। তাছাড়া বাইরের কর্ম্মজীবন যেন ওদের আবার হাত-ছানি দিয়ে ডাকছে। দেশ যেন বড় নিঝুম হয়ে আসছে—বিপ্লবীদের ভুলে গেছে, বিপ্লবের আগুন যেন একেবারে নিভে গেছে। তারা'ত সেই নিভে আসা প্রদীপকে একটু খানিও উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারবে।

তবুও ওদের বড় ভালবাসতাম। যে আসামী আমাদের নামে নালিশ করতে পারতনা—তার দুর্দ্দশার আর সীমা ছিল না। আমাদের সঙ্গেই হিজলীতে গিয়েছিল একটি বিশ বছরের আসামী—মুসলমান মেয়ে। নাম তার জহরা। নিতান্ত বালিকা সরল মন। ছোট বয়সেই পিতৃহীনা। আপন কাকার ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়। বিয়ে নিয়ে শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে কি যেন গোলমাল হয়। বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হতে পারে নি। একদিন সে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করছে বাড়ীর সামনে। হঠাৎ কজন মিলে তাকে মুখ বেঁধে শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে যায় ও আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। মুখ দিয়ে ওর রক্ত পড়েছিল। একদিন মার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝ রাত্রে হঠাৎ কান্নার শব্দে জেগে উঠে দেখে—চারিদিকে লোকজন—শাশুড়ী তার স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে বসে কাঁদছেন! কিছু-ক্ষণ পরে আবার সে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরবেলা পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে এল।

শ্বাশুড়ী নাকি বলেছেন যে তাঁর বৌ ছেলেকে বিষ খাইয়েছে। তারপর থেকে থানায় কি জেলে বাড়ীর লোক কেউই আসেনি। কোনও উকিলও তার পক্ষ সমর্থন করেন নি। সমস্ত দিনের কাজকর্ম্মের অবসরে আমাদের কাছে এসে বসত আর নিজের দুঃখের কথা বলত। এক দিন কেঁদে বলল আমি'ত কোন অপরাধ করিনি দিদি—ভগবান কেন দুঃখ দিলেন আমায়। মাঝে মাঝে মনে হত জেলের এই একটানা দীর্ঘ জীবনের বোঝা ও আর বহন করতে পারছে না। তার বেদনা ক্লান্ত মুখে যেন সব সময়েই এই প্রশ্নটি ফুটে উঠত "জীবন আমার কাহার দোষে এমন অর্থহারা" যতদিন ওর কাছে ছিলাম—অনেক ভেবেও এ প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে উঠতে পারিনি! পেছনে তাকালে মেঘলা অতীতের ফাঁকে ফাঁকে হয়তো শৈশবের রৌদ্রমাখান দুই একটি হাসি খেলার দিন মনে পড়ে। কিন্তু বর্ত্তমানের ধ্বসে যাওয়া ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে সে ভবিষ্যতের গাঢ় অন্ধকারের দিনগুলি কল্পনা করে শিউরে উঠত। হয়তো সমাজের পীড়নে তার মায়ের জীবনতরীও সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে ধাক্কা খেতে খেতে কোন গভীরে তলিয়ে গেছে। বাইরে যখন যাবে তার মাথা রাখবার স্থানটুকুও মিলবে না। আমাদের নামে কোনও অভিযোগ কোন দিনই সে করেনি। আমরা স্নেহ করতাম লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম। সেইজন্য জেলের অফিসাররা পর্য্যন্ত ওর ওপর বিরক্ত ছিলেন। কতদিক দিয়ে ওকে শাস্তি দেবার

ব্যবস্থাও হয়েছিল। আমরা চলে আসার দিন বড় কান্নাই কেঁদেছিল। জেলে এক একদিন কানে আসত জমাদারিনীরা অল্প বয়স্কা আসামীদের বাইরে গিয়ে বিপথে নিয়ে যাবার লোভ দেখাচ্ছে। এক এক সময় ভয় হত অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ওকে ও যদি এই পথে প্রলুব্ধ করা হয়-- তবে দায়ী হবে কে? সেই বালিকা না সমাজ? ১৯৪২ সনে ধরা পড়ার পর বীণা যখন মুক্তি পেয়ে বাড়ী এলেন তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে জহরাকে আর বেশীদিন জেল জীবন ভোগ করতে হয় নি। জেলেই তার জীবন দীপ নিভে গিয়েছে। ওর মৃত্যুর খবর পেয়ে যেন একটু দুঃখের সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলেছিলাম।

জেলে আমরা অনেকে পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেলাম। প্রফুল্ল ম্যাট্রিক পাশ করল। বনলতা ও প্রতিভারা বি, এ পাশ করল। রেণু ও আমি এম, এ পরীক্ষা দিলাম। কমলা চ্যাটার্জী আইনের প্রথম পরীক্ষাটাও পাশ করে গেল। ইন্দুদি জেলে এসে ইংরেজী পড়তে আরম্ভ করে ম্যাট্রিক ও আই, এ পাশ করলেন। লীলাদি ও বীণাই বেশীর ভাগ পরীক্ষার্থিনীকে সাহায্য করতেন।

আগেই বলেছি ক্রমে প্রায় সকলের শরীর ভেঙ্গে আসতে লাগল। প্রথম দিকের সেই গান খেলা ধূলা কবে বন্ধ গেল। বাড়ী থেকে যে গ্রামোফোন ও রেকর্ডগুলি পাঠিয়েছিলেন বৌদি—সেই গুলিই সবাই বসে বসে শুনতাম।

সুহাসিনীর কত পাউণ্ড ওজন কমে গেল। অত

স্বাস্থ্য অত হাসি---দেখে মনে হত—ওর ছায়ামূর্ত্তি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কমলার নিয়মিত করে জ্বর আসে--- পিঠে কিসের ব্যথা। বসতে কষ্ট হয়। ডাক্তার বাবুদের বললে বলেন ওটা ওর মনের অসুখ। পরে ওকে জেল থেকে নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছিল। নীচের তলায় শুইয়ে রেখে নাকি চলে গিয়েছিল। বাড়ীর কাউকে খবর পর্য্যন্ত দেয় নি। একসরে করে দেখা গেল যে পিঠে বহুদিন ধরেই ভারি অসুখ শিকড় গেড়ে বসে আছে।

কমলা দাশ গুপ্তা।

বাইরে অনেকদিন ওর সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি। এতখানি দরদী প্রাণ ও গভীরতার সঙ্গে কাজ করতে মাত্র কয়েকটী মেয়েকেই দেখেছি।

যে কাজের ভার নিত তাকে যেন জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করত। সে ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্য্যন্ত চালাত তার অবিশ্রান্ত সাধনা। সেই একটা জীবন এমন ভাবে জেলে শেষ হতে চলেছে। ভাবনার আর শেষ ছিল না আমাদের।

ইন্দুসুধা

ছিল শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। কখন যে শিল্পের সাধনা করতে করতে বিপ্লবের পথে এসে দাঁড়িয়েছিল তার ইতিহাস জানা ছিলনা। তাকে দেখেছি যখন, তখন সে দুর্গম পথের যাত্রী। জেলে এসে আবার হল সে শিল্পের পূজারী। ছোট একটি ঘরে বসে দিন রাত্রি ছবি আঁকত আর আমাদের গান শেখাত। ওরই উদ্যোগে বর্ষামঙ্গল উৎসবটী অত সুন্দর হয়েছিল।

বনলতার অসুখ বাড়াতে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বিকেলের দিকে দেখতাম—কেউ প্রাচীরের পাশে মাতুর পেতে শুয়ে আছে। কেউ একটি ঘরে সারাদিন থেকে—বিকেলে বুকে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে শুতে যাচ্ছে। এসব দৃশ্য যেন আর দেখা যায় না!

একদিন সারাদিন মন খারাপ করে থাকার পর সন্ধ্যা বেলায় ঘরে ঢুকে দেখি আমার পড়ার টেবিলে বীণা একটি কাগজে লিখে রেখে গেছে—

"মানুষের কাছে সর্ব্বতোভাবে নিরাকাঙ্ক্ষা হইবে"

বাবা বাইবেলের এই কথাটি অনেকবার বলতেন। বীণার জীবনেও এটি অনেক কাজে লেগেছিল। আমি মাঝে মাঝে বন্ধুদের ওপর অভিমান করে দুঃখ পেয়েছি। তাই আমি বড় বোন বলে আমায় বলতে পারে নি—কাগজে লিখে রেখে চলে গেছে।

বীণাদেরও এরি মধ্যে একদিন চলে যাবার আদেশ এল। কল্পনাকে অনেক দিন আগেই ওখান থেকে সরিয়ে ফেলেছে। চট্টগ্রামের বিপ্লবী মাষ্টারদা ও ৺তারকেশ্বর দস্তিদারের জীবন রক্ষার জন্য আবেদন করা হয়েছিল আমাদের মেয়েদের পক্ষ থেকে। কর্ত্তৃপক্ষ ভাবলেন কল্পনা তাঁদের শিষ্যা-সহকর্ম্মী—সেই এই আন্দোলনের পেছনে আছে। তাই ওকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হল। শান্তি নানান রকম অসুখে ভুগছে। ভাল চিকিৎসা হয় না। বীণা একদিন শান্তির চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার বাবুকে বললেন।

ডাক্তার বাবু বললেন—"যান্ যান্ অনেক করা হয়েছে। আর কিছু করা হবে না"।

ওরা তখন শেষ অস্ত্র ধরল—অনশন।

ওদের সঙ্গে আমরাও যোগ দেব এই আশঙ্কায় ওদের একদিনের ভেতর অন্যত্র সরান হল। তারপর গভর্ণমেণ্ট আস্তে আস্তে অনেককে ছেড়ে দেওয়া স্থির করলেন। কাউকে কাউকে তাদের গ্রামের গৃহে অন্তরীণ করলেন। কাউকে বা এমনিই মুক্তি দিয়ে দিলেন। বিমলদিকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে বার্ণপুরের গ্রাম বাড়ীতে অন্তরীণ করা হল। আমরা সকলে বাক্স গুছিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছি—কখন কার মুক্তির হুকুম নিয়ে জমাদার আসে। বৃদ্ধ জমাদার জেলের কাজ করতে করতে বুড়ো হয়ে গেছে। ছাড় পত্র হাতে নিয়ে হাসি মুখে গেট দিয়ে ঢুকলেই সকলে ছুটতাম তার কাছে। তারপর যে যাবে তাকে সকলে মিলে সযত্নে সাজিয়ে তার জিনিষ পত্র গুছিয়ে বিদায় দিতাম। এমনি করে প্রায় সকলেই চলে গেল। শেষ লীলাদি ও সুহাসিনীকে যেদিন জেল থেকে নিয়ে গেল—তারপর দিন থেকে রোজই আশা করে আছি আমাদের তিন জনের মধ্যে (মায়ার মা সুনীতি দেবী—কমলা চ্যাটার্জী ও আমি) একজনের এবার ডাক আসবে। তারপর দিন চলে গেল—সপ্তাহ চলে গেল—মাস চলে গেল—জমাদার আর ঢোকেনা। ডেপুটী জেলার বাবুকে প্রশ্ন করে করে আর উত্তর পাওয়া গেল না। এমন একটা অদ্ভুত শোচনীয় অবস্থার ভেতর দিয়ে কি আর দিন কাটান

যায়? দরজায় ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকান। দিনের মধ্যে ঘণ্টা বাজিয়ে আসছে—জমাদারিনী, আসছে আমাদের সওদা—আসছেন ডাক্তার বাবু—কিন্তু ছুটীর বাঁশি আর বাজেনা। অতবড় বাড়ী ছিল এতজনের কলরবে মুখরিত। সেখানে কি শুধু তিনজনে থাকা যায়? ঠিক যেন একটা প্রেতপুরী চারি দিকে শুধু যারা চলে গেছে তাদের স্মৃতি।

"স্মৃতি মাত্রেরই একটি স্বকীয় রস আছে--কেমন এক উদাস করুণ রস"।

বীণাদের ঘরটীতে ঢুকে বসে থাকি। দেওয়ালে বনলতার হাতে লেখা "নূতন দিনের নব যাত্রীরা চলিবে বলিয়া
এই পথে—
বিছাইয়া যাই আমাদের প্রাণ সুখ দুঃখ
সব আজি হতে!
ভবিষ্যতের স্বাধীন পতাকা উড়িবে যেদিন জয়রথে
আমরা হাসিব দূর তারা লোকে
ওগো তোমাদের সুখে দুঃখে"।

প্রতীক্ষার বেদনা আর স্মৃতির বেদনা—দুই অনুভূতি মিলে যেন উদ্ভ্রান্ত করে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে জেল কর্ত্তৃপক্ষও যেন রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করলেন। নিষেধের জাল দিয়ে আমাদের টুঁটি চেপে ফেলতে চান। জেলের অমুক অমুক স্থানে আমরা যেতে পারব না হুকুম এল! ঐটুকু'ত দেওয়াল দেওয়া জেল। তার ভেতর এখানে যেওনা, ওখানে যেওনা

বলার মানে আছে ? অন্য সাধারণ বন্দী মেয়েদের সঙ্গে—মিশতে পারবে না, কথা বলতে পাবে না। যারা আমাদের কাজ করবে—তাদের সঙ্গে কথা বলবার পর্য্যন্ত আমাদের অধিকার নেই। একই দেওয়ালের ভেতর যাদের সঙ্গে সুখে দুঃখে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে এতদিন থেকেছি—তাদের দেখতে পাব—সামনে দিয়ে চলে যাবে—অথচ কথা বলতে পারব না। তাদের পড়াতাম, অসুখ হলে সেবা করতাম—এখন সেগুলি খুবই দোষণীয় ব্যাপার হয়ে গেল। জমাদারিনীরা সব যেন এক একজন মূর্ত্তিমতী চামুণ্ডা। কথায় কথায় আমাদের শাসন করতে আসে—নালিশ করতে চলে যায়। কিছুদিন সহ্য করে—পরে বিদ্রোহ সুরু করলাম। সংখ্যায় কম বলে আমাদের সহ্য শক্তির ওপর এত জুলুম ? "শক্তির পরিচয় পেতে চাও তাও দেব—কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করব না"। কদিনের জন্য অনশন করার পর কিছু কিছু সুবিধা ফিরে পেলাম।

কিছুদিন পরে খবর পেলাম হাসপাতালে বন্দী অবস্থাতেই বনলতার মৃত্যু হয়েছে। অসুখ বেড়ে যাওয়াতে গলায় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হল। বাড়ীর আদরের ছোট মেয়ে। মা আবেদন করলেন শক্ত অসুখ বিদেশে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করবেন। কর্তৃপক্ষ তাতে সম্মত হলেন না।

বনলতা মাকে অনেকবার বলেছিল—বাড়ী যেতে বড় ইচ্ছে করে মা—একবার নিয়ে যেতে পার না ? অসহায়া মা শুধু চোখের জল ফেলেছিলেন। অস্ত্রোপচারের পর

একটুখানির জন্য চঞ্চল হয়ে মাকে কাছে পেতে চেয়েছিল। নার্শরা মাকে ঢুকতে দেয় ।ন। পরে মা এসে মৃতা কন্যাকে কোলে নিলেন। খবরটি পেয়ে প্রথমেই মনে পড়ে গেল এস বি অফিসে সেই যে শুনেছিলাম "আচ্ছা—আমরাও দেখব আপনি কেমন করে বাড়ী ফিরতে পারেন।"

ওর মৃত্যুর খবর যেন আমাদের বুকে বজ্রশেল হয়ে আঘাত করেছিল। জেলের সব জায়গাই ওর হাসি গানের স্মৃতিতে ভরা। দিনরাত শুধু ওকে জড়ান চোখে কত স্মৃতিই যে ভেসে বেড়াত। একদিনের কথা—দিনের বেলা স্নেহময়ী বৌদিদির চিঠি এল—বাবার খুব বড় অস্ত্রোপচার হবে—দিদি, মেজদি, সেজদি সব এসেছেন। খুব শক্ত অসুখ। দূর থেকে যেন প্রার্থনা করি। আমাদের দুই বোনের মনের দুশ্চিন্তা বোধ হয় মুখে ফুটে উঠেছিল। বনলতা সারাদিন আমাদের ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করল।

রাত্রিবেলা ঘরে বন্ধ হয়ে নিজের বিছানায় বসে হাত জোড় করে চোখ বুজে কি করল। তারপর ধীরে ধীরে আমার পাশটিতে এসে বসল। অতক্ষণ বসে বসে কি করছিল জিজ্ঞেস করাতে বলল—"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলাম তোমাদের বাবাকে ভাল করিয়ে দিন—তার বদলে বরং আমার মাকে তুলে নিন। তোমরা যে বাবাকে বড় ভালবাস—ফিরে গিয়ে যদি না দেখতে পাও"—বলেই একটু লজ্জা পেয়ে বলল "তোমাদের ভগবানের কাছেই

প্রার্থনা করেছি।” আমাদের ভগবানে বিশ্বাস ও প্রার্থনা করা নিয়ে অনেকদিন ঠাট্টা করত কিনা।

ওর মা ওর পিতৃহীন জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করে আছেন তাত জানি। তাই ওর কথা শুনে মনে হল—ঐ মার “মৃত্যু” প্রার্থনা করতে পারল?

ঠিক তার কদিন পরে ওর ও আমাদের নামে চিঠি এল। আমাদের চিঠিতে লেখা—বাবা ভাল আছেন—অস্ত্রোপচার ভাল ভাবেই হয়েছে। ওর চিঠিতে লেখা—মার ব্লাড প্রেসার বেড়ে খুবই ভয়ের কারণ হয়েছে—ছুটীর জন্য যেন দরখাস্ত করে। বুকের ভেতরটা ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল। একি সেই প্রার্থনার ফল? কদিন পরে খবর এল ওর মা অনেকটা ভাল আছেন।

এই ঘটনাটি অনেকদিন পরে কমলা (দাশ গুপ্তা) কে বলে ছিলাম। কমলা বলেছিল শুনে—প্রার্থনার কোন ফল আছে কিনা বলতে পারি না—তবে খুব বড় noble heart না হলে এমন প্রার্থনা কেউ করতে পারেনা। আবার মনে পড়ে যেত সেই বনলতার পাগলামী খেলা। এ খেলার সঙ্গী ছিল তার বীণাদি। একদিন একটি খুব ছোট ঘরের পুরান ভাঙ্গা দরজার কোণে লাল পিপড়ের বাসায় তুজনে পা রেখে দাঁড়িয়ে রইল। প্রথমে অনেক আদর করে ওদের বারণ করলাম। তাতে ওদের শুধু হাসি। শেষে যখন রাগ করে আমিও পা রাখতে গেছি—তখন সরে এল। পা ফুলে লাল হয়ে গেছে। বিমলদি এসে কত কি ওষুধ লাগিয়ে দিলেন।

একদিন রান্না ঘরে ওরই রান্না করছি। গরম উনানের ভেতর ওরা দুজনে হাত দেবে—পরীক্ষা করে দেখবে নিজেদের সহ্য শক্তি কতখানি। বীণা বললে—আমি বড় আমি আগে দিই তার পর তুমি দিও। নিজে হাত পুড়িয়ে দেখল বড় যন্ত্রণা বনলতাকে টেনে নিয়ে চলে গেল পোড়াতে দিল না। ওর তখন কি কান্না—বীণাদি আমায় ঠকালেন, আমার হাত পোড়াতে দিলেন না। ওদের ঘরে গিয়ে দেখি—বরফ হাতে নিয়ে বসে আছে বীণা, শান্তি, বনলতা। মাঝে মাঝে রাগ করে বলতাম—তোমাদের নিয়ে কোন দিন শান্তি পাই না কখন কি করে বস।

কিছুদিন পরে জেলটা পুরান হয়ে গেছে—পালিয়ে যাবে স্থির করল ওরা কজনে। অনেক জেল যন্ত্রণা বেড়ে যাবে —কাকে কোথায় নিয়ে যাবে। তবুত একটু নতুন জীবনের স্বাদ পাবে! সবই প্রায় ঠিক খুব রিহার্সেল চলছে ভেতরের একটি ছোট পাঁচিল থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে। একদিন একটি শাড়ী পাকান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে জমাদারিনী সেটা জেলার বাবুর কাছে নিয়ে গেল। এমন কড়া পাহারার ব্যবস্থা হল যে ওদের পালানর চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। এমনি শত স্মৃতি-জড়িত দিনগুলি কোথায় চলে গেল? আর তাদের ফিরে পাব না। শরৎ বাবুর একটি বইয়ে পড়েছিলাম—

"যদি প্রিয়জনকে হারাইয়া এ পৃথিবীতে আবার স্থায়ী হইতে চাও তবে যত পার নিজেকে খাটাও—তিল মাত্র

বিশ্রাম লইওনা। অতীতের পানে চাহিয়া দেখিওনা—ভবিষ্যতকে কাছে ঘেঁসিতে দিওনা। কেবল হাড় ভাঙ্গা কাজ কর"। জেলে নিজেকে ভুলিয়ে রাখব কি করে? কাজ কোথায়? হয়তো আরও কত দীর্ঘদিন এমনি ভাবে কাটাতে হবে।

প্রফুল্লর মৃত্যুর খবরও জেলে পেলাম। তাকে জেল থেকে নিয়ে গিয়ে এক গ্রামে অন্তরীণ করে রেখেছিল। হঠাৎ একদিন প্রফুল্ল অসুস্থ হয়ে পড়ে। অন্তরীণ থাকার সব চেয়ে বড় অসুবিধা এই যে কোন ডাক্তারকে ডাকতে হলে স্থানীয় এস ডি ওর অনুমতি চাই। তাঁকে সব সময় পাওয়া খুব শক্তকর ব্যাপার। ওর বাবা এস ডি ওকে খুঁজে অনুমতি নিয়ে ডাক্তার বাবুকে যখন নিয়ে এলেন—তখন তার শেষ নিঃশ্বাস টুকুও বার হয়ে গেছে। বছর দুয়েকের ভেতর বাংলার এগার শতাধিক রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল। আমরা সবাই স্বগৃহে ফিরে এলাম। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা উৎসবের দিন দেখলাম চারিদিকে শুধু হাসি রাশি আনন্দ ও আলোর মেলা। ছাত্র ছাত্রীরা রাত্রে মশাল জ্বালিয়ে স্বাধীনতাকে আহ্বান করছে। চোখ দিয়ে সেদিন শুধু জল পড়ছিল এদের সকলের কথা মনে পড়ে। প্রফুল্ল বনলতার মতন কত বন্দী ছেলে মেয়ে আর ঘরে ফিরতে পারেনি। সেই মা বাবার বুকের ব্যথা দেশ জোড়া এই আনন্দ কোলাহলে কিছু লাঘব হতে পেরেছে কি?

হিজলী জেলে অনেক মেয়ের মতন আমারও ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া হল। জ্বরের ঘোরে নিঝুম হয়ে থাকতাম। যখুনি তাকাতাম দেখি কমলা ( চ্যাটার্জী ) মাথার কাছে বসে বরফ দিচ্ছে বা হাওয়া করছে। সমস্তক্ষণ যেন ওর স্নেহ-স্পর্শ দিয়ে আমায় ঘিরে রাখত। মাসীমাকে অনশনের পরই গ্রামে পাঠান হয়েছিল। বেশী জ্বর বন্ধ হলেও অল্প জ্বর আর বন্ধ হতে চায় না। কিছুতেই হজম হয়না। যা খেতাম তা সাত আট ঘণ্টা পরে প্রকাণ্ড বড় নল মুখে ঢুকিয়ে বার করে ফেলা হত। এমনি করে প্রায় দুই মাস বাঁচিয়ে রাখা হল। কমলা ক্রমাগত সুপারিটেণ্ডেণ্টকে বলছে—এক বার সিভিল সার্জেনকে যেন ডেকে আনা হয়। অন্য কারুর বেশী অসুখ হলে মেদিনীপুর থেকে বড় ডাক্তার আনার ব্যবস্থা হত। কিন্তু এবারে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন যে জেলের সব নিয়ম মেনে চলব—এই রকম প্রতিশ্রুতি লিখে দিলে ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা তিনি করবেন। একদিকে বন্দীর জীবন—অন্য দিকে কর্তৃপক্ষের প্রেষ্টিজ। কেউই কারুর কাছে পরাজয় স্বীকার করবনা। বাড়ীতে অসুখের কথা লিখতে পারি না। সে চিঠি বাজেয়াপ্ত হতে লাগল। এমনি ভাবে দিন যেতে যেতে—কমলাকেও অন্যত্র পাঠানর হুকুম এসে গেল।

অসুস্থা আমাকে ঐ রকম অসহায় ভাবে ছেড়ে যেতে ওর কত কষ্ট হয়েছিল তা যত চেষ্টাই করুক না কেন ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। বিপ্লবীর চোখের জল ফেলায় বড় লজ্জা। একদিন আমাকেও যেতে হবে বলে খবর এল।

কোথায় যেতে হবে সে খবরটা বন্দীদের জানান হয় না। সব জিনিষপত্র সমেত আমাকে ট্যাক্সিতে ওঠান হল। আসবার সময় নিয়মানুসারে সমস্ত জিনিষ পত্র তল্লাস করা হল। অন্য (সাধারণ শ্রেণীর) বন্দীরা তাদের ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ কিছু কিছু তাদের হাতের কাজ করা জিনিষ উপহার দিয়েছিল। হয় তো একটি পুরান কাপড়ের বালিশ-ওয়াড়—তাতে ফুল পাখী এঁকে নক্সা করা। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে ফুলের মালা কি অন্য কিছু করা জিনিষ। জেল গেটে এসে দেখি সে সব আটকে ফেলা হয়েছে। সেগুলি নাকি জেলের সম্পত্তি। অনেক অনুরোধ করে—সেগুলি আমাদেরই দেওয়া কাপড়ে তৈরী বলে বুঝিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম। কত লুকিয়ে লুকিয়ে কত যত্নে ওরা তৈরী করেছিল সে'ত জানি। আজও তারা আলমারীতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

জেল থেকে বার হবার আগে সেই আম গাছটীর দিকে চোখ পড়ে গেল। একটি আঁটি থেকে চারা বার হয়ে একটি আম গাছ বেড়ে উঠেছিল জেলের উঠানে। কত দিন এক-জন আর একজনকে খেলা করে বলেছে "তোমায় আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘায়ু হও আর এই গাছের আম খাও"। সেই গাছের আম আর কাউকে খেতে হল না।

বীণার একটি বন্দিনীর অটোগ্রাফে লিখে দেওয়া কবি-তাটী মনে পড়ে গেল।

"অনেক দূরের যাত্রী—
চলেছি পথ আমরা সবাই
ক্লান্তি বিহীন দীর্ঘ দিবা রাত্রি
এর মাঝেতে এই যে হাসা
মেলা মেশা—ক্ষণিক ভালবাসা
কেন এসব? অর্থ কি এর?
আর কিছু নয়—দুঃখ শ্রান্তি নাশা
তপ্ত পথের ধারে ধারে একটু ছায়ার আশা"

## মেদিনীপুর জেল

মোটরে করে চলেছি—কোথায় যাচ্ছি—কিছু বুঝতে পারছি না। নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছি। এক এক-বার মনে হচ্ছে—বাড়ীতেই নিয়ে যাচ্ছে কি? কিন্তু খড়্গপুর'ত এত দূর নয়। ঘণ্টা কয়েক পরে মেদিনীপুর জেলের সামনে গাড়ী থামল। শুনলাম অসুস্থ বলে ট্রেণে আনা হয়নি। সেখানকার মেট্রণ এসে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। সব যেন এখন পুরান হয়ে গেছে। প্রথম দিকের সেই সব জিনিষে কৌতুহল—জেলের নতুন জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার আনন্দ—এখন আর নেই।

সেখানে গিয়ে দেখি লীলাদি ও সুহাসিনীকে এনে রেখেছে। শুনলাম বীণাদের ও কমলাকে রাজশাহীতে নিয়ে রেখেছে। উজ্জ্বলা সরোজ প্রভৃতি আগে থেকেই সেখানে রয়েছে। উজ্জ্বলার লিবং মার্ডার মামলায় চোদ্দ বছরের জেল হয়েছিল।

সুহাসিনীকে অল্প কয়েক দিনের ভেতর গ্রামে পাঠিয়ে দিল।

ভেতরে ঢুকে দেখি—কয়েদীদের প্রায় অনেকে সাঁওতালী মেয়ে। রাত্রে ওদের শোবার ঘর একটি। চল্লিশ জন যে ঘরে শোবার কথা সেখানে আশী জনের শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়াতে পয়সার বড় অভাব এরা মহুয়া ফুল দিয়ে বা ভাত পচিয়ে মদ তৈরী করত আর ধরা পড়ত। ছাড়া পেয়ে বাইরে যায়—আবার না খেতে পেয়ে মদ বিক্রী করে জেলে আসে।

কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলাম যে সংখ্যার অনুপাতে গোলমাল চিৎকার এখানে খুব কম। সাঁওতালরা প্রকৃতিতে বোধহয় শান্ত। কিম্বা সাঁওতালী খৃষ্টান মেট্রণটী শান্ত প্রকৃতির বলে তাঁর ব্যবস্থার সব কিছুও শান্ত। জমাদারিনীরাও একটু যেন ভদ্র প্রকৃতির। অন্য জেলের মতন অত হৃদয় হীনা নয়। আর কয়েদীদের ভেতর ঝগড়া মারামারি করানই এদের কাজ নয়।

অল্প কিছুদিন পরে দেখি—হিজলী ক্যাম্পের সব চেয়ে দুর্দান্ত জমাদারিনী, যে আসামীদের লোহা গরম করে মারতে যেত—চিৎকারে জেলখানাটাকে কাঁপিয়ে তুলত—যার নামে দিনে অন্ততঃ একবার করে আমাদের তরফ থেকে অভিযোগ যেত—ওখানকার জেল বন্ধ হয়ে যাবার পর শুধু তাকেই কাজ থেকে বরখাস্ত না করে তার কার্য্যপটুতাকে প্রশংসা করে যাতে সে মেদিনীপুরে কাজ পায় এই অনুরোধ করে হিজলীর কর্তৃপক্ষ তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে আসার

পরই মেদিনীপুর জেলের শাস্তি অনেকাংশে দূর হয়ে গেল। খুব লম্বা ছিল বলে হিজলী জেলে ওকে লম্বী বলে ডাকা হত। ও রাগ করে চলে যেত বড় সাহেবের কাছে নালিশ করতে।

জেলে ঢুকে পরের দিন আমাদের মেয়েদের ওয়ার্ডের চারি দিক ঘুরে ঘুরে দেখছি। এমন সময় চোখে পড়ল—উঠানে কারা সারি সারি শুয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে দেখি সাত আট জন কুষ্ঠরোগগ্রস্থা মেয়ে পড়ে রয়েছে। রোগে তাদের শরীর বীভৎস রূপ ধারণ করেছে—সর্ব্বাঙ্গে মাছি ভন্ ভন্ করছে। ওদের বাড়ীতে দেশী মদ পাওয়া গিয়েছে বলে ওদের জেল হয়েছে। আলাদা রাখবার ব্যবস্থা না হওয়াতে দিনের বেলা এখানে এনে রৌদ্রে শুইয়ে রাখা হয়। সব চেয়ে বেশী অবাক হলাম যখন দেখলাম সেই সত্তর আশী জন মেয়ের সঙ্গে তাদেরও সেই এক ঘরেই রাখা হয়। সেই ঘরে অন্ততঃ পনরো কি ষোলটী ছোট ছোট ছেলে মেয়েও শুতো তাদের মায়েদের সঙ্গে। এখনকার জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে সভ্য জগতে এটাও যে সম্ভব হয় কি করে তাই কেবল ভাবতে লাগলাম। পরাধীন দেশ বলেই এটা সম্ভব। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন একজন বড় ডাক্তার। তাঁকে বললাম যে তিনি যখন ডাক্তার তিনি'ত এর প্রতিবাদ করতে পারেন। উত্তরে তিনি বললেন—গভর্ণমেণ্ট যখন কিছু করছে না—তিনি কি করতে পারেন। ডাক্তার হয়ে এত বড় অন্যায় তিনি মেনে নিলেন কি করে? দিনের পর দিন চোখের সামনে ঐ

কুষ্ঠ রোগীদের দেখে মনটা মাঝে মাঝে অবসাদগ্রস্থ হয়ে যেত। মানুষের অমন সুন্দর নিখুঁত দেহের কি ভীষণ পরিণতি। আবার আমরা যে ঘরে থাকতাম তার পাশেই ছোট পাঁচিলের ওপাশে পুরুষ কুষ্ঠ রোগীদের ব্যারাক। যে তুধ দিয়ে ওদের ঘা ধোয়ান হত তাও কেউ কেউ দেখেছিল কেমন করে এদিকে এসে যেত।

কিছুদিন পরে আমাদের অন্য ওয়ার্ডে সরিয়ে দিয়ে সেই ঘরে কল্পনা ও শান্তিকে নিয়ে আসা হল। ছেলে মানুষ মেয়ে ওরা। রীতিমতন ওরা ওদের দেখে ভয় পেয়ে যেত। দিনের বেলা এত মাছি যে তাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দিনেও মশারি টাঙ্গিয়ে রাখত। খবর পেলাম যে জেলের অফিসারদের কাছ থেকে এক জোড়া চটির জন্য তাদের কত দিন যে অনুরোধ করতে হয়েছিল, যদিও জেল কোড অনুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীরা চটি পেতে পারে।

মেদিনীপুরে রাত্রে ঘুমের বড় ব্যাঘাত হোত। প্রথম প্রথম তুই কানে আঙ্গুল না রেখে ঘুমান যেত না। সারা-রাত প্রহরীরা পাহারা দিত। প্রথম প্রহরে—একজন চিৎকার করে ওঠে—অমুক নম্বরে সব ঠিক আছে? সেই নম্বরে—সেই প্রহরে যে পাহারাওয়ালার ডিউটী থাকে সে চিৎকার করে উত্তরে জানায়—এতজন আসামী এতগুলি থালা এতগুলি তালা সব ঠিক আছে। তার পর অন্য নম্বরের খোঁজ নেওয়ার পালা। সমস্ত রাত্রি এই চিৎকার চলতে থাকে। যারা চিৎকার করে এমনি করে—তারা বাঁচে কি করে, জিজ্ঞেস

করাতে কয়েদীদের মুখে শুনলাম যে সম্প্রতি একজন মেট সারা রাত চিৎকার করে ভোর বেলায় মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মারা গিয়েছে। শুনে ভাবলাম নিশ্চয়ই গলার শির ছিড়ে গিয়েছিল কিম্বা হার্ট ফেল করেছিল। সে নাকি বিশবছরের আসামী ছিল। আর অল্প কিছুদিন পরেই ছাড়া পেয়ে যেত।

আমাদের বিকাল বেলা ঘরে ঢোকবার আধ ঘণ্টা আগে একবার গুণ্‌তি করে যেত। আবার জেলার বাবু নিজে জমাদার প্রভৃতির সঙ্গে ঘরে ঢুকে গুণ্‌তি করে--পরে মস্ত বড় তালা দিয়ে বন্ধ করে চলে যেতেন। ভেতরে পাহারা দেবার জন্য থাকত চারজন সাধারণ কয়েদী—ও চারজন জমাদারিনী। সারা রাত তারা পালা করে পাহারা দিত। আমাদের ওয়ার্ডের পাঁচিলের ওপাশ থেকে কিছু পরে পরে সেপাই জিজ্ঞাসা করত "ঠিক হ্যায়"---জমাদারিনী উত্তর দিত—সব ঠিক হ্যায়—দো স্বদেশী চার কয়েদী। আমাদের সঙ্গে কি ভাগ্যিস খাট, চেয়ার, টেবিল, তালা, থালা, গেলাসের কথা আর বলত না। অত কাণ্ড করে পাহারা দেওয়া সত্বেও ভোর বেলা অন্ধকার থাকতেই জেলার প্রভৃতি এসে আবার দেখ-তেন আমরা দুজন ঠিক আছি কিনা। সুস্থ থাকি বা অসুস্থ থাকি উঠে বসতে হত। তখনও অন্ধকার থাকত বলে জমাদারিনী মুখের সামনে হ্যারিকেনটা ধরত—আমরা কনে বৌয়ের মত মুখটা তুলে আবার সলজ্জে নাবিয়ে ফেলতাম। অমন ভাবে দেখলে অজ্ঞাতসারে একটা সঙ্কোচের ভাব এসে যায়। একদিন অসুস্থতার জন্য মাথাটা সামনের দিকে বালিশে

রেখে বসেছিলাম। জমাদার হুকুম করল মাথা সোজা করে বসতে হবে—। পরে কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেছিল অত পরিশ্রম করে সারারাত পাহারা দিয়ে যাকে পাঁচিলের ভেতর রাখা হয়েছে—"উহ জিন্দা হ্যায় কেয়া মর গিয়া ওতো দেখনেই হোগা"। মরে গিয়েও ত বসে থাকতে পারি। আমি বোঝালাম ওর ত শুধু দেখার কাজ স্থূল শরীরটা গারদের ভেতর আছে কিনা—সেটা মৃতই হোক বা জীবন্ত দেহই হোক। বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়ার জন্য সে'ত দায়ী হবে না। জমাদার কিন্তু আমার কথা কিছুতেই মেনে নেয়নি।

যে ঘর থেকে দীনেশ বাবু সুশীল বাবুরা পালিয়ে গিয়েছিলেন সেই ঘরেই আমাদের রাখা হয়েছিল। ভাবতাম চারিদিকের এই পাহারার ভেতর থেকে তাঁরা কি করে অত বড় এবং অতগুলো প্রাচীর পার হয়ে চলে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলত সন্ধ্যা বেলা আর ঘরেই ঢোকেন নি। সারা রাত গাছের ওপর আশ্রয় নিয়ে ভোর রাত্রে চলে গিয়ে ছিলেন। বাইরে থাকতে যখন ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি ভাবে ওঁরা চলে যেতে পেরেছিলেন একথাটি জিজ্ঞেস করলে—হেসে এড়িয়ে যেতেন। এসব কথা যে তিনি বলতে পারেন না।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় লীলাদি, আমি ও জমাদারিনীরা এক সঙ্গে বসে লুডো খেলতাম। লীলাদি প্রায় রোজই হেরে যেতেন। সত্যিই হারতেন না অসুস্থ বোনকে আনন্দ দেবার জন্য নিজেকে হারাতেন—ঠিক বুঝতে পারতাম না। কোন দিন

বা বিখ্যাত লেখকদের রচিত ভাল ভাল গল্প বলে শোনাতেন। কিছুক্ষণ পড়াশুনা করার পর আমরা ঘুমোতে যেতাম।

একদিন রাত্রে পাশের কয়েদীদের ঘর থেকে খুব চিৎকারের শব্দ শুনলাম। একটি মেয়ে পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে বলে জানতে পারলাম। জমাদারিনী ঘরে বন্ধ হয়ে থাকে বলে—তারাও আমাদের সঙ্গে "জমাদার ডাক্তার বাবুকে ডাক" বলে চিৎকার করতে লাগল। সারারাত ডাক্তার বাবু কি জেলের অন্য কেউ একবার এলেন না। ভোর বেলা উঠেই ওদের ঘরে গিয়ে দেখি ওর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে রয়েছে। জমাদারিনীরা তাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল। অনেকক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করে ভোর রাত্রে শান্তিলাভ করেছে। বিনা চিকিৎসায় বিনা যত্নে কি অসহায় ভাবেই না সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। ওকে দেখেই চিনতে পারলাম। আগের দিন ঘরে বন্ধ হবার আগেও উঠানটি পরিষ্কার করেছিল। ঠিক দুদিন আগে ওর টিনের টিকিটটি হাতে করে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল—দিদিমনি তুমি'ত লেখা পড়া জান—একটু পড়ে বলে দাওনা আমি কবে ছাড়া পাব। পড়ে বলেছিলাম তোমার জেলের দিন'ত ফুরিয়ে এসেছে আর তিন দিন পরে তুমি বাড়ী যাবে। মুখটি তার হাসিতে ভরে গিয়েছিল।

দিন গোনার ভুল হল। একদিন আগেই সে ছুটি পেয়ে চিরদিনের আবাসে চলে গেল। ও ছিল মুশলমান—তাই ওর মৃত্যুর পর কেউ কেউ বলল—ও জেলে মাটি কিনে রেখেছিল। তা'না হলে আর একটা দিন আর ওর প্রাণটা রইল না।

সমস্ত দিন তার মৃতদেহটা ঐ অবস্থায় পড়ে রইল। বিকেলে ডাক্তার বাবু এসে লিখলেন—"ক্রণিক ডিসেন্ট্রিতে মারা গেছে"। আমরা বললাম—আপনি দেখলেন না চিকিৎসা করলেন না—কি করে জানলেন ঐ অসুখ? ডাক্তার বাবু বললেন—ঐ অসুখ আজকাল অনেকের হচ্ছে—ওরও নিশ্চয়ই হয়েছিল। আমি বললাম—এমন অসহায় ভাবে মারা গেল আপনি এসে একটু চিকিৎসার ব্যবস্থাও করলেন না। ডাক্তার বাবু বললেন—"কত চিল পাখী দিন রাত মরছে—এরাও মরছে বাড়ীতে থাকলে কি ওর কোন চিকিৎসা হোত"? সেখান থেকে আস্তে আস্তে চলে গেলাম। ভাবলাম বাড়ীতে চিকিৎসা হোত কি না জানিনা—চোখের জল ফেলবার কেউ অন্ততঃ থাকত। ডাক্তার বাবু চলে যাবার পর দুজন এসে একটি খাটে উঠিয়ে মৃতদেহটাকে নিয়ে চলে গেল। ছোট ছেলে মেয়েদের মৃতদেহ বাগানের এক পাশে পুঁতে ফেলা হয়। বড়দের হয় সৎকার সমিতি নয় কোন মুশলমান প্রতিষ্ঠানের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। তাকে নিয়ে চলে যাবার পর ভাবলাম—কালও সে ঘুরে বেড়িয়েছে কাজ করেছে, বুকে ছিল তার কত আশা কত আকাঙ্খা। সন্তান ও স্বামীর সংসারে ফিরে যাবার কি আকুলতা। আজ তার জীবনের কি পরিণতি। কবির কবিতার কটি লাইন মনে পড়ে গেল—

"নাহি ভৎসে' অদৃষ্টেরে নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি
মানবেরে নাহি দেয় দোষ—নাহি জানে অভিমান
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে।

দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া—
দীর্ঘশ্বাসে—
মরে সে নীরবে"।

মেদিনীপুর জেলেও শান্তির গানের সুর ভেসে আসে রাত্রির নিস্তব্ধতায়—

"কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে—
সাগর জলে ভাসিয়ে দিলেম পালটী তুলে"—

একজন বললেন রাত্রি হলেই যেন তিনি শুনতে পান এক মায়ের কান্না। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী যারা রাজনৈতিক ব্যাপারে ধরা পড়ত—তাদের "সরকার সেলাম" বলতে বাধ্য করা হত। একটি ছেলেকে কিছুতেই জেলের শাসনে রাখা সম্ভব হয়েনি। সে এসেছিল তার মার সঙ্গে তিন বছরের জেল মাথায় নিয়ে। স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার—বয়স আন্দাজ বছর আঠার। প্রথম থেকেই সে জেদ ধরল—"সরকার সেলাম" সে বলবে না। ফলে মাসের অধিকাংশ সময়ই তাকে শাস্তি পেয়ে অন্ধকার সেলে দিন অতিবাহিত করতে হোত। কিছুদিন পরেই আলো ও খাদ্যের অভাবে তার যক্ষ্মা হল। বেশী বেড়ে যেতেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। মেয়েদের জেল থেকে তার মাকে কয়েকদিন দেখতে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে মাকে দেখেই বলত—"মা আমায় গ্রামে নিয়ে চলনা—সেখানে গিয়ে মরতে চাই।"

অসহায় বন্দী মা তার অনুরোধ রাখতে পারেন নি। আত্মীয় স্বজনরা যদি দায়ীত্ব নিতে পারে এই অনুরোধ করে চিঠি দিয়েও কোন উত্তর পাননি। একদিন মা খবর পেলেন— "তোমার মৃত সন্তানের দেহ যদি একবার দেখতে চাও তো এস"।

দিন কারুর জন্য অপেক্ষা করে না। একদিন এল যেদিন সেই মাকে একলাই ফিরে যেতে হল তাঁর শূণ্য কুটিরে। সেই একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে মার করুণ কান্না যেন জেলের দেওয়ালে দেওয়ালে এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিশেষ করে রাত্রির নিস্তব্ধতায় যেন সেই কান্না শুনতে পাওয়া যায়— "বাবা আমার ফিরে আয়—আমার বুকে ফিরে আয়—আবার আমরা বাড়ী যাব"।

অফিস ঘরে কোন কাজে যাবার বা ফিরবার পথে দেখতাম একটি ঘরে অনেকগুলি ছেলে বসে বসে যেন কি করছে। খবর নিয়ে জানলাম তারা চাল বাছছে। আমার ছোট ভাইয়ের বয়সী সব তারা। অত ঘণ্টা ধরে তাদের চুপ করে বসে এ চাল বাছার কাজ করতে হয় শুনে প্রথম দিন মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এরা ছিল বাড়ীতে মা জেঠিমার কত আদরের ধন। বাড়ীতে এক গেলাস জল ঢেলে খেতেও বোধহয় এদের আপত্তি ছিল। বাড়ীতে যাদের ছিল দুর্দান্ত প্রতাপ—আজ তারা বসে বসে একটি একটি করে চাল বাছছে, পাথর ভাঙ্গা, ঘানি ঘোরান প্রভৃতি কঠিন কাজ ও ঐসব ছেলেদের দিয়ে করান হয় সে কথা ভাল করেই জানি।

তবুও এ দৃশ্যটি কেন যেন বড় করুণ বলে মনে হয়েছিল। তারপর তারা ঘর পরিষ্কার করবে, কাপড় কাচবে নিজের হাতে। ভাগ্যিস মায়েদের এসব দেখতে হয় না। বীণাদের রবিবার দিনে মোটা কাপড় জামা বিছানার চাদর প্রভৃতি নিজের হাতে কাচতে হত। মা দেখতে এসে গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন ধোপা বাড়ী থেকে সব কেচে আসে কি না। বীণা নির্ব্বিবাদে জানাত যে তাকে নিজে কিছুই করতে হয় না—জেল থেকে সব করে দেয়।

মেদিনীপুরে একটি সুবিধা ছিল যে দেখা করবার সময় অফিস ঘরে সবাইকে বসতে দেওয়া হোত। হিজলীতে প্রচণ্ড গরমের দিনও মা বাবাকে বাইরে ভিজে তোয়ালে মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হত। গেটের ফাঁকগুলি এত ছোট ছোট ছিল যে মা অনেক চেষ্টা করেও হাত দিয়ে আমাদের গায়ে একবার স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিতে পারতেন না, কারাগৃহ পাষাণ পুরী কিনা। ডেপুটী জেলার বাবু বলতেন মার সংযম অসাধারণ। আমাদের সামনে কথা বলে যেতেন, হাসতেন—গাড়ীতে উঠেই নাকি অঝোরে কাঁদতেন।

মেদিনীপুরের আর একদিনের ঘটনাও আমার মনে বড় ছাপ রেখে গেছে। একদিন কোন দরকারে অফিসে ডাক পড়েছে। সঙ্গে যাচ্ছে জেলের বড় জমাদার। ঠিক সেই সময় আর একটি প্রাঙ্গন থেকে বার কি চোদ্দটী বন্দী (পুরুষ) বার হয়ে আসছিল কোথাও যাবার জন্য। জমাদার ছুটে গিয়ে বুট জুতা শুদ্ধ পা দিয়ে এমন ভাবে তাদের মারল

যে একজন আর একজনের ওপর পড়ে গেল। কেউ কেউ বা সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া লোহার গেটে ছিটকে পড়ে গেল।

ছোটবেলায় দেখতাম—রাস্তা দিয়ে ছাগল ভেড়া বেড়াতে নিয়ে যেত। মাঝে মাঝে তাদের লাঠি দিয়ে এমন তাড়া দেওয়া হত যাতে তারা ভয় পেয়ে এ ওর ওপর গিয়ে পড়ত। জেলের কয়েদীদের সেই দিন দেখে—সেই ছাগল ভেড়ার কথা মনে পড়ে গেল। জমাদারটী এতদিন জেলে কাজ করে করে হৃদয় বলে জিনিষটী হারিয়ে ফেলেছে। তার কাছে মানুষ ও পশুর কোন ভেদই নেই।

শুনেছিলাম যে জমাদার জেলে একটি প্রকাণ্ড ব্যবসা চালাত। বেশী বেশী সুদে সে অন্য সেপাই বা জমাদারদের টাকা ধার দিত। আসল টাকা শোধ দিতে এলে মহা আপত্তি। অনেক সময় অন্য সেপাই বা ছোট জমাদারেরা তাদের চাকুরী বজায় করার জন্য প্রয়োজন না হলেও ওর কাছ থেকে ধার নিত।

জেলের ভেতর বেত মারাটা নাকি বড় ভয়াবহ ব্যাপার। ছোট খাট একটি বিচারের প্রহসন নাকি হয়। তবে যারা বিচার করেন সত্যি মিথ্যে তাঁদের জানানর কোন উপায়ই নেই। জমাদার যা রিপোর্ট দিল—তাই বিশ্বাস করেই একজনকে বেত মারার আদেশ দেওয়া হত। জমাদারের বিরুদ্ধে কথা বলবার সাহস জেলের কারুরই থাকতে পারে না। শুনেছিলাম যাদের ওপর বেত মারার ভার থাকে তাদের নাকি ঠিক প্রকৃতিস্থ করে রাখা হয় না। নয় তো স্বাভাবিক অবস্থায়

যার ওপর কোন বিদ্বেষই নেই কোন মানুষের পক্ষে তার ওপর অমন নিষ্ঠুর অত্যাচার করা সম্ভব হতে পারে? একদিন জেল গেটে অফিস ঘরে ঢোকবার সময় দেখি দুই জন শুয়ে আছে উন্মত্ত অবস্থায়। তাদের চেহারা দেখে শিউরে উঠতে হয়। জমাদারিনীই আমায় ওদের দেখিয়ে দিয়েছিল এবং সেদিন যে কয়েক জন বন্দীকে বেত মারা হবে তাও বলল। ও না বললে আমার পক্ষে কোন জিনিষই জানা সম্ভব ছিল না। জেলের বিচার ও শাস্তি ঠিক জেলেরই উপযুক্ত। আসামীর পক্ষ থেকেও যে অনেক কিছু বলবার আছে সে কথা আর কে মেনে নেবে। বিচারে হুকুম হল বিশ ঘা বেত। এক এক সময় শুনেছি—কয়েক ঘা বেত মারার সঙ্গে সঙ্গে আসামী অজ্ঞান হয়ে যেত। একটু সুস্থ হলেই বাকি ঘা চলত। কোন সময় বেতের গায়ে তার পিঠের চামড়াও উঠে আসত।

যাদের দিয়ে বেত মারার কাজ হয়—তাদের দিয়েই ফাঁসির কাজটাও বোধহয় করান হয়। ঠিক সেই সময় জেলের বড় অফিসারদের সঙ্গে সুপারিণ্টেডেণ্ট ও ম্যাজিষ্টেট সাহেবকেও উপস্থিত থাকতে হয় বলে শুনেছি।

বিপ্লবীরা "বন্দেমাতরম্" বলে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াতেন মুখে তাঁদের শান্ত ভাব—পরিতৃপ্তির হাসি।

"গলায় জড়ায়ে ফাঁসির রসিটী
অধরে মধুর হাসি—
বলে যাও ওগো তরুণ পথিক
কারে এত ভালবাসি"।

তাঁদের "বন্দেমাতরমের" প্রতিধ্বনি করে ওঠে জেলের সমস্ত বন্দীরা। তাদের এই প্রতিধ্বনি মৃত্যুপথের পথিকদের কানে পৌঁছত কি না জানি না। বহু দূরে সুপ্তিমগ্ন সহর বাসীও জেগে উঠে বুঝতে পারত—আজ একটি তরুণকে দেশকে ভালবাসার অপরাধে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। তাঁরাও সমস্বরে বলে উঠতেন—"বন্দেমাতরম্"। কিন্তু সাধারণ আসামীদের যখন ফাঁসির স্থানে আনা হয়—তখন একটা মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এমন শোনা গেছে যে যখন একজনকে ফাঁসির জায়গায় আনা হচ্ছে—সে মাটিতে শুয়ে পড়েছে আর সকলের কাছে তার প্রাণ ভিক্ষা করছে।

একটি ফাঁসির আসামী নাকি একটু খানি আফিং ভিক্ষা করেছিল সকলের কাছে। কেউ কেউ ভয়ে অজ্ঞানও হয়ে পড়েছে। মেদিনীপুরে কোন বিপ্লবীর ফাঁসি হবার আগে খুব বেশী জ্বর হতে আরম্ভ করে। অনেক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে একটু সুস্থ করেই তাঁকে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হয়। কর্ত্তৃপক্ষের ভয় হয়েছিল—বন্দী যদি এমনি অসুখে মারা যান—তবে বিচারের অত আয়োজন সবই ব্যর্থ হয়। অপরাধের শাস্তি আর দেওয়া হয় কি করে?

এই সব বিচার ও ফাঁসি—সবই যেন মনে হয় বর্ব্বর যুগের অবশিষ্ট। অনেক সময় বিনা অপরাধে ফাঁসি হয়েছে বা দীর্ঘ কারাবাস হয়েছে বলে পরে জানা গিয়েছে। বহরমপুর জেলে থাকা সময়ে একদিন শুনলাম পরের দিন ভোরে এক-জনের ফাঁসি হবে। সবাই সে সব কথা শুনে একটা মানসিক

অশান্তিতে দিন রাত কাটালাম। যে দিন ভোর রাত্রে ফাঁসি হয়—সেদিন আমাদের দরজা খুলতে দেরী হয়। যথা সময় কিন্তু সেদিন আমাদের দরজা খোলা হল। কি হল ঠিক বুঝতে না পেরে জেলার বাবুদের জিজ্ঞেস করে জানলাম—সুপারিণ্টেডেণ্ট সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম এসেছিল যে অমুক আসামী নির্দোষ—তাকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। ফাঁসির আসামী সেদিন মুক্তি পেয়ে বাড়ী চলে গেল।

খবরের কাগজে একবার পড়েছিলাম—যে একটি জেলে একজনের ফাঁসি হবার পর দেখা গেল যে অফিস ঘরে তার মুক্তির পরওয়ানা এসে পড়ে রয়েছে। সুপারিণ্টেডেণ্ট সময়াভাবে সেটি খুলে পড়তে পারেন নি।

বিচারালয়ে যাদের উপস্থিত করা হয় বা যাদের শাস্তি দিয়ে জেলে পাঠান হয়—তাদের মধ্যে অনেকেই যে নির্দোষ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। বাবার কাছে শুনেছিলাম কোন একটি বড় মামলায়—পুলিশ সত্যিকারের দোষীকে ধরতে না পেরে রাস্তা দিয়ে এক পাগল ঘুরত তাকে নিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

মেয়ে বন্দীদের জীবনের ইতিবৃত্ত খোঁজ করে মনে হত তারা কি সত্যিই দোষী? একটি ব্রাহ্মণ মহিলা এক বছরের কারাবাস মাথায় নিয়ে এলেন। তাঁর চেহারায় কথা বার্ত্তায় মনে হল এঁর অপরাধ কিছু গুরুতর হতে পারে না। আস্তে আস্তে পরিচয় নিয়ে জানলাম—তাঁর একমাত্র কন্যা স্বামীর উৎপীড়নে ভীত হয়ে মার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল। পরের

স্ত্রীকে লুকিয়ে রাখার অপরাধে তাঁর শাস্তি হল। আইনের চোখে দোষী হলেও—সত্যিই কি তিনি অপরাধী?

হিজলী জেলে একটি মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাদের কাজের জন্য। দেখতে সুন্দর—স্বাস্থ্যবতী মেয়েটী। পড়াশুনা করবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ। নিজের কথা বলতে গিয়ে একদিন যা বলল তা এই—সামান্য অপরাধে ওর ওপর রেগে গিয়ে স্বামী একদিন দা দিয়ে মারতে এসেছিল। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে স্বামীর গায়ে আঘাত লেগেছিল। চিৎকার শুনে লোকজন এসে পড়লে স্বামী বললেন যে স্ত্রীই নাকি ওকে মারবার চেষ্টা করেছিল। স্বামীর ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা ও অভিমানে—কোর্টে সে স্বীকার করে নিল যে স্বামীকে মারবার চেষ্টা সে করেছিল। বিচারে তার বিশ বছরের জেল হয়েছিল। সেই স্বামী যখন জেলে দেখা করতে এলেন ও দেখা করেনি। বলত—"যে স্বামী নির্দ্দোষী জেনেও আমার ওপর এত বড় শাস্তি নিয়ে এল—আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করল না তার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? আমি মনে করি আমার কেউ নেই—কোন দিন কেউ ছিল না। বন্ধন হীন জীবন আমার—এমনি ভাবেই কেটে যাবে—" "যে ঘট ভাঙ্গলও না, ভরলও না, তাকে নিয়ে কি করি,ভাসিয়ে দিয়েছি"।

লীলাদির কাছে একটি মেয়ের বিড়ম্বিত জীবনের কথা শুনেছিলাম। তিনি আগে যে জেলে কিছুদিন ছিলেন সেখানে একটি উন্মাদগ্রস্থা মেয়েকেও আনা হল। কিছুদিন পরে লীলাদি লক্ষ্য করলেন—যে মেয়েটী সব দিক দিয়ে একেবারে

সুস্থ। ক্রমে পরিচয় নিয়ে জানলেন যে ওর স্বামী আর একটি মেয়েকে বিবাহ করতে চান। একে উন্মাদ বলে প্রমাণ করলে ওর বিবাহে সুবিধা হয়। ডাক্তারদের টাকা দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেবেন যে সত্যিই উন্মাদগ্রস্থা—স্ত্রীকে কোন উন্মাদাগারে বরাবরের জন্য রাখবার ব্যবস্থা করবেন। মেয়েটীর চোখ দিয়ে সব সময়েই জল পড়ত। ওর অপমান ও দুঃখের যেন কোন তুলনাই নেই। উন্মাদ না হয়েও উন্মাদের মতন জীবন কাটিয়ে যেতে হবে। মৃত্যুও যে তার কাছে অনেক ভাল ছিল।

জেলেতে সব সময় মনে হত---এখানে বন্দীর জীবনে কোন পরিবর্ত্তন বা উন্নতি হওয়া কোন দিক দিয়েই সম্ভব নয়। শাসন করবার আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই কিন্তু শোধন করবার কোন নীতিই নেই। এখানকার দূষিত আবহাওয়ায় বন্দীর জীবনে যেটুকু সরলতা বা মনুষ্যত্ব ছিল সব টুকুই সে হারিয়ে ফেলে একেবারে সম্পূর্ণ রিক্ত হয়েই ফিরে চলে যায়। কোন রকম শিক্ষা দিয়ে, সৎ সঙ্গ দিয়ে ভাল করবার ব্যবস্থাই নেই। তার শিক্ষার গোড়া পত্তন হয় মিথ্যা-চরণ অভ্যাসের ভেতর দিয়ে—অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টার ভেতর দিয়ে।

ওদের মধ্যে বেশী ভাগেরই অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত নেই। ইংরাজ রাজত্বে—দেশ জোড়া নিরক্ষরতার কোন প্রতিকার হয়নি যখন, তখন বন্দীদের শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবা কিম্বা আশা করাও যেতে পারত না। অথচ বয়স্কদের শিক্ষা দেবার

এখানে খুব বড় সুযোগই পাওয়া যায়। এই সব মূক মুখে পাছে ভাষা এসে যায়—ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাই সব সময় শঙ্কিত থাকতেন। নয়তো রাজনৈতিক বন্দীদের দিয়ে ওদের শিক্ষিত করে তোলার কাজটী সহজেই সম্পন্ন করা যেতে পারত। জেলখানায়'ত কোন দিন শিক্ষিত বন্দীদের অভাব ছিল না। শোধন করার নীতি যদি এতটুকুও অবলম্বন করতেন—তবে ওদের দিয়ে ডাল ভাঙ্গা বা ঘানি টানার কাজগুলি না করিয়ে নিরক্ষর বন্দীদের শিক্ষার কাজটী করাতে চেষ্টা করতেন।

সাধারণ কয়েদীদেরও যদি লেখা পড়ার সঙ্গে নানারকম অর্থকরী শিক্ষাও দেওয়া হয়—ওদের জীবন যাত্রাটা একেবারে অন্য রকম হয়ে যাবে। ওদের প্রাণে উৎসাহ আসবে মানুষ হবার চেষ্টা হবে, জেলখানাটাকে শুধু নরক বা দুঃখের ঘর বলে মনে হবে না। ওদের কোন ভবিষ্যত ছিল না বলে ওরা অমন "ভয়ঙ্কর" হয়ে উঠত। বাইরে গিয়ে আবার পুরাণ অপরাধের পুনরাভিনয় করা ছাড়া যেন ওদের আর অন্য পথ ছিল না। নয় না খেয়ে প্রাণ ত্যাগ করতে হয়—নয় আবার চুরী করতে হয়। মৃত্যু যে বড় ভয়াবহ। ভবিষ্যত নেই বলে বর্ত্তমানকে নিয়ে অত ছেলেখেলা করে। ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানকে সুন্দর করে গড়ে তোলার কোন প্রয়াসই নেই। চরখা কাটা, তাঁতের কাজ, চামড়ার কাজ, সেলাইয়ের কাজ—যেমন পশমের জিনিষ তৈরী, লেশ তৈরী, কাটিং প্রভৃতি শেখালে মেয়েরা মুক্তি পেয়ে ঐরকম কিছুর ভেতর দিয়ে

স্বাধীন জীবিকা উপার্জন করতে পারে। পুরুষদের মিস্ত্রীর কাজ ফিটারের কাজ, ইলেকট্রিকের কাজ, বেত বা তাঁতের কাজ শিখিয়ে একটা ডিপ্লোমা দিয়ে দিলে ওরা কোথাও চাকুরী পেতে পারে।

জেলে তারা যা তৈরী করবে তার মজুরী যদি গেটে জমা হতে থাকে—আর তার মুক্তি পাবার সময় সেই জমান টাকা দিয়ে কোন একটি যন্ত্র যদি কিনে দিতে পারা যায়—তবে সে বাইরে গিয়েই উপার্জ্জন করতে পারে। অন্যায়কর কোন কাজে আর তাকে লাগতে হয়না। বন্দী-দের শিক্ষার ভার যাঁরা নেবেন তাঁরা হবেন সত্যিকারের শিক্ষিত—উদার মতাবলম্বী, আদর্শবাদী ও চরিত্রবান। তাঁরা বাইরে থেকে এসে শিখিয়ে যাবেন। জেলখানাটাকে একটা বড় শিক্ষায়তন করে ফেলা যেতে পারে। এখান থেকে সবাই মানুষ হয়ে ফিরবে—আবার জেলে যাবার মনোবৃত্তি তাদের সব মুছে ধুয়ে যাবে। তারা বাইরে এসে পাবে নাগরিক জীবনের পূর্ণ অধিকার। সামাজিক জীবনের সব কিছু সম্মান।

জেলখানায় শুধু বন্দীরাই যে "অমানুষ" হয়ে যায় তা নয়—ঐ কারখানাটীকে যারা চালিয়ে যেতেন তাঁরাও যে মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে কোথায় নেবে যেতেন তার অনেক ঘটনাই মনে পড়ে।

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার অপরাধে শ্রীপ্রদ্যোত কুমার ধরা পড়েছিলেন। বিচারের রায় দেবার সময় স্পেশাল

ট্রাইব্যুনেলের এক বিচারপতি বলেছিলেন যে ওর বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণ নেই যাতে ফাঁসী দেওয়া যেতে পারে। অন্য দুই বিচারপতির অভিমত ভিন্ন হওয়ায় ওর ফাঁসীর রায়ই বহাল রহিল। ছেলে মানুষ ফাঁসীর আসামী নির্দ্দিষ্ট সেল ঘরে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছে। জেল অফিসার একদিন এসে তার কোন অভিযোগ আছে কিনা জিজ্ঞেস করাতে সে শুধু বলেছিল—ভাতে বড় কাঁকর একটু ভাল চাল দেওয়া যেতে পারে কিনা। সেই অফিসারটী নাকি বলেছিলেন—"হাজার হাজার বন্দী ঐ চাল খাচ্ছে তুমি নবাবপুত্র নাকি যে খেতে পারনা। ঐ কথা শুনে প্রদ্যোতকুমার আর একটি কথাও বলেন নি। ওরই পাশের সেলে যে বন্দী ছিলেন তাঁরই কাছে এটা শুনেছিলাম।

মেদিনীপুর জেলের আর একদিনের ঘটনা মনে হয়। একদিন বিকেল বেলা বসে আছি—এমন সময় ( সাধারণ শ্রেণীর ) বন্দী মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে এসে জানাল যে তাদের ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য তারা প্রতিদিন এক পোয়া করে দুধ পেত। ডাক্তার বাবু সেদিন থেকে সে দুধ বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা যেন এর প্রতিবাদ করি। ডাক্তার বাবুর কাছে গিয়ে অনেক অনুরোধ করার পর এই উত্তর শুনলাম—"বাড়ীতে কি ওরা দুধ পেত যে এখানে পাবে? তাছাড়া অভ্যেসও খারাপ হয়ে যাবে"। মনে হল ডাক্তার বাবুও ত সন্তানের পিতা। তবে কিসে তাঁকে এত বেশী

নির্ম্মম করে তুলল ? সেকি জেলের এই বিযাক্ত আবহাওয়া ? মাহিনা তাঁর অল্পই ছিল। জেলের অনেক টাকা বাঁচিয়ে দেওয়াতে তাঁর উন্নতি অনিবার্য্য। জেল কর্ম্মচারীদের আরও উপযুক্ত মাহিনা সব দিক দিয়েই প্রয়োজন।

বীণা একবার বন্দী অবস্থায় বাবাকে চিঠি দিয়েছিল "আমাদের জেল ঠিক আগের মতনই আছে। এই পাষাণ পুরীতে আছে শুধু শুষ্কতা, কঠোরতা আর মানুষের প্রতি মানুষের অনুভূতিহীন নির্ম্মমতা। এই স্নেহ মমতাহীন অজর অপরিবর্ত্তনীয় অচলায়তন বস্তুটীকে যারা প্রথম সৃষ্টি করে ছিলেন—তাঁদের কৃতিত্বকে স্বীকার না করে পারি না"।

সত্যিই জেলখানাগুলিকে মনে হত অপরিবর্ত্তনীয় অচলায়তন।

একদিন খবর পেলাম—অন্য ওয়ার্ডে কল্পনা ও শান্তি অনশন করেছে। শান্তি ও সুনীতি একই অপরাধে ধরা পড়েছে। দুজনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করবার জন্য শান্তিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও সুনীতিকে তৃতীয় শ্রেণীতে রাখা হল। সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে থাকতে থাকতে সুনীতির মনে অবসাদ আসবে—ওর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে পারা যাবে- এই আশাও বোধহয় কর্ত্তৃপক্ষের মনে ছিল।

সুনীতিকে বীণা শান্তিদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য জেলে একা রাখা হল। ওর বাবাকে চাকুরী হারাতে হয়েছিল কন্যার অপরাধে। দুটি দাদাই রাজবন্দী হয়ে জেলে চলে গেলেন। ছোট ভাইটী অনাহার ও দারিদ্র্যে যক্ষ্মা হয়ে

মারা গেল। সুনীতি জেলে বসে এক এক করে সব খবরই পাচ্ছে। "কিন্তু উপায় নেই চলিতেই হইবে। অনশন, অর্দ্ধাশন আসন্ন বিপদ ও প্রিয় জনের ভীষণ মৃত্যুর মধ্য দিয়া এ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেই হইবে। এ বিবাহের যে এই মন্ত্র"—"নির্ব্বাসিতের আত্মকথা"।

সুনীতিকে বীণাদের কাছে রাখবার জন্য ওরা অনেক আবেদনই পাঠিয়েছিল। কোন প্রতিকার না হওয়াতে শেষে আবার ওরা অনশন আরম্ভ করল। আমরাও খবর পেয়ে—শান্তিদের সঙ্গে অনশন আরম্ভ করলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে বোঝালেন—দুর্ব্বল শরীরে অনশন করলে বাঁচান সম্ভব হবে না ইত্যাদি। পরে ভয় দেখালেন যে তারপর দিন থেকেই জোর করে খাওয়াবেন। দুদিন পরেই অফিস থেকে খবর এল—জেল গেটে যেতে হবে সব জিনিষ পত্র নিয়ে। ভাবলাম লীলাদির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য জেলে নিচ্ছে। অসুস্থ ও দুর্ব্বল শরীরে জোর করে খাওয়ালে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে—তাই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁর জেলে রাখতে রাজ নন বলে গভর্ণমেণ্টকে জানিয়েছিলেন, একথাও শুনতে পেয়েছিলাম। লীলাদিকে একা রেখে চলে যেতে খুবই কষ্ট হল।

গেটে এসে দেখি—দাদাবৌদি হাসি মুখে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। গাড়ীতে উঠে তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারলাম—গভর্ণমেণ্ট বাবাকে জানিয়েছিল মেয়েকে বাংলার বাইরে নিয়ে যেতে হবে। লাহোরে যেতে পারলাম সেজদিদির কাছে। তাঁর স্নেহ যত্নে কত শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠতে

পারতাম। কিন্তু পাঞ্জাব সরকার দায়ীত্ব নিতে অস্বীকৃত হয়েছেন। বোম্বেতে যাবার অনুমতিও পাওয়া যায়নি। তারপর আবার বাবাকে জানান হল যে মেয়েকে নিয়ে গ্রামে থাকতে হবে। গ্রামে বাড়ী পাওয়া কঠিন ব্যাপার। অনেক খোঁজার পর গিধনী বলে একটি গ্রামে বাড়ী পাওয়া গেছে। মা বাবা সেখানে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

অনেক সুখ ও দুঃখে ভরা ঘটনার ভেতর দিয়ে কয়েক বৎসর জেল জীবন কাটিয়ে ফিরলাম।

অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে দেখতে গেলে মনে হয় কারা জীবন একেবারেই ব্যর্থ হয়নি। সমস্ত জীবনের লাভ ক্ষতি ও সার্থকতার দিক দিয়ে বিচার করলে—কারাগৃহের এই কয়েক বছরের দান বড় কম নয়।

"কারাজীবন শুধু একটা দীর্ঘ নৈরাশ্য নয়—জীবনের একটা বেদনাময় কিন্তু উজ্জ্বল অধ্যায়" মানুষকে চেনবার ও নিজেকে চেনবার—এটা একটা মস্ত বড় সুযোগ। এক জায়গায় পড়েছিলাম "অবরোধের বেদনা আছে কিন্তু সেই বেদনাকে বুকে আঁকড়ে ধরে থেকে কেবল অতীতকে idealise করলেও লাভ হবে না। বরং জীবন পথে এগিয়ে যাবার জন্য জীবনকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য একটি সুযোগ পেয়েছি বলে কিছু আনন্দ অনুভব করলেই বা ক্ষতি কি?

সত্যিই আমরা বাইরের জীবনের চিরন্তন কল-কোলাহল ও দৈনন্দিন সংগ্রাম থেকে দূরে গিয়ে আত্ম গঠন ও আত্ম সাধনার খুব বড় সুযোগ পেয়েছিলাম।

সেখানকার প্রত্যেক দিনের ছোট বড় অপমান নির্য্যাতনে মাঝে মাঝে খুবই শ্রান্ত হয়ে পড়তাম। চোখের সামনে যখন দেখছি সদ্য প্রস্ফুটিত তরুণ জীবন কারাগৃহের রুদ্ধ ঘরে আলো বাতাসের একান্ত অভাবে শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে—তখন মন যে ব্যথায় ভরে ওঠেন—তা'ত অস্বীকার করতে পারি না। তখন মনকে বোঝাতাম অন্য দেশের ইতিহাস'ত এমান শত সহস্র জীবনের আত্ম বলিদানের সাক্ষ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে আমাদের এত দুঃখ করবার কি আছে?

তা ছাড়া কবি লিখে গেছেন—

"ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে
আলোকে"।

শত দুঃখ ব্যথার ভেতরও মনে আমাদের ছিল অনেক খানি পরিতৃপ্তি—

ভাবতাম—"মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে যোগ্য হতেছি কাজে"।

আর কারুর জীবনে যদি কিছু ক্ষতি হয়ে থাকে সেত একদিন অমূল্য পুরস্কারে পূরণ হয়ে যাবেই। সকলের এই দুঃখ বরণ দেশকে স্বাধীনতার পথে একটু খানিও যদি এগিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে—মানুষের অপরিসীম দুঃখ ভার এক বিন্দুও যদি লাঘব হয়ে গিয়ে থাকে—তবেত এ দুঃখ বরণ পরিপূর্ণ সার্থকতায় কৃতার্থ।

বাবা একটি চিঠিতে লিখেছিলেন "পৃথিবী, সে যত নির্ম্মমই হোক তার নির্ম্মমতার কাছে কখনও মাথা নত করে পরাজয় স্বীকার কর না"। তাই অনেক সময় মনে হত—সমস্ত জীবনের সংগ্রামে কি হবে জানিনা—অন্ততঃ যেন মুক্তি পাবার সময় কারাগৃহ বলতে পারে—

"বন্দী তুমি অজেয়—আমার সমস্ত
পাষাণী রূপ দিয়েও তোমাকে
পরাজিত করতে পারিনি
তুমি সত্যিই অপরাজিত"।

## অন্তরীণের কয়েক মাস—

গিধনীতে পৌঁছেই প্রথমে যেতে হল থানায় হাজিরা দিতে। থানা প্রায় পাঁচ মাইলের পথ—সমস্তটাই গরুর গাড়ীতে যেতে হবে। ষ্টেশনে নেবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবারও অনুমতি পাওয়া গেলনা। সঙ্গে যে পুলিশ কর্ম্মচারী এসেছেন তিনি শীঘ্রই দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যেতে চান। সমস্ত দিন শুধু হর্লিক্স খেয়ে আছি। শরীর মন অবসন্ন। শান্তিদের ঐ অবস্থায় রেখে চলে এসেছি।

থানা থেকে সন্ধ্যা বেলায় ফিরে এসে গেলাম গ্রামের প্রান্তে একটি ছোট কুটীরে। নিজের বাড়ীতে থাকা সম্বন্ধেও অনেক আইন কানুনের নির্দ্দেশ পেলাম। থানার ইন্সপেক্টর বাবু এসে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন। বাড়ীর ডান দিক

দিয়ে যাওয়া বারণ, বাঁ দিক দিয়ে গিয়ে একটি ছোট নদী পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়ানর পথ নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। যেখানে সেখানে যেতে পারব না—কারুর বাড়ীতে ঢুকতে পারব না। পথে ঘাটে কাউকে দেখলে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে হবে। তবুত চারিদিকে উঁচু পাঁচিল নেই। সমস্তক্ষণ পাহারা দেবার জন্য কেউ আগলে বসে নেই। শুধু সন্ধ্যা ছয়টায় বাড়ী ফিরতেই হবে। চারিদিকে শালবন। মধ্যখান দিয়ে সরু পথ চলে গেছে। শীঘ্রই প্রকৃতির স্নিগ্ধতা—বাবা মার কোল ও বৌদির যত্নে অসুস্থা মেয়ে সুস্থ হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে প্রাচীরের ভেতর যারা রইল তাদের কথা ভেবেই মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠত। গ্রামের যত ছোট ছেলে মেয়ে এসে হাজির হত বাড়ীতে। তাদের আসায় কোন বাধা নেই। তাদের নিয়ে বাড়ীতে গল্প করি—পড়াই সেলাই শেখাই—বিকেল হলে মাঠের পথে নদীর ধারে চলে যাই। ঠিক সামনের বাড়ীর মা তাঁর ছোট আটমাসের মেয়েকে আমার কাছেই বেশী সময় পাঠিয়ে দিতেন। তাকে আদর করে অনেক সময় কেটে যেত। মায়েরা আমার কাছে আসতে পেতেন না। কিন্তু ছেলে মেয়েদের পাঠাতে এতটুকু ভয় পেতেন না। তাদের দিয়েই যেন আমায় আদর করতে চাইতেন। ওদের সকলকে নিয়ে মাকে মধ্যিখানে বসিয়ে গরুর গাড়ী করে শালবনের ভেতর দিয়ে বেড়াতে যেতাম। সে একটা আমাদের মহা উৎসবের দিন ছিল। বাড়ীতে বাবাকে কেউ খোঁজ করতে এলে—ঘরের ভেতর থেকে উত্তর দিতে

হত।—বাবা হেসে বলতেন পুলিশ তোমাকে বাংলার কূলবধূ করে রেখেছে।

বিজয়া দশমীর দিন—সন্ধ্যাবেলা থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বাড়ী থেকে মিষ্টি খাবার ও পায়েস রেখে গেল বারান্দায়। যে আনছে সে রেখে চলে গেলে আমি গিয়ে ঘরে নিয়ে আসি। গ্রাম শুদ্ধ সবাই যেন বন্দিনী মেয়েকে তাদের আদর ভালবাসায় ভরিয়ে রাখতে চায়। সন্ধ্যেবেলা চারিদিক কি নিস্তব্ধ। দূরে এক একটা বাড়ীতে আলো জ্বলছে। রাত্রিও যেন এক অপরূপ রূপে দেখা দিত।

গ্রামে এই প্রথম এতগুলো দিন ও রাত্রি অতিবাহিত করেছি। বাইরে থাকতে অমিয়ার গ্রামের বাড়ীতে একদিন কি দুদিন ছিলাম মাত্র। তাও সাপ আছে শুনে সব সময় সশঙ্কিত থেকে কলকাতার বাড়ীতে ফিরে এসে যেন বেঁচে ছিলাম। এখন মনে হয় গ্রাম কি সুন্দর। গিধনীতে যাবার কদিন পরেই একদিন তিন বছরের একটি ছেলে কোলে এসে বসেছিল। গায়ে জামা নেই, মাথার চুলে তেল নেই। শুনলাম—মা ওকে ফেলে কোথায় চলে গেছে—বাবাও মারা গেছে একটু আদর পেয়ে—আমার বাড়ী ও আর ছেড়ে যেতে চাইত না। আগে এর বাড়ী—ওর বাড়ী চারটী খেতে দিত—তাইতে ও বেঁচে ছিল। পিতৃমাতৃহীন বলে সবাই বোধ হয় দয়া করত। এখন আর আমার কাছ ছেড়ে কোথাও যাবে না। রাত্রে শুধু ঘুমুতে যেত তার ছোট দাদার সঙ্গে একজনদের বাড়ীতে। একদিন বিকেলে কোথা থেকে যেন এসেছে। সর্ব্বাঙ্গ ছড়ে

গেছে রক্ত পড়ছে। বুঝলাম ওর দাদার কথা থেকে—খুব একজন বড় লোকের মৃতদেহ খই ও পয়সা ছড়াতে ছড়াতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনেকে কুড়োচ্ছে দেখে ও গেছে ঐ ভীড়ের মধ্যে। সকলের ধস্তাধস্তিতে পড়ে গিয়ে অত কেটে গেছে। কাটার জায়গাগুলিতে আইডিন লাগিয়ে দিলাম।

আর একদিন সকালবেলা ও আর এলনা। সারাদিনই এলনা দেখে খোঁজ করে জানলাম তার খুব অসুখ—মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। ওর জন্য আর কে ডাক্তার ডাকবে? ভাই খোকাকে দিয়ে একটি ডাক্তারকে ডাকিয়ে আনা হল। তিনি হৃদয়বান ডাক্তার। এসে ওকে বাঁচানর জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করলেন। চুপি চুপি অন্ধকারে চলে গেলাম আইন ভঙ্গ করে। দূর থেকে শেষ একবার তাকে দেখলাম। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ভোরে শুনলাম রাত্রে মারা যাবার পরই ওকে নিয়ে গিয়ে দূরে এক মাঠে গাছের নীচে পুঁতে রেখে আসা হয়েছে। এমনি করে ছোট জীবনটীর করুণ পরিসমাপ্তি হল। শুধু দুদিনের জন্য এসে আমায় কাঁদিয়ে চলে গেল।

আমাদের বাড়ীর কাছেই একটি বাড়ীতে একটি বিবাহিতা মেয়ে থাকত বাবার আশ্রয়ে। বিয়ে হয়েছিল তার এক-জনের সঙ্গে যার আগের বিয়ে করা স্ত্রী আছে আরও পাঁচজন। একটি দিনের জন্যও ওকে আর শ্বশুর বাড়ী যেতে হয়নি। লোকটী মাসে মাসে আসে—স্ত্রীকে মারধোর করে সব গহনা নিয়ে যায়। এখন দু'হাতে দুটি কাঁচের

চুড়ি পড়ে আছে। আমি ওখানে থাকতে থাকতেই এক দিন ঐ লোকটী আসাতে আমার দেখবার সুযোগ হয়েছিল।

চরিত্র না থাকলে—মানুষের চেহারা যে কি ভীষণ হয়ে উঠতে পারে তা বুঝেছিলাম ওকে দেখে। গিধনী ছেড়ে চলে যাবার দিন মেয়েটীর বাড়ীও গিয়েছিলাম দেখা করতে। কলতলায় বসে বাসন মাজছে। বাড়ীর অন্যসব মেয়েরা দেখা করে কথা বললেন। ও শুধু দূরে থেকে নীরবে কাজ করে গেল। ওর বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে আর সামনে এসে দাঁড়াল না।

আর একদিনের ঘটনাতেও মনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। বাড়ীর কাছেই এক ভদ্রলোক থাকতেন তাঁর স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে নিয়ে। মেয়েরা বড় ভালবাসে—বেশীরভাগ সময় আমার কাছে থাকে। একদিন ওদের বাড়ী থেকে কান্নার শব্দ পেয়েছিলাম। পরে খবর পেলাম ছোট বোন না ভাই কে একজন খেলা করতে করতে ছুটে গিয়ে দুধের কড়ার ওপর পড়েছিল। দুধ বেশী ছিলনা বলে আঘাত বেশী হয়নি। মেয়েদের বাবা এসে একটি লাঠি দিয়ে মাকে মারতে লাগলেন। মা নীরবে সহ্য করেছেন। মেয়েরা সবাই কেঁদে উঠেছিল। বাড়ীর চাকর এসে বাবুর হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেয়।

মহিলাকে দূর থেকে সব সময় কর্ম্মরতা দেখতাম। তাঁর এই অপমান ও দুর্দ্দশার কথা অনেকদিন মনে হত।

সন্তানের মা, বাড়ীর গৃহিনী—এই কি তাঁর পদমর্য্যাদা? এই মর্য্যাদাকে পদদলিত করে চলে যাবার কোন পথই নেই! তিনি যে ভদ্র ঘরের স্ত্রী। পরের দিন দেখি নিয়মিত ভাবে প্রতিদিনকার ঘরকন্নার কাজ করে যাচ্ছেন।

আমার বাড়ীর খুব কাছেই আর একটি বন্ধ বাড়ীর সামনের দাওয়ায় বসে থাকত একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে। বয়স হবে কুড়ি কি বাইশ। মাথার চুলে জটা পড়ে গেছে হাতের নখগুলি বড় বড়। শুনলাম, ক'মাস হল কোথা থেকে এসে ঐ খানটিতে আছে। কারুর সঙ্গে কথা বলেনা। কোন কথা প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। সবাই বলে ও নাকি বোবা ও কালা।

একদিন গিয়ে ওকে কূয়ার জল তুলে স্নান করালাম। বড় কাঁচি নিয়ে গিয়ে নখগুলি কেটে দিলাম। যা বলছি তাইত করছে, তবে কালা নয় নিশ্চয়। রোজ থালা নিয়ে আসে ভাতের সময়। ভাত দিলে চলে যায়। একদিন একটু বিরক্ত হয়েই যেন বললাম "আমার বাড়ীতেই হুবেলা আস অন্যদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে যেতে পার'ত"।

তারপর দিন দেখি থালায় কিছুটা চাল এনেছে অন্যদের বাড়ী থেকে ভিক্ষা করে। চুপ করে থালাটী রেখে দাঁড়িয়ে রইল। ভারী লজ্জা পেয়ে বললাম চাল নিয়ে এসেছ কেন, আমি কি ও নিতে পারি? ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তুমি এমনি এসে হুবেলা খেয়ে যেও। বড় করুণ ভাবে চেয়ে চলে গেল। তারপর দিন দেখি আর আসে না।

ডেকে এনে বসিয়ে খাওয়ালাম। থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর বাবু প্রায় আমাদের খোঁজ খবর নিতে আসতেন। খুবই ভদ্র ব্যবহার।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম সেই বোবা মেয়েটীর কথা। যদি স্মৃতি ভ্রংশ হওয়াতে এখানে চলে এসে থাকে বাড়ীর প্রিয়জনরা হয়তো ওর খোঁজ করছে। এই রকম একটা আশা করেই ওকে বলেছিলাম।

কদিন পর দেখি দুজন পুলিশ এসে ওকে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। ও কিছুতেই যাচ্ছেনা। পুলিশের কাছে শুনলাম ইন্সপেক্টরবাবু ওর বাড়ীর খোঁজ করেছেন। স্বামী ও শ্বাশুড়ী বড় মারত বলে ও নাকি পালিয়ে এসেছে। মারধর করলই বা তাই বলে বাড়ীর বৌ চলে আসবে নাকি? পুলিশরা সেদিন ফিরে গেল আমার কথাতে।

পরের দিন রান্নাঘরে বসে যেন কি করছি। মা পাশে বসে আছেন। যে রান্না করত সে এসে বলল "দিদিমনি তুমি যার জন্য এত করলে—দুবেলা খাওয়ালে সে কি কাণ্ডটাই না করল। সকালে উঠে দেখি রেলের লাইনে পড়ে আছে। বোম্বে মেল গেছে ওর শরীরের ওপর দিয়ে। পরণে কিন্তু তোমার দেওয়া সেই শাড়ীটি"। অস্থির হয়ে বারান্দায় এসে দেখি একদিকে ওকে যে থালা ও গেলাসটী দিয়াছিলাম আর সামান্য যা টিনের কৌটা তেলের শিশি দিয়াছিলাম—সবই গুছিয়ে রেখে গেছে। সেদিনের চালের চেয়ে আরও কিছু বেশী থালার ওপর রয়েছে। আমার

ঋণ ও শোধ করতে চেয়েছিল। সেদিন বড্ড কেঁদেছিলাম ওর জন্য। আজও মনে হলে চোখের জল যেন বাঁধ মানেনা বাবাকে পরে ঘটনাটি বলেছিলাম। তিনি বললেন—"পৃথিবীর মানুষ বড় নিষ্ঠুর কিনা—তাই তাদের কাছে ওর দুঃখ কোনদিন ও বলেনি। পৃথিবীর ওপারে যে দয়াময় আছেন তাঁকেই সব দুঃখ অভিমান জানাতে চলে গেছে। সত্যিই ও বোবা ছিল না। তবু কতদিন কত প্রশ্ন করেও একটি কথা ওর মুখ দিয়ে বার করতে পারিনি। একটু যেন অভিমানও হয়েছিল ওর ওপর। তার অসীম দুঃখের একটু খানি অংশ দিলে কি হত?

দেখতে দেখতে প্রায় আটমাস কেটে গেল। জয়পুর থেকে মেজদি তাঁর স্বামী পুত্রকন্যা নিয়ে এসে দুদিনের জন্য কত যে আনন্দ দিয়ে গেলেন। সব অন্তরীণের মেয়েকেই বাড়ী যেতে দিয়েছে। লীলাদিকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছে। বাবাকে অসুস্থ শরীরে অতদিন গ্রামে রাখতে ভয় হত। অথচ আমায় রেখে কলকাতায় ফিরে যেতে তিনি রাজী হচ্ছেন না। এমনি দুশ্চিন্তায় যখন দিন কাটাচ্ছি—একদিন কাগজে দেখলাম গান্ধিজীর সঙ্গে বাংলার গভর্ণমেণ্টের কথাবার্ত্তা চলছে। প্রায় এগার শত রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে বলে স্থির হল। আমাকেও এবার ছুটির দিন জানিয়ে দেওয়া হল। সামান্য কিছু নিষেধের গণ্ডি রেখে ফিরে যেতে দেবে বালিগঞ্জের বাড়ীতে। বৌদি আবার

এলেন—সব গুছিয়ে নিয়ে যাবেন বলে। যাবার আগের দিন সব ছোট ছেলেমেয়েদের খাওয়ালেন।

যেদিন চলে যাব সেদিন আর আমার পায়ে বাধা নিষেধের কোন নিগড় ছিল না। বাড়ী বাড়ী গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করে আশীর্ব্বাদ নিয়ে এলাম। তাঁদের স্নেহ ভালবাসা যে এই আটমাসের বন্দী জীবনকে কতখানি ভরে রেখেছিল ভবিষ্যৎ জীবনেও কত বড় পাথেয় হয়ে থাকবে সেই কথাটাও তাঁদের জানিয়ে দিয়ে এলাম।

বিদায় নিলাম মেদিনীপুর থেকে—যার কোলে জীবনের সব চেয়ে মূল্যবান বৎসরগুলি অতিবাহিত করে এসেছি।

বীরের রক্তে, ত্যাগীর ত্যাগের গরিমায় উজ্জ্বল ও মহীয়ান মেদিনীপুরকে প্রণাম করলাম ট্রেনে উঠে।

## বোম্বাইয়ের জেলে অল্প কয়েকদিন

জেলে থাকতে ভাবতাম বাংলা দেশের জেলেই বুঝি সব চেয়ে কষ্ট। অন্য প্রদেশের জেলের সঙ্গে যদি তুলনা করে দেখতে পারতাম।

অনেক বছর পরে একবার দেখবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। ১৯৪৩ সনে বম্বে প্রবাসে আইন অমান্য করে ধরা পড়ে প্রথমে গেলাম মাটুঙ্গার কিংস সার্কেলের থানায়।

সেখানে পেছন দিকে কটা সারি সারি ঘর। ঘরের সামনে খুব সরু বারান্দা আর তার সামনেই প্রকাণ্ড উঁচু পাঁচিল। প্রেসিডেন্সি জেলের নীচের সেল ঘরের মতনই কোন জানলা

নেই। সামনে শুধু গরাদে দেওয়া দরজা। সেখানে তবু একটু উঠান ছিল। এখানে তাকালেই একটা উঁচু পাঁচিল।

ঘরের ভেতর এতটুকু আলো ঢুকতে পারেনা। তাই কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিছুক্ষণ পরে একটু শব্দ শুনে দেখি ভেতরে কোণের দিকে একটি মেয়ে বসে আছে আর দেওয়ালের ছারপোকা মারছে। চুরি করবার সন্দেহে ধরা পড়েছে। ঘরের দেওয়াল লালবাজার থানার মতন কালো না হয়ে এখানে লাল। সমস্ত দেওয়াল থেকে চূন বালি খসে খসে পড়ছে। ফাটলে ফাটলে শুধু লাইন করে ছারপোকা বসে আছে। দিনের বেলা ওদের না মেরে রাখলে রাত্রে শুলেই নাকি দলবেঁধে আক্রমণ করে।

কিছুক্ষণ পরে মনে হল দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। তীব্র দুর্গন্ধে অস্থির হয়ে উঠলাম—গরাদের সামনে মুখটা রেখে বাইরে থেকে নিঃশ্বাস নিতে চেষ্টা করলাম। তিন চার দিন হল ধরা পড়েছে মেয়েটী। কিন্তু একটি বারের জন্যও ঘর থেকে বার হয়নি। বলে ডেকে ডেকে হয়রাণ হলেও কেউ খোলে না। একা পুলিশের সঙ্গে বাইরে যেতেও ওর ভয় করে। আমি নিরুপায় হয়ে চিৎকার সুরু করলাম। অনেকক্ষণ পরে একটী পুলিশ দেখা দিলেন। কাতরস্বরে বলিলাম শীঘ্র ঘরটী পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা কর—নয়তো নিঃশ্বাস যে বন্ধ হয়ে আসছে। সে ধীরে সুস্থে অনেক পরে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করল।

কিছুক্ষণ পরে শালপাতা করে কিছু চাপাটী ও একটু তরকারী দিল। হাত না ধুয়ে কি করে ওসব খাই—বসে বসে ভাবছি—দেখি পাশের সেলঘর থেকে অন্ততঃ বার চৌদ্দ জন রাজনৈতিক বন্দীকে বার করা হল। তাঁরাও ধরা পড়ে ঐখানে এসেছেন। তাঁদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে সেই শালপাতায় খাবার দেওয়া হল। প্রথমদল কলতলায় গিয়ে হাত ধুয়ে আবার ঢুকে যাবে সেই সেল ঘরটীতে। যে পুলিশটী ওদের বার করেছিল প্রত্যেককে একবার করে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢোকাতে লাগল। নিজেরাই তাঁরা ঢুকবেন অথচ পুলিশের অমন করে ধাক্কা দেবার কোন কারণই ছিলনা। কেউ কেউ বা পড়ে যাবার মতন হয়ে আবার সোজা হয়ে চলে যাচ্ছিলেন। আমার পক্ষে ঐ দৃশ্য দেখা আর সম্ভব হচ্ছিল না। ইচ্ছে করলে সবাই মিলে ওর ওপর প্রতিশোধ নিতে পারতেন অনায়াসেই। কিন্তু অহিংস আন্দোলনের সৈনিক হয়ে নীরবে সহ্য করা ছাড়া আর যে তাঁদের কোন উপায় ছিলনা। দুপুরবেলা ইউনাইটেড প্রেস থেকে খবর পেয়ে ছুটে এলেন অফিস থেকে! চোখে তাঁর জল। বার বার অভিযোগ—তাঁকে না জানিয়ে এলাম কেন? প্রিয়জনদের জানিয়ে কখন আসা যায় জেলে? বোঝাই কাকে?

থানা থেকে সন্ধ্যাবেলা আর্থার রোডের জেলে নিয়ে গেল। যাবার সময় ঐ টুকু ঘরে অতজন বন্দী কি ভাবে বসে আছেন দেখে আপনা থেকেই যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলাম।

জেলে গিয়ে দেখি অল্পবয়স্কা দুটি গুজরাটী মেয়ে বসে আছে। বাজেয়াপ্ত হওয়া একটি বই সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা ধরা পড়েছে। ওদের দেখে মনে পড়ে গেল যে বোম্বেতে কোন কোন থানায় নাকি কুষ্ঠরোগী মেয়েদের নিয়ে আসা হত—এই রকম ছোট মেয়েরা যাতে ভয় পেয়ে আর জেলে আসার চেষ্টা না করে।

ঐ মেয়ে দুটির সঙ্গে খুবই ভাব হয়ে গিয়েছিল। বাংলা ভাষা ও গান শেখবার ওদের খুবই ইচ্ছা। তাই সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঢুকেই ওদের বাংলা অক্ষর পরিচয় ও গান শেখানর কাজ আরম্ভ করে দিতাম।

কিছুদিন পরে এলেন শ্রীমতী এলিস এলাভারিস। নয় মাস আগে ধরা পড়ে, হাজত থেকে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। এতদিন নানা ভাবে নানা স্থানে ফেরারী থেকে এবার ধরা পড়লেন। শিক্ষিতা খৃষ্টান মহিলা—ধরা পড়বার আগে রিসার্চ্চের ছাত্রী ছিলেন। বিয়ের তিনমাস পরেই স্বামী স্ত্রী দুজনে ১৯৪২ সনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ধরা পড়ার পরই স্বামী টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। খুব বেশী হওয়াতে একমাস পরে তাঁকে ছেড়ে দিল। অসুস্থ স্বামীকে একদিনও দেখতে যেতে পারেন নি কারণ তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য কড়া পাহারা রাখা হয়েছিল তাঁর নিজেরি বাড়ীতে। একদিন গল্প করতে করতে প্রশ্ন করেছিলাম—আপনাকে দেশের কাজে নামবার উৎসাহ

কে দিয়েছিল? ছোটবেলা থেকে মেম সাহেবদের কনভেণ্টে পড়াশুনা করেছেন—সেখানকার আবহাওয়া'ত অন্যরকম।

উত্তরে বললেন—স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়বার সময় শুনেছিলাম বাঙ্গালী মেয়েদের বীরত্বের কাহিনী—বীণা দাসের বিবৃতি পড়বার সুযোগ হয়েছিল। তখন থেকেই মনে মনে স্থির করেছিলাম পড়াশুনা শেষ করলে দেশের এই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবো। ১৯৪২ সনে সে সুযোগ পাওয়াতে আমরা দুজনেই এতে অংশ নিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেছি।

জেলে সেই একই ব্যবস্থা—একই হৃদয় হীনতার পরিচয় পেলাম। খাবারও সেই রকম খারাপ। বাজরার মোটা মোটা রুটি আর তরকারী সেদ্ধ।

সেখানে খাটুনী ঘর নেই বলে মেয়েরা ডাল ভাঙ্গার কাজের বদলে ডাল বাছার কাজ করত।

মেট্রনটী একটু ভাল বলে ওদের সঙ্গে মেলা মেশার বেশী আপত্তি ছিল না। বিকেল বেলা কেউ কেউ পড়তে আসত।

প্রথম দিন গিয়েই মেয়ে কয়েদীদের ঘর থেকে একটা চিৎকারের শব্দ শুনেছিলাম। সারা রাত্রি যেন কে চিৎকার করছে। সকালে জানলাম—একটি মেয়ের মাথায় পাগলামীর ছিট আছে। সেই অমন করে চেঁচায়। দুষ্ট লোক তাকে প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ীর বাইরে এনে ফেলেছিল। তারপর ওর জীবনে সব দিক দিয়ে ক্ষতি এনে ফেলে রেখে চলে গেছে। সেই লোকটীর বিরুদ্ধে মামলা চলছে। বাড়ীতে

সৎমা আছেন—তিনি মেয়েটিকে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হচ্ছেন না।

ওর কাছে গিয়ে কথা বলে বললাম—রাত্রে আমার কাছে শোবে? খুব খুসী হয়ে তখুনি বিছানা আমার ঘরে রেখে গেল। মেট্রণকে বলাতে তখুনি তিনি অনুমতি দিলেন। তারপর থেকে একদিনও রাত্রে চিৎকার করেনি। সন্ধ্যার সময় আমায় গান শোনাত। খুব একটা কৌতুহল হল ওর "ক্রিমিনেল নেচার" কোন দিক দিয়ে বদলান যায় কিনা জেলে তার একটা পরীক্ষা হয়ে থাক।

যতক্ষণ নিজের কাছে রাখি—কি শান্ত ভাব। আমার সমস্ত কাজ করে দেবে—আর কেউ কিছু করলে মহা আপত্তি। বিছানায় বসে চুল বেঁধে দিত—বিছানা করে দিত কাপড় কেচে দিত। ওর তরকারী থেকে আমায় অংশ দিয়ে যেত। লক্ষ্য করতাম—ওর সর্ব্বাঙ্গে যেন কিসের ক্ষত। সে সব দিয়ে বেশী ভাগ সময় যেন রস পড়ত। কিছুই বুঝতে পারিনি। আমার চোখের আড়ালে গিয়েই ও যেন অন্য মানুষ হয়ে যেত। গাছে চড়ে বসে পাশের ওয়ার্ডের বন্দী এংলো ইণ্ডিয়ান সৈন্যদের সঙ্গে কতরকম ভাবে কথা বলবার চেষ্টা করত। আরও কতরকম দুষ্টুমী যে করত। মাঝে মাঝে এমন নিরাশ হয়ে যেতাম—ভাল বুঝি ওকে করা যাবে না।

কদিন পরে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। অন্য মেয়েরা এসে বলল "ওর যে বড় খারাপ অসুখ—তুমি ওকে কাপড়

ধুতে দিতে, বিছানায় বসতে দিতে"। মৈত্রেণের কাছে খবর নিয়ে জানলাম সত্যিই ওর শক্ত অসুখ ছিল। তিনি সবই জানতেন—আমায় একটু সাবধান করে দিতে পারতেন না কি? প্রথমে একটু অভিমান হল। তারপর তুমি বল—অভিমান কার ওপর? পরে শুনলাম আরও কয়েকটি মেয়ে রয়েছে—তাদের ও কঠিন রোগ। সবাইকে এক সঙ্গে রাখা হোত। কতবার মনে হত—সুস্থ মেয়েরা হয়তো ফিরে যাবে কঠিন রোগ নিয়ে। কেই বা তখন ওদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে? আর একটি মেয়ের চিত্র এখনও চোখে ভাসে। প্রথম দিন যখন এল সবাই বলে উঠল—"আবার এসেছে"। বয়স অল্প, প্রসাধনে কোন ত্রুটি নেই। সমাজ ও সংসার বলে কিছু নেই। জেলে আসে—বাইরে গিয়েই রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় নিজেকে বিক্রী করবার জন্য। ইংরাজ ও এমেরিকান সৈন্যরা ওর বন্ধু। বেআইনী কাজ বলে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে দেয়। এই সব শোনার পর ওর জন্য বেদনায় মনটা ভরে থাকত। ওর দিকে বেশীক্ষণ তাকাতে পারতাম না। গভর্ণমেণ্ট ত একটি ভাল 'আশ্রমে' বন্ধ করে রেখে ওর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। এমনি করে বার বার জেলে পাঠিয়ে ওকে কি শাস্তি দেওয়া যাচ্ছে? স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জনের একটা ব্যবস্থা করে দিলে জেলখানার কিছুটা খরচ বাঁচত—অজ্ঞাত কুলশীলা একটি বালিকার অমন "অপমৃত্যুও" ঘটত না।

এখানকার সব ব্যবস্থা প্রায়ই বাংলা দেশের জেলের মতনই। তাই বেশী আর কিছু লেখবার নেই।

# সমাজের কয়েকটী নারী চিত্র

আদরের বোনঝিরা—

তোমাদের মতন ভাল "শ্রোতা" আমার ভাগ্যে কোন দিন হয়নি। ছোটবেলায় সেই শেয়ালের গল্প, রাজকন্যার গল্প যেমন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে শুনতে, বড় হয়ে আজো তেমনি করেই দেশের বিপ্লবীদের জীবন কাহিনী আমাদের অতীতের ছোট বড় সব সত্যিকারের ঘটনা তোমরা একাগ্র চিত্তে শুনতে ভালবাস।

তোমাদের বাংলা দেশের কয়েকটী মেয়ের জীবন ইতিহাস শোনাতে ইচ্ছে হয়েছে। তোমরা নতুন যুগের মেয়ে নতুন সমাজ গড়ে তোলবার সঙ্কল্প তোমরা গ্রহণ করেছ। এই সব নারী-চিত্রের ভেতর নারী জীবনের যত সব গভীর সমস্যা দেখতে পাবে তোমরা তাদের সমাধান করতে চেষ্টা করবে এই আমার মনে লুকান একটি আশা রইল।

(ক) সে অনেক দিনের কথা। কলকাতা সহরের একটি গলির তেতালা বাড়ীতে থাকতাম। নীচের তলায় দুটি সংসার ঘর ভাগ করে নিয়ে থাকতেন। নীচের সব ঘরগুলিই বড় বেশী স্যাঁৎসেতে। সূর্য্যদেবের আলো কোন দিক দিয়েই যেন ঘরে ঢুকতে পেতনা। সারাদিনই আলো জ্বেলে রাখতে হোত। একদিকের দুটি ঘরে থাকতেন একটি বিধবা মহিলা তাঁর চার পাঁচটি পুত্র কন্যাকে নিয়ে। সব

ছোট ছেলেটি বছর দশেকের হবে। মুখে তার বুদ্ধির প্রখরতা ফুটে উঠত। বড় বড় কবিতা আর দাদার কাছে থেকে শেখা সুন্দর রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের মাঝে মাঝে শুনিয়ে যেত। আমরা প্রায়ই বলতাম—এ বড় হয়ে খুব প্রতিভা সম্পন্ন ছেলে হবে।

কিছুদিন পরে ওকে আর ওপরে আসতে না দেখে খোঁজ করে জানলাম ওর টাইফয়েড হয়েছে। দরিদ্র সংসারে যতখানি সম্ভব সেবা ও চিকিৎসা সবই হল। ১৪ দিন পরে দেখলাম ছোট একটি খাটে শুইয়ে ওকে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হল। বড় হয়ে প্রতিভাবান ছেলে হওয়া আর ওর হয়ে উঠলনা। তার পর ওর ভাই বোনরা সেই বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

প্রায় তিন মাস পরে তখনও সেই ঘরগুলি খালি রয়েছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা অন্ধকার হয়ে গেছে। শুনতে পেলাম নীচের সেই ঘর থেকে কার যেন গলার করুণ স্বর ভেসে আসছে।

"অল্প লইয়া থাকি তাই যাহা যায় তাহা যায়" কণা-টুকু যদি হারায় তাহলে প্রাণ করে হায় হায়" কেউত ঘরে থাকেনা তবে কে গান গায়? খবর নিয়ে জানলাম সেই দশ বছরের খোকার দাদা যিনি তাকে গান শেখাতেন কবিতা শেখাতেন—প্রায় সন্ধ্যাবেলা এসে ঐ অন্ধকার ঘরে গান গেয়ে চলে যান। ছোট ভাইয়ের স্মৃতি জড়ান ঐ ঘরখানি কিনা তাই তার মায়া এখনও ভুলতে পারেননি।

"ফুলের দিন সে চলে গেল
ফুল ফোটা সে দেখে গেলনা
একটুখানি চলে গেছে কতখানি শূন্য যে"

পাশের ব্লকের দুটি ঘরে থাকতেন স্বামী স্ত্রী, বৃদ্ধা মা ও তাঁদের দুটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। বৌটির সঙ্গে কদিনেই বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। আমারি বয়সী—স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী অবধি পড়েছিল। তারপর বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ী আসে। স্বামীর আয় অল্প। নিজেই রান্না করে গৃহের সমস্ত কাজই প্রায় শেষ করে বিকেলে ছেলে মেয়েকে সাজিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বেড়াতে আসত। সন্ধ্যা হলেই বলত ঘরে যাই সন্ধ্যাদীপ জ্বালাতে হবে। আমি একদিন বলেছিলাম—তোমার উদ্দেশ্যেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই—

"বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পকানন মাঝে
হে কল্যাণী নিত্য আছ আপন গৃহকাজে
প্রভাত আসে তোমার দ্বারে পূজার সাজি ভরি
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির বরণ ডালা ধরি"।

একটুখানি হেসে নীচে নেমে গেল। মনে মনে ভাবতাম স্বামীর বাড়ী ফেরার সময় হয় কিনা তাই আমাদের কাছে ছলনা করে চলে যায় তাঁকে অভ্যর্থনা করতে।

যতটুকু সময় ছাতে থাকতাম সমাজের বিষয়, দেশের বিষয় আলোচনা হত। সব সময়েই মুখে একটি প্রসন্ন হাসি দেখতে পেতাম। একদিনের জন্য ও "ঘরগুলি কি অন্ধকার—সারাদিন কি পরিশ্রম করতে হয় ইত্যাদি বলতে

শুনিনি। শুধু একদিন ওদের ঘরে বসে আছি। ঘরে একটি মাত্র আম ছিল। ঠাকুরমা সেটি নাতিকে দিলেন। ছোট দিদি মিনতি করে চাওয়াতে—মা বলল দিদিকে কিছু ভাগ দিতে। ঠাকুরমা বলে উঠলেন— ঐ একটি আম তার থেকে আর দিদিকে দিতে হবে না। দিদিটী ম্লান মুখে তাকিয়ে রইল—ভাইটি না দিয়েই সব খেয়ে ফেলল। শাশুড়ী উঠে যাবার পর ও শুধু এই কথাটুকু বলল "নিজের ছেলেকে ইচ্ছামত ভাল কিছু শেখাতে পারি না এই বড় দুঃখ আমার"। এ ছাড়া কোন দিন কোন অভিযোগই ওকে করতে শুনিনি। আমার দিদিরা ওকে দেখে বলতেন—মনে সুখ থাকলে—স্বামীর ভালবাসা থাকলে দারিদ্র্য যে কোন দুঃখই দিতে পারে না—তা ওকে দেখলে বুঝতে পারা যায়। কোন অভাবই ওর কাছে অভাব বলে মনে হয় না। কোনদিন ভাল কাপড় পরতে পায় না—ভাল কিছু খেতে পায় না—মুখের হাসিটী কিন্তু লেগেই আছে।

কিছুদিন পরীক্ষার পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকি। বিশেষ দেখা-শুনা আর হয় না। একদিন মার কাছে শুনলাম নীচের বৌটীর কিছুদিন থেকে ভেতরে ভেতরে জ্বর হচ্ছিল। হঠাৎ ধরা পড়েছে যে তার যক্ষ্মা হয়েছে। ভাবলাম যা আলো বাতাসহীন ঘর, ঐ অসুখ হওয়াইত স্বাভাবিক। তারপর একদিন বেশী অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছি। দেখলাম এতদিনে সত্যিই ওর শরীরটা শ্রান্ত হয়ে এলিয়ে পড়েছে। শরীরের এই দুর্ব্বল অবস্থায় একটি মেয়েও হয়েছিল। তাকে ওর

মা দেশে নিয়ে গেছেন। ওকে দেখে খালি মনে হল—পৃথিবীর মেয়াদ'ত ফুরিয়ে এল। প্রিয়তম স্বামীকে, ছেলে মেয়েকে ছেড়ে যেতে কত না কষ্ট হচ্ছে। যা দুরারোগ্য রোগ—এ'ত আর সারবার নয়। আমাকে দেখে সেদিন শুধু হাসল—কথা বলতে পারল না। এমন সময় স্বামী অফিস থেকে ফিরে তার ঘরে ঢুকলেন। স্বামীকে দেখে হয়তো ওর মুখে এক আরক্তিম আভা ফুটে উঠবে—এ ভেবে একবারটী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই চমকে উঠলাম। দেখি স্বামীর দিকে সে এক অদ্ভুত কঠিন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। তাতে বিন্দুমাত্র স্নেহ বা অভিমান নেই। আছে যেন এক অপমানের জ্বালা আর প্রতিহিংসার ভাব। কিছুক্ষণ পরে চোখ নাবিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। সে কি আজ বলতে চাইছে ?

"দাও খুলে দাও দ্বার—
ব্যর্থ বাইশ বছর আমার দাও করে দাও পার"

রাত্রে শুয়ে মনকে বোঝালাম সবই চোখের ভুল আমার।

তারপর দিন কলেজে কি কাজ থাকাতে বিকেলে হেঁটে ফিরছি। হঠাৎ রাস্তায় দেখি এক মাথা সিঁদুর ভরা কোন মৃতা ভাগ্যবতীকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছেন কয়েকজন ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকদের দেখেই বুঝলাম এ আমার নিতান্ত পরিচিত। আমার বাড়ীর নীচের তলারই সেই কল্যাণী গৃহবধূ। হঠাৎ মনে হল—গৃহ কোণে থেকে থেকে যে বাইরের কোন লোক

দেখলেই কত সঙ্কুচিত হয়ে উঠত—আজ সে এতগুলে অপরিচিতদের সামনে কত না বিব্রত হয়ে উঠছে।

মৃত্যুর সঙ্গে তার আগে ভাল করে পরিচয় ছিল না। তাই তাকে সত্য করে উপলব্ধি করতে গিয়ে মনের ভেতরটায় এক প্রকাণ্ড বড় আঘাত পেলাম। ৺শরৎচন্দ্রের গল্পের সেই কথাগুলি ঘুরে ফিরে মনে হতে লাগল "কাল যে ছিল আজ সে নাই—আজও যে ছিল তাহার ঐ নশ্বর দেহটা ধীরে ধীরে ভস্মসাৎ হইতেছে। আর তাহাকে চেনাই যায় না। অথচ ঐ দেহটাকে আশ্রয় করিয়া কত আশা কত আকাঙ্খা কত ভয় ভাবনাই না ছিল। এক নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হইল। তবে কি তার দাম"।

সন্ধ্যার সময় মার সঙ্গে নীচে গেলাম সেই বৃদ্ধা শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে যিনি মৃত্যুকে প্রতি মুহূর্ত্তে আহ্বান করেও চলে যেতে পারলেন না। রয়ে গেলেন এই সংসারে আরও কিছুদিন দুঃখ ভোগ করতে। যে ভোগ করতে পারত তার এই সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতে ভরা জীবনটা সেই চলে গেল বড় অসময়ে। এই সব ভাবছি—ক্রন্দনরতা শাশুড়ীর কয়েকটী কথায় চিন্তার স্রোত বাধা পেয়ে গেল। "পুত্রের মা হয়ে স্বীকার করছি সন্তানকে মানুষ করতে পারিনি। প্রতিদিন মাঝ রাত্রে ফিরে আসত—কোথা থেকে শুধু ভগবানই জানেন। পাছে আমি শুনতে পাই—বৌমা তাড়াতাড়ি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন। স্বামীর দৈন্য তার মায়ের কাছে লুকাবার কি না চেষ্টা। আমি কান পেতে সবই

শুনতাম। কোন দিন শুনতে পেতাম মারের শব্দ। অনেক দিন রাত্রে বৌমার ঘুমই হোত না। অসুস্থ স্বামীকে কিছুটা সুস্থ করে ঘুম পাড়িয়ে কাপড় চাদর নিয়ে চলে যেত স্নানের ঘরে। কাজ শেষ করে—ভোর বেলার স্নানের পর রান্না চড়িয়ে আমার দরজা খুলে দিত। মনে করত আমি বুঝি কিছুই জানতে পারতাম না। মা হয়ে লজ্জায় ছেলের সম্বন্ধে কোন কথাই বলতে পারতাম না। শুনতে শুনতে দিদিদের কথা মনে পড়ে গেল "স্বামীর ভালবাসায় যার জীবন ভরপুর —তাকে দারিদ্র্য কোন দুঃখই দিতে পারে না। তখন বুঝলাম তার সেই শেষ দিনকার দৃষ্টির অর্থ। সারা জীবন সে স্বামীর কাছ থেকে শুধু লাঞ্ছনাই পেয়ে গেছে—পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে ক্ষমাহীন দৃষ্টি দিয়ে তাকেই জানিয়ে গেল যে ক্ষমা সে করতে পারেনি। শুধু স্ত্রীর কর্ত্তব্য—জননীর কর্ত্তব্য—পুত্রবধূর কর্ত্তব্য করে গেছে আজীবন মুখে হাসি নিয়ে বুকে কান্না নিয়ে। একটি বইয়ে পড়েছিলাম পাথরও যে দুঃখে চৌচির হয়ে যায়—মানুষ তা সহ্য করতে পারে। বাইরে থেকে মানুষকে বিচার করতে গিয়ে নিজেরাই কত প্রতারিত হই। কাউকে চিনেছি বা সব কিছু তার বুঝতে পেরেছি—এ স্পর্ধা যেন আর না করি। তবু মনের অগোচরে কোথায় যেন একটু অভিযোগ মনে দেখা দিল কতদিন এক সঙ্গে বসে গল্প করেছি—একদিনও কি কিছু বলতে পারত না? তবে আর কিসের ভালবাসা? হয় তো ওর মনে হোতো—

"পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে
সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনি খুলে—
ভুলতে যদি পার তবে—সেই ভাল গো যেও ভুলে"

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে সে বাড়ী ছেড়ে আমরা চলে গেছি। একদিন ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে ঢুকে পড়লাম সেই বাড়ীতে। ছেলে মেয়েরা কেমন আছে, কত বড় হয়েছে দেখবার ইচ্ছে হল। মেয়েটী বড় হয়েছে—তারই মুখে শুনলাম তার আগের মা মারা যাবার কিছুদিন পরেই বাবা আর এক মা আনেন। বৃদ্ধা ঠাকুর মা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এক আত্মীয়া সেখানে বসে ছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম যে অফিসের বড় বাবুর বোনের কিছুতে বিয়ে হচ্ছিল না। তিনি খুব করে ধরলেন আর সন্তানদের মুখ চেয়ে ওদের বাবা প্রায় ছয় মাসের মধ্যেই বিয়ে করে-ছিলেন। খানিক পরে উনিশ কি কুড়ি বছরের মেয়ে হাসি মুখে এসে বসল। এর জীবনে আবার কোন্ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে ভেবে কয়েকটী কথা বলে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলাম। আর কোন দিন সে বাড়ীতে যাইনি।

(খ) ছোট বেলায় পাড়া ঘুরুণী বলে খুব নাম ছিল। অনেক বন্ধু জড় করে বিকেল বেলা তাদের নেত্রী হয়ে খেলাধূলা করতাম।

কারুর দিদি শ্বশুর বাড়ী যাবেন—ডাক পড়ল আমায় চুল বেঁধে সাজিয়ে দেবার জন্য। ওদের বাড়ীর লোকের সঙ্গে আমিও পা ছড়িয়ে বসে কান্না সুরু করতাম। কাউকে কনে দেখতে আসবে—আমার সেখানে উপস্থিত হতেই হবে। একে একে খেলার সঙ্গিনীদের সব বিয়ে হয়ে যেতে লাগল। একদিন শুনি পুঁটীর বিয়ে। গরীব তারা—বিনা আড়ম্বরেই বিয়ে হয়ে গেল। দেখতে সুন্দর হলে কি হবে বাপের অর্থের তহবিল যে একেবারে শূন্য। সামান্য অফিসের সামান্য কেরানী। বিয়ে হল খুব সুদূরের এক গ্রামে একটি দরিদ্র পরিবারে। পরদিন মা বাবাকে কাঁদিয়ে—আমাদের কাঁদিয়ে চলে গেল শ্বশুর বাড়ী। মা জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন "কাঁদিস নে মা আবার তোকে কদিন পরে নিয়ে আসব।

তারপর আমাদের সেখানকার বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছি। ছোট বেলার বন্ধুরা যেন সব একে একে ছায়া পটে মিলিয়ে গেছে। স্কুল জীবন শেষ করে কলেজে ঢুকেছি। একদিন হঠাৎ মনে সাধ জাগল—পুরান বন্ধুদের সকলের খবর নিয়ে আসি। পথে দুচার জনদের বাড়ী ঢুকে ঢুকে মায়েদের কাছে খবর নিতে নিতে চলছি। কারুর একটি মেয়ে হয়েছে—কারুর বা একটি ছেলে। কারুর কপাল পুড়েছে শ্বশুর বাড়ীতে ঝিয়ের মতন খাটছে। পুঁটির মাকে প্রণাম করে বসতেই তিনি আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বিয়ে দিয়ে মেয়েকে পাঠালাম দূর দেশে। অতদূর বলে শীঘ্র আনতে পারিনি মা। ক্রমাগত চিঠি দিত—বাবা

যেন গিয়ে তাকে নিয়ে আসেন। অফিসের চাকরী ছুটী কোথায়। আবার ছুটী পাওয়া যায়ত হাতে পয়সা নেই। একদিন চিঠি এল—স্বামী শাশুড়ী দিনরাত লাঞ্ছনা দেয়—মার ধোরও করে ক্রমাগত। অমুক তারিখ অবধি অপেক্ষা করবে—তারপর সে তার এই দুঃখের জীবন শেষ করবে। ওর বাবা তাড়াতাড়ি ছুটী নিয়ে টাকা জোগাড় করে যাত্রা করলেন। কত দূর গ্রাম—পৌঁছে দেখেন—গ্রামে নদীর ধারের শ্মশানে মেয়েকে পুড়িয়ে সবাই ফিরে আসছেন। শ্বশুর মশাই বড় দুঃখ করে বললেন যে বৌটী তাঁদের বড় লক্ষ্মী ছিল। হঠাৎ কলেরা হয়ে মারা গেছে। খবর দিতে পারেন নি ইত্যাদি বলে আবার দুঃখ প্রকাশ করলেন। মেয়ে যে তাঁর আত্মহত্যা করে মারা গেছে সে কথা বুঝেও গরীব বাবাকে ফিরে আসতেই হল। অন্য মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে, ছেলেদের খাওয়াতে হবে। চাকুরী যে তাঁর রাখতেই হবে।

(গ) জেলের ঘরে বন্ধ হয়ে গেছি অনেকক্ষণ। একটি সুন্দর দেখতে মেয়ে—বয়স বাইশ কি তেইশ হবে হঠাৎ পাশে এসে বসে পড়ল। স্বাস্থ্যবতী মেয়ে সব সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকত। সঙ্গে একটি ছেলে নিয়ে এসেছিল। প্রথমে অনেকক্ষণ বসে বসে কাঁদতে লাগল। কিছুক্ষণ কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে। যা তার কাছ থেকে শুনলাম তা এই—বাইরে থেকে দেখে কেউ হয়তো বুঝতে পারেনা—কিন্তু তার জীবন খাতাটা শুধু দুঃখের ইতিহাসেই

ভরা। বাপ বড় গরীব—কিন্তু লেখা পড়া শেখবার সুযোগ অল্প কিছু সে পেয়েছিল। একটি সুপুরুষ শিক্ষিত ধনী ছেলে তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। মনে মনে সে জেনে নিয়ে ছিল তিনিই ওর স্বামী। বরমাল্য তাঁকেই দেবে এ সম্বন্ধে সে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল। বিয়ের ঠিক হল—বিয়ের দিন এসেও গেল। কিন্তু বিবাহ বাসরে নিয়ে যাওয়া হলে শুভলগ্নে শুভদৃষ্টির সময়ে তাকিয়ে দেখে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে ভয়ে ব্যথায় সে কেঁদে উঠেছিল—কিন্তু সভার স্থান ছেড়ে চলে যেতে পারেনি—সাহস পায়নি। সেই ছেলের পিতা শেষ সময়ে অনেক অর্থ দাবী করেছিলেন—গরীব পিতা তাই বিনা মূল্যে এই পাত্রের কাছে কন্যা দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কন্যাকে একটি বার জানানর দরকার বলেও মনে করেন নি। সুধীরা বলে যেতে লাগল—

সেই ছেলেটী নাকি এখনও তাকে ভালবাসে। ও নিজে তার স্বামীকে একটি দিনের জন্যও ভাল বাসতে পারেনি। এতদিন পরে স্বামীর ওপর রাগ বিদ্বেষ মুছে গিয়ে একটা অনুকম্পার ভাব এসে গিয়েছে। তাঁর সেবার কাজে কোন ত্রুটিই সে করেনা। অহরহ ওর মনের ভেতর যে অন্তর্বিপ্লব চলেছে আমি তার কিছু সমাধান করতে পারি কি না এই ছিল ওর সেদিনকার প্রশ্ন। এ বিষয়ে বেশী কোন দিন ভাবতে পারিনি। শুধু সহানুভূতি প্রকাশ করা ছাড়া কোন সমাধানের পথই তাকে দিতে পারি নি। কিছু দিন পরে সে মুক্তি পেয়ে চলে গেল। যাবার আগে একদিন বলেছিল—

সকলের সঙ্গে হেসে খেলে দিনগুলি বেশ কেটে যাচ্ছে—আবার বাইরে যেতে হবে ভাবলে বুকটা কি রকম করে ওঠে। অথচ অন্যদের দেখেছি শেষের দিনগুলি যেন আর কাটতে চায় না।

আট মাস পরে যখন ছাড়া পেয়ে বাইরে এলাম, একদিন সুধীরার চিঠি পেলাম—কলকাতার অমুক গলিতে অমুক বাড়ীতে যেন যাই আর একটু ওর রান্না ডাল ভাত যেন খেয়ে আসি। গলির মোড়ে মুদির দোকান থেকে যেন বাড়ীর নির্দ্দেশ নিয়ে নিই। যথা সময়ে সেই মুদীর দোকানে এসে দাঁড়িয়ে অমুক নম্বরের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞেস করলাম। হাঁটুর ওপরে কাপড় পড়া—খালি গায়ে বৃদ্ধ— সেই দোকানের মালিক বললেন—ডাইনে দিকে গিয়ে বাঁয়ে ঢুকে অমুক রংয়ের বাড়ী।

অনেক দিন পরে দেখা হল—ওর ছোট সংসারটি দেখে মনে মনে বেশ খুসী হলাম। এমন সময় দেখি দোকানের সেই মালিকটি ঢুকলেন। সুধীরা বলে দিল—উনিই তার স্বামী। শুনেছিলাম তার স্বামী বয়সে বড়—কিন্তু ঠিক এমন যে হবেন তা কল্পনাও কোরতে পারিনি। মনে মনে ভাবলাম জীবন ওর সত্যিই বিড়ম্বিত। বাইরে থেকে তার কতটুকু বুঝতে পারি।

বেশী কিছু আর খেতে পারিনি। ভারাক্রান্ত মনে বাড়ী ফিরে এলাম— মনের ভেতর খালি প্রশ্ন উঠতে লাগল—কেন এমন হয়?

আবার অনেক বছর পরে ফিরলাম জেল থেকে। সুধীরার খোঁজ নিয়ে জানলাম—বাড়ীতে আর থাকে না—কোন একটি বোর্ডিংএ থেকে পড়াশুনা করছে। কে একটি ভদ্রলোক ওর খরচ বহন করছেন।

তারপর কয়েক মাস পরে নতুন গৃহে কিসের যেন উৎসব আয়োজনে ব্যস্ত। বাড়ীতে অনেক অতিথি সমাগম। এক-জন এসে খবর দিলে সিঁড়িতে একটি মহিলা ও ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ছুটে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে দেখি দাঁড়িয়ে রয়েছে—সুধীরা—সুসজ্জিতা—সুরূপা। পাশে দাঁড়িয়ে এক সুপুরুষ যুবক। দুজনেরি মুখে হাসি। আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুধীরা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমি কিন্তু ওকে জড়িয়ে ধরতে পারলাম না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে বলল "দিদি তবে ফিরে যাই?" "না ভাই যেওনা ভেতরে এস"—বলতে পারলাম না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেবে ওরা চলে গেল। আর তার সঙ্গে কোন দিন দেখা হয়েনি। পৃথিবীর বিরাট জনস্রোতে ওরা কোথায় মিলিয়ে গেছে। কোন দিন আর খোঁজ পাব কিনা জানি না। আজও কিন্তু ওর জীবন সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পাইনি।

(ঘ) কলেজে পড়ি। কলেজ সংলগ্ন মেয়ে হোষ্টেলে যেতে হয় প্রায়ই। ছাত্রীদের জড় করে সভা সমিতিতে নিয়ে যাওয়াটাই প্রধান কাজ। একদিন শুনলাম—একটি মেয়ে—নাম তার ধরে নিলাম সুনন্দা তাকে কলেজের একটি মেধাবী ছাত্র

নাকি খুব ভালবাসে। সুনন্দাও পড়াশুনায় খুব ভাল। বুদ্ধি-মতী আবার দেখতে সুন্দর। তাকে ভালবাসাটাত স্বাভাবিক।

তারপর প্রায়ই ওদের দুজনকে বেড়াতে যেতে দেখা যেত। পড়াশুনা শেষ করেই ছাত্রটী একটি কলেজে কাজ পেলেন। এবার আর ওদের মিলনের পথে কোন বাধাই রইল না। অসবর্ণ বিবাহ—কিন্তু ভালবাসার কাছে এই সামান্য বাধা কত তুচ্ছ হয়ে গেল। সবাই বলত ওদের প্রেম চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে—একে অন্যকে এত গভীর ভাবে বুঝতে ও ভালবাসতে খুব কমই দেখা যায় ইত্যাদি।

অনেক দিন পরে আবার যখন বাইরের জগতে এসে দাঁড়ালাম—একদিন ওদের নতুন গড়া সংসার দেখবার সুযোগ হল। কি সুখেরই না সংসার গড়েছেন ভগবান। সুনন্দাকে দেখে মনে হল সে যেন বলছে অতি গর্ব্বভরে "আমায় নইলে ত্রিভূবনেশ্বর তোমার প্রেম হোত যে মিছে"। ওদের প্রেমকে চিরস্থায়ী করে এসেছে একটি শিশু। তাকে বুকে নিয়ে পিতামাতার কি আদর, স্নেহ চুম্বন। এর চেয়ে সুন্দর স্বর্গের ছবি কোন কবি কি কল্পনা করতে পারতেন?

আবার অনেক বছর ওদের কোন খবর পাই না। জীবনের রথ চক্র আপনার গতিতে ছুটে চলেছে। দূর দেশে সুনন্দার স্বামী চাকুরী নেওয়াতে—ওদের সঙ্গে দেখা হওয়া বা খবর পাওয়ার সুযোগও পাইনি।

একদিন আমার এক দিদির বাড়ী বেড়াতে গেছি। সেখানে দেখি পাঁচ ছয় বছরের একটি ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরিচয়

নিয়ে জানলাম এ সেই সুনন্দার ছেলে। সুনন্দা এখন নিজে চাকরী করে ছেলেটাকে মানুষ করছে। চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম কেন ওর স্বামী কি নেই? শুনলাম এক হিসেবে ওর স্বামী নেই। বিলেতে গেলেন বৃত্তি নিয়ে—ফিরে এলেন এক ইংরজে মহিলা নিয়ে। তাকে নিয়েই আবার নতুন নীড় বেঁধেছেন। বুকের ভেতরটা কিরকম যে করে উঠল। ওদের সেই নিরঞ্জন প্রেম যা নাকি চিরন্তন হয়ে থাকবে তার এই পরিণতি?

"দেখিলাম থাকেনা কিছুই
স্বপন ভাঙ্গিয়া যায়
অশ্রুজল তাহাও শুকায়
বেদনারো মৃত্যু আছে
তপস্যার বহ্নি নিভে যায়
নিঠুর বাত্যায়।

(ঙ) বয়সে দুই তিন বছরের বড় বলে ডাকতাম প্রভা দি বলে। কর্পোরেশন স্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। কয়েক বছর আগে বিয়ে হলে শ্বশুর বাড়ী যান। ফুলশয্যার দিন দেখেন বাড়ীতে মহা গণ্ডগোল। স্বামীকে কিছুতেই ফুলশয্যার ঘরে আনা গেলনা। তিনি আর একটি মেয়েকে ভালবাসতেন। বিয়ে করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাল্যকালে সিঁদুর মুছে ঘরে আসা মেয়ে বলে সেখানে বিয়ে করতে না দিয়ে আত্মীয়েরা জোর করে এখানে বিয়ে

দিয়েছেন। সবই প্রভাদি জানতে পেরে কোন রকমে রাত্রিটী কাটিয়ে পরদিন বাপের বাড়ী ফিরে এলেন। মাথার সিঁদূর না মুছেই তাঁকে ফিরতে হল। তারপর থেকে আর একটি দিনও সেখানে যান নি। স্বামীই যাকে গ্রহণ করল না শ্বশুর বাড়ীতে তার দাম কতটুকু?

স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে ম্যাট্রিক পাশ করলেন—তারপর ট্রেনিং পাশ করে চাকুরীতে ভর্ত্তি হলেন। আমরাই তাঁর সুখ দুঃখর সঙ্গী—কর্ম্মপথের বন্ধু। দেশের কাজে নাবিয়ে নিয়ে এলাম। জীবনটাকে সব দিক দিয়ে সার্থক করে তোলা যায় এই দেশসেবার কাজের ভেতর দিয়ে।

একদিন দুপুরে এসেছেন। মুখে যেন কিসের এক উত্তেজনার ভাব। বললেন—এত বছর পরে, যাকে ভাল-বাসতেন, যাকে নিয়ে এক সঙ্গে থাকতেন—তার সঙ্গে কি মনোমালিন্য হওয়াতে ওর স্বামী এসেছিলেন ওকে নিয়ে যাবার জন্য।

লক্ষ্য করলাম প্রভাদির মনে যেন কোথায় একটু দুর্ব্বলতা এসে গেছে। বললাম কখনও যাবেন না ভাই। মেয়েদের জীবনের মূল্য কি এত অল্প? যখন খুসী তাকে প্রত্যাখ্যান করব—আবার গ্রহণ করতে আসব। তারও কি একটা স্বাধীন সত্বা নেই?

মেয়েদের সেই চিরন্তন আকাঙ্খা—ছোট সংসার, স্বামী ছেলে মেয়ে—সেইটাই যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাই-ছিল প্রভাদির মনের কোণে।

আর একদিন এসে বললেন আবার তাঁর স্বামী এসেছিলেন। এবারে তিনি বলে দিয়েছেন আর কোনদিন যেন স্কুলের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে চেষ্টা না করেন। তাহলে শুধু অপমানের বোঝা নিয়েই ফিরতে হবে। এইবার সত্যিকারের বিপ্লবীণীর মতন উত্তর দিয়েছেন শুনে খুসী হলাম। বীণার লেখা কবিতার কয়েকটা লাইন শোনালাম।

"বিড়ম্বিত জীবনের যত আবর্জনা
দগ্ধ হবে পলে পলে ব্যথার আগুনে
এ মোর সান্ত্বনা।
অগ্নি পরীক্ষার যত নিষ্করুণ সুকঠিন ভার
একাকী বহিব আমি এই অহঙ্কার"।

তারপর আমরা অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম। তাঁকে দেশসেবার মূল্যও দিতে হয়েছিল অনেকখানি। জেলে কিছুদিন রেখে পরে অন্তরীণ করে রাখল। কিছু দিন পরে দেখা দিল দরিদ্রের বন্ধু যক্ষা। আত্মীয় স্বজন ভয়ে খোঁজ নিলেন না। কোথাও থাকবার জায়গা না পেয়ে একটি ছোট হাসপাতালে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। কয়েক মাস পরে একটী বন্ধু খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন প্রভাদির মৃতদেহ খাটে পড়ে রয়েছে। মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছিল—তার ওপর তখনও মাছি ভন ভন করছে।

খবরটা শুনেই মনে পড়ে গেল—

"অগ্নি পরীক্ষার যত নিষ্করুণ সুকঠিন ভার
একাকী বহিব আমি—এই অহঙ্কার"।

(চ) এক মাসের জন্য কর্পোরেশানের একটি স্কুলে কাজ নিয়েছি। অন্য শিক্ষয়ত্রীরা বেশ স্নেহের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে নিলেন। বিশেষ করে সুপ্রীতিদি যেন একটু বেশী স্নেহের চোখে দেখলেন। স্কুলঘরগুলির সামনে একটু খোলা জমি। সেখানে ঠিক ছোট একটি পাহাড়ের মতন স্তুপাকার ময়লা জমে রয়েছে। একটু হাওয়া উঠলেই কি এক দুর্গন্ধে ঘরগুলি ভরে যায়। সুপ্রীতিদিরা বললেন—বছরখানেক হল পাড়ার যত ময়লা এইখানে জমা করা হচ্ছে। ঠিক সামনেই কাউনসিলারের বাড়ী, তিনিও কিছু করেন না। আপনি যদি বাঁচাতে পারেন আমাদের—কত কৃতজ্ঞ যে থাকব। আপনি দুদিন পরে চলে যাবেন—আমাদের এই গরুর গাড়ীর মতন জীবন চলা তার কবে শেষ হবে তাত জানিনা।

বাড়ী গিয়ে বাবার পরামর্শ নিয়ে ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসারকে চিঠি দিলাম। সেদিন ছিল শনিবার। সোমবার স্কুলে যেতেই মেয়েরা, শিক্ষয়িত্রীরাও সবাই ছুটে এলেন "দেখুন দিদিমণি সব পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। কি ভালই যে হল"। কিছুক্ষণ পরে একজন ভদ্রলোক এসে বললেন যে তিনি সেখানকার কর্পোরেশন কাউনসিলারের কাছ থেকে আসছেন। তাঁকে সাদরে বসতে বললাম। তিনি বললেন—কাউন্সিলার বাবু জানিয়েছেন যে সেখানকার ময়লা পরিষ্কার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসারকে জানিয়ে আমি বড় অন্যায় করেছি। ভবিষ্যতে যদি কখনও কিছু

করাতে হয় তার জন্য কাউন্সিলার বাবুই'ত রয়েছেন। আমি যেন কোন কিছুতে মাথা না ঢোকাই। আমিও উত্তর দিলাম—ছাত্রীদের মঙ্গলের জন্য সব কিছুই করবার অধিকার আমার আছে। তাতে যেন কেউ বাধা দিতে না আসেন এই অনুরোধ। সুপ্রীতিদিরা উত্তরে বড় খুসী হলেন। বললেন—কতরকম ভাবেই না আমাদের ওপর প্রভুত্ব চালানর চেষ্টা হয়। এবার বোধ হয় কিছু কমবে।

অবাক হয়ে ভাবলাম—এতগুলি ছাত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ওঁরওত কর্ত্তব্য ছিল। এতে'ত তাঁর কিছু ক্ষতি হয়নি। তাঁর নিজের বাড়ীর ছেলে মেয়েদেরও'ত উপকার হল।

সুপ্রীতি দির প্রায় রোজই স্কুলে আসতে দেরী হত। একটি দুই মাসের সন্তানকে কোলে নিয়ে, একটির হাত ধরে ও পেছনে আরও সারিবদ্ধ কয়েকটিকে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকতেন। আমি যেন ঠিক সময়ে এসেছেন এই কথাটি খাতায় লিখি—রোজই হাত জোড় করে অনুরোধ করতেন। বলতেন—সকাল থেকে উঠে রান্না করে, বাজার করে, ঘর দোর পরিষ্কার করে, অসুস্থ স্বামীকে খাইয়ে—তারপর এতটা পথ হেঁটে কখনও এর আগে পৌঁছান যায়? এত কথা বলতে গেলে ওঁর কাজের আরও ক্ষতি হবে ভেবে পরে আর ওঁকে কোন দিন কোন প্রশ্নই করতাম না। কোলের-টীকে ঘুম পাড়িয়ে বেঞ্চে শুইয়ে ক্লাসে ঢুকতে ঢুকতে প্রথম পিরিয়াডের ঘণ্টা শেষ হয়ে যেত। ছাত্রীদের অবস্থা ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠতাম।

সুপ্রীতিদির মাইনে আনতে গিয়ে দেখি—ধার শোধ দিয়ে খুব অল্প টাকাই পান তিনি। স্বামীর অসুখে কর্পোরেশন থেকে অনেক টাকা ধার নিতে হয়েছিল। মাসের শেষে টাকায় কু'লয় না—চারদিক থেকে ধার করতে হয়।

একদিন আদর করে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন, স্কুল শেষ হয়ে যাবার পর। গিয়ে দেখি ছোট দুখানি ঘর রুগ্ন স্বামী কাজ করতে পারেন না—বেশীর ভাগ সময়েই বিছানায় শুয়ে থাকেন। মুখটী তাঁর বিষাদে ভরা। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তাঁর অবিচারের কথা মনে করে মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। একা স্ত্রী-এতগুলি সন্তানের দায়ীত্ব কি করে বহন করবেন—তিনি কেন সে কথাটুকু ভাবতে পারেন না?

সুপ্রীতিদি রান্না ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। চা ও আরও কিছু তৈরী করে খাওয়ালেন। দেখলাম একটি কড়ায় বোধ হয় এক পোয়া মতন দুধ পড়ে রয়েছে। সেই কড়াটিতে জল দিয়ে প্রায় ভরে ফেললেন। অবাক হয়ে বোধ হয় তাকিয়ে ছিলাম। বললেন "ভাবছেন আমি কি করছি না? ছেলে মেয়েরা সব স্কুল থেকে ফিরবে—তার আগেই জল মেশানর কাজটি শেষ করে রাখি। এই সকলকে এক এক বাটি দেব। ওরা দুধ বড় ভালবাসে কি না। দুধ না হলে ওদের খাওয়াই হয় না"। কিছুক্ষণ পরে বললেন—মা হয়ে কি করে সন্তানদের এত প্রবঞ্চনা করি সেই কথাই ভাবছেন না?" আমি কিন্তু আর কোন কথাই বলতে পারলাম

না। "আজকে যাই আবার আর একদিন আসব" বলে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম। আর কোন দিনই যাওয়া হয়নি।

## উর্ম্মিলা

একদিন শুনলাম উর্ম্মিলাকে আমার একটি বন্ধু দেখে এসেছে একটি নার্সিং হোমে নার্সের কাজ করতে। জীবনে কত ভাবে সে পুরুষের কাছে নির্য্যাতিতা হয়েছে—তার নারীত্ব কতভাবে পদদলিত হয়েছে দর্পিত পুরুষের পদতলে।

একে একে কত কথা যে মনে হতে লাগল। জেলে যাবার কিছুদিন পরেই তার কাছে খবর এল যে তার স্বামী, স্ত্রীকে শাস্তি দেবার জন্য আবার বিবাহ করেছেন—উর্ম্মিলাকে চির দিনের জন্য ত্যাগ করেছেন। হিন্দু মতে বিবাহ হলে অনায়াসেই স্ত্রীকে ত্যাগ করে আবার বিবাহ করা চলে। ধর্ম্মতঃ দোষী হলেও আইনতঃ কোন বাধাই নেই। মার আশ্রমে কত স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েই যে আশ্রয় নিয়েছিল—নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য। মনটা সমস্ত পুরুষের বিরুদ্ধে কতবার বিদ্রোহ করে উঠেছে। ওদের হয়ে ভরণ পোষণের দাবী করবার মত অর্থ পর্য্যন্ত ছিল না। তাই অসহায় হয়ে সবই সহ্য করে যেতাম।

সুমতি ছিল স্বামী পরিত্যক্তা নারী। বহু সন্ধান করে তার স্বামীর কাছে গিয়ে যখন শুনলাম যে স্ত্রীকে ত্যাগ করার কারণ তার স্ত্রীর নাকি নাকে কোন দোষ ( এডিন-

য়েডস মনে হল ) আছে তখন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। প্রশ্ন করলাম "আপনি কি স্ত্রীর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করেছিলেন? আপনার যদি আজ যক্ষ্মা বা কুষ্ঠরোগ হয় আপনার বিবাহিত স্ত্রী কি আপনাকে ত্যাগ করে চলে যেতেন? যদি যেতেন তবে কি তাকে কুলত্যাগিনী বলে অভিসম্পাত দিতেন না?

কোন উত্তরই তাঁর কাছ থেকে পাইনি। ভবানীপুরের বড় নামজাদা ডাক্তারের প্রাসাদ তুল্য গৃহের সামনে দিয়ে স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীকে যেতে দেখেছি তার স্কুলের কাজে যাবার পথে। অপরাধ তার ছিল তার বিধাতা পুরুষ তাকে অত স্বাস্থ্য দিয়েও সাদা রংয়ের প্রলেপ দেন নি কেন?

সেই দেশে উর্ম্মিলার স্বামী যদি দেশের সেবায় জেলে যাওয়ার অপরাধে শাস্তি দিয়ে থাকেন—খুব দোষ দেওয়া যায় কি? তারপর জেল থেকে বার হয়ে উর্ম্মিলা প্রবঞ্চিত হল আবার এক পুরুষের হাতে। জীবনের আশা আকাঙ্খা সবই তার অতৃপ্ত। এমনি সময়ে প্রলুব্ধ করে মা বাবার আশ্রয় থেকে নিয়ে এল এক পুরুষ তাকে বিবাহ করে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে—মাতৃত্বের গরিমায় ঐশ্বর্য্যবতী করে দেবে এই আশা দিয়ে। তারপর তার জীবনে মাতৃত্বের অনুভূতি জাগিয়ে দিয়ে সেই পুরুষ অস্বীকার করল তার সমস্ত দায়িত্ব।

বহু চেষ্টা করেও তাকে উর্ম্মিলাকে বিবাহ করতে রাজি করতে পারি নি। সেই অসহায় অবস্থায় ভাসিয়ে দিলাম

উর্ম্মিলাকে সংসারের অতল সমুদ্রে। রাজনৈতিক কর্ম্মীকে সব দিক দিয়ে সাবধানে থাকতে হয় সুনাম রক্ষার জন্য। তাই জানিয়ে দিলাম যে আমরা অসহায়—কোন রকম সাহায্য আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মনে পড়ে এখনও তার সেদিনকার অসহায় ভয় বিহ্বল মুখখানি।

তারপর এতদিন পরে ওর খোঁজ পেলাম। নার্স হয়েছে সে। বিপদের সমুদ্রে যাকে ভাসতে দেখেও দুহাত বাড়িয়ে বাঁচাতে যাইনি নিজে ডুবে যাওয়ার ভয়ে, তার থেকে কি ভাবে সে নিজেকে বাঁচাল কিছুই আর জানতে পারি নি। জানবার অধিকারও বোধ হয় নেই।

"ওরে ভীরু তোর হাতে নাই ভুবনের ভার
হালের কাছে মাঝি আছে করবে তোরে পার"।

ছায়া—

এতবড় বিশ্বজগতে ছায়াকে একেবারেই হারিয়ে ফেলেছি। কোন দিন ফিরে পাব বলে আশা রাখি না।

নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশের আগে মা বললেন—যাদের আপন বলতে কেউ নেই সেই সব অসহায় ও উৎপীড়িত, বিশেষ করে বাংলার বিধবা মেয়েদের জন্য যদি মা একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা না করতে পারেন তবে তাঁর নতুন গৃহে ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাবেন না। সঙ্গে সঙ্গে পুরান বাসা-টীকে মা একটি আশ্রম করে ফেললেন কয়েকটী দরিদ্র

বিধবা মেয়েদের নিয়ে। কিছুদিন পরে ছায়াও এই আশ্রমে (এখন মার নামে "সরলা পুণ্যাশ্রম" নাম দেওয়া হয়েছে) একটি নিরাপদ আশ্রয় পেল। শুধু আমি ছাড়া এর জীবনের পূর্ব্বে ইতিহাসটুকু সকলের কাছে অজানা রইল। মা জানলেন একটি দুঃস্থ বাঙ্গালী মেয়ে তাঁর আশ্রমে পড়াশুনা করতে এসেছে।

ছায়া ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। সকলের সঙ্গে স্কুলে পড়তে যায়—পড়ায় অত্যন্ত আগ্রহ। আমার সঙ্গে অল্প দেশের কাজও করে। সভা সমিতিতেও যোগ দেয়। দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজ দিলে তা বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পন্ন করে রাখে। সবাই জানে সে উচ্চ বংশের দরিদ্র কন্যা।

একদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে একটি প্রদর্শনীর সম্পাদ-কের সঙ্গে দেখা করে জানালাম—আমরা প্রায় ১৫টী মেয়ে তাঁর প্রদর্শনীর দোকান পরিচালনার ভার নেব—বিকাল পাঁচটা থেকে রাত দশটা অবধি। প্রতিদিন প্রত্যেক মেয়ে এক টাকা করে পাবে। আমি সবাইকে নিয়ে যাব বলে দেড় টাকা পাব। কিছুদিন হল বিপ্লবীদলে বড়ই অর্থাভাব দেখা দিয়েছিল। আগে যাঁরা অর্থ সাহায্য করতেন এখন তাঁরা ভয় পেয়ে গেছেন। বাংলা দেশের বেশীভাগ বিপ্লবী তখন কারারুদ্ধ। ফেরারী বিপ্লবীদের রক্ষা করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা আমাদের নিঃশেষ হয়ে গেছে। অল্প সল্প ছেলে মেয়ে পড়িয়ে কটি টাকাই বা পাওয়া যায়

প্রতিদিন এত জনে মিলে এক টাকা করে আয় করলে হাতে কিছু অর্থসমাগম হবে।

বিকেলে সবাই এক একটি দোকানে বসেছি। প্রমেলি সেবার বিজ্ঞানে এম, এ, পাশ করেছে—সুবাসিনী অঙ্ক শাস্ত্রে এম, এ, পাশ করেছে—আশ্রমে ছায়ার মতন বয়সের অনেক মেয়েরা ওদের সঙ্গে এক ব্রত নিয়ে কাজ করতে এসেছে। বাণীদি ছেলে মেয়ে নিয়ে কিছুদিন হল বিধবা হয়েছেন। একদিন তাঁর বাড়িতে তিন দিন রান্না হয় নি দেখে অল্প কিছু টাকা তাঁর হাতে দিয়ে দিলাম। বাণীদি দোকানে বসে আনন্দে অধীর—'কল্যাণীদি প্রথমেই আপনার দেওয়া টাকাটা শোধ করব' "কি যে বলো ভাই বাণীদি ও টাকা কি তোমায় ধার দিয়েছিলাম" ? হঠাৎ ছায়ার চিৎকার শুনে ওর দোকানে ছুটে গেলাম। ভয়ে ত্রস্ত হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল—দু তিনটি গুণ্ডা প্রকৃতির লোক দৌড়ে চলে গেল সেখান থেকে। ছায়া চুপি চুপি আমায় জানাল যে, যে গুণ্ডার কাছে ওর মা ওকে অল্প কয়েক শত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছিলেন সেই নাকি ওকে ধরতে এসেছিল। ঐ লোকটার কাছে যাবার আগেও নাকি পালিয়ে এসে পাশের বাড়ীতে লুকিয়েছিল। সেই বাড়ীর প্রফেসর ভদ্রলোকটা আমাদের আশ্রমে তাঁর বোন বলে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন। এ ইতিহাস শুধু আমিই জানতাম।

খানিক পরে আমাকে একটি ভদ্রলোক তিরস্কার করে বললেন "তুমি এখানে কি করে এলে? এই প্রদর্শনীর

ভেতরে ঘরে জুয়া খেলা হচ্ছে। তোমার বাবা জানেন কি? ভয় পেয়ে বললাম—এসব ব্যাপার'ত কিছু জানি না—কাগজে দেখে বাবার অনুমতি নিয়েছিলাম। তিনিত কখনও মেয়েদের স্বাধীনতায় হাত দেন না। শুধু বিশ্বাস করেন তাঁর মেয়েরা জেনে শুনে কোন অন্যায় করতে পারে না।

তারপর সবাইকে নিয়ে তখুনি সে স্থান ত্যাগ করলাম। ট্যাক্সি করে ছায়াদের পৌঁছে দেবার সময় দেখি—একটি মোটরে করে সেই গুণ্ডারা পেছনে পেছনে এসে আশ্রমের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে। অজানা ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল। তারপর সবাইকে ছেড়ে অনেক বছরের জন্য কারাগৃহে আশ্রয় পেলাম। ফিরে এসে আশ্রমের মাসীমাকে ছায়ার কথা জিজ্ঞেস করাতে বললেন "আপনি জেলে যাবার পর ছায়া বড় কেঁদেছিল। ক'দিন পরে ওর মা এসে আপনার মাকে বুঝিয়ে নিয়ে গেলেন। ওর নাকি বিয়ে হয়েছিল এবং সেই স্বামী ওকে নিয়ে যাবার জন্য খুব ব্যস্ত। ছায়ার আপত্তি ও চোখের জল কিছুই করতে পারল না। স্বামী চাইলে আশ্রম ওকে আটকে রাখতে পারে না।"

কতবার মনে পড়ে ওর ব্যথা ভরা সুন্দর মুখখানি। হাসিটাও কি সুন্দর ছিল। "স্বামী"র কাছে যাবার আগে এবারও হয় তো আমায় তেমনি করে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল। আমি তখন কোথায়?

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছে আকীর্ণ
বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী—
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে"

## সুমনাদি—

সুমনাদি'র জীবন আলেখ্যটি নাড়া চাড়া করলে মাঝে মাঝে বড় আশ্চর্য্য হয়ে যাই। বড় লোকের মেয়ে—স্বামী বিদ্বান হয়েও ঘরজামাই হয়ে রয়েছেন। জোর করে তাই একদিন স্বামী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে বার হয়ে গেলেন বহিঃ জগতে। তারপর আরম্ভ হল প্রচণ্ড জীবন সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর কানে এসে পৌঁছল স্বাধীনতা আন্দোলনের ‍দুন্দুভি। ছেলে কোলে নিয়ে আসেন পার্কের জনসভায়। পাড়ার সুশীলা মাসীমা কাজ করে বেড়াচ্ছেন স্বয়ংসেবিকা হয়ে। তাঁর হাত ধরে বললেন—মাসীমা আমিও কাজ করব—একটু সঙ্গে নিয়ে চলুন না—। মাসীমা অবিশ্বাসে হাত ছাড়িয়ে চলে যান। ১৯৩৮ সনে মুক্তি লাভ করার পর সুমনা দি একটি বিশিষ্ট কর্মীর চিঠি নিয়ে দেখা করতে এলেন—"এঁর দেশ সেবার আকাঙ্খা দুর্নিবার। একে আপনার সহকর্মী করে নিতে পারলে ভাল হয়"। একটু আলোচনার পর তাঁকে ভার দিলাম—ছাত্রী সংঘের ব্যায়ামাগার পরিচালনার। বয়স পঞ্চাশের কোটায় পৌঁছতে দেরী নেই। আট ছেলে মেয়ের মা। সানন্দে দায়িত্ব গ্রহণ

করলেন। সঙ্গে পড়াশুনার আগ্রহ দেখে ট্রেনিংএও ভর্ত্তি করে দিলাম। সাইকেল চড়তে পারলে কাজের সুবিধা হবে ভেবে ভোর চারটেতে উঠে কিছু দূরে একটি মাঠে গিয়ে সাইকেল চড়া শিখতে আরম্ভ করলেন ও অল্প দিনে চমৎকার শিখে ফেললেন। পাড়ার লোকে ছিঃ ছিঃ করে গায়ে ঢিল ছুড়তে আরম্ভ করল। নিন্দা অপবাদ তাঁকে স্পর্শও করতে পারল না।

সকালে রান্না করে ঘরদোর পরিষ্কার করে ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে নিজে স্কুলে এলেন। প্রথমে আমাদের বাড়ীর নীচে মার তৈরী "বিদ্যামন্দির" পড়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর সার্টি-ফিকেট নিলেন। পরে সরোজনলিনীতে ভর্ত্তি হলেন। স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে ছেলে মেয়েদের খাইয়ে সাইকেল করে ব্যায়ামাগারে ঠিক সময়ে উপস্থিত হতেন। নিজেই কত মেয়েকে সাইকেল চড়ান শিখিয়েছেন। সেখান থেকে আমার কাছে উপস্থিত হতেন ও যেখানে যেখানে আমার দরকারী চিঠি পৌঁছে দিতে হত সেখানে ছুটতেন। বাড়ী ফিরে সংসারের কাজ সেরে রাত্রে পড়তেন ১২টা ১টা অবধি।

আমি বলতাম—এতগুলি সন্তানের মা হয়েও এত শক্তি রাখেন কি করে? হেসে বলতেন—যদি ভাল খেতে পেতাম তাহলে লোহা বেঁকিয়ে দেখিয়ে দিতে পারতাম বাঙ্গালী মেয়ে কত শক্তি ধারণ করতে পারে?

সমাজের পীড়নের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া অবিচারের মাত্রাও বেড়ে গিয়েছিল। ট্রেনিং পাশ করে স্কুলে

কাজ নিয়ে ছেলে মেয়েদের মানুষ করলেন। মাঝে মাঝে অল্প দু' একটি ফুল পেলে খোঁপায় পরতেন বলে লোকে নানান কথা বলত। একদিন বলেছিলাম লোকে যখন ভুল বোঝে নাইবা পরলেন ফুল। উত্তরে বলেছিলেন—অন্যায় যখন করছি না কারুর ক্ষতিও যখন হচ্ছে না—লোকের নিন্দেতে ভয় পাব কেন ভাই ? ফুল যে বড় পবিত্র—একে সঙ্গে রাখতে চাই"।

লোক নিন্দাকে ভয় পেয়ে বা সম্মান করে রামচন্দ্র সীতার প্রতি অবিচার করেছিলেন বলে তাঁকে কোন দিনই শ্রদ্ধা করতে পারিনি। সুমনা দি যে নিন্দায় অবিচলিত রইলেন সেই জন্য মনে মনে শ্রদ্ধাই করলাম।

বোম্বাইতে এসে দেখি দলে দলে মেয়েরা মাথায় ফুলের মালা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। উৎসবের দিনে অতিথি হয়ে নিজেও ফুলের মালা খোঁপায় দিয়ে ফিরেছি। এখানেত লোকে নিন্দা করে না।

সুমনা দি আজ সৌভাগ্যবতী। স্বামী নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে এসেছেন। জনমত আজ তাঁকে সম্মান দিচ্ছে। পুত্রেরা শিক্ষিত হয়ে মানুষ হয়েছে—মাতৃঋণ স্বীকার করেছে। তাঁর সেই গৃহ আজ দৈন্য ও দারিদ্র্যের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে সূর্য্যের আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

"তোমার জোতিষ্ক তারে যে পথ দেখায় ; সে যে তার অন্তরের পথ—সে যে চিরস্বচ্ছ—সহজ বিশ্বাসে সে যে করে তাঁরে চির সমুজ্জ্বল। অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে—

সে পায় তোমার হাতে শাস্তির অক্ষয় অধিকার"।

সেবা—

জীবনে বহু রকম মানুষের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছি। মানুষকে বিশ্বাস করে অনেকবার ঠক্‌তে হয়েছে। বিশ্বাসের মূল্য দিতে অনেক সময় ভুলে যাই আমরা, কিম্বা জেনে শুনে ইচ্ছা করেই দিই না। সেবা গাঙ্গুলী অনেক বার হেসে বলেছে "কল্যাণীদি আপনি মানুষকে যা বিশ্বাস করেন এতে অনেক আঘাত পাবেন জীবনে"। মনে মনে বললাম—'মানুষকে অবিশ্বাস করার পাপের চেয়ে বিশ্বাস করে দুঃখ পাওয়া অনেক ভাল।

সেবার কাছেই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী আঘাত পেতে হল। মানসী দীর্ঘদিনের কারাবাস মাথায় নিয়ে জেলে চলে গেল। তার অনুপস্থিতিতে তার নিকটতম আত্মীয় তার আলমারী খুলে বহু মূল্যের বই দিয়ে দিল তার দলের ছেলেদের। অনেক বার মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সেই বইগুলি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হল না। রাজনীতিতে দলের স্বার্থই নাকি সবচেয়ে বড়। ছাত্রী সংঘের পুস্তকাগারের বই বাক্স ভরে রেখে গেলাম অনিতার বাড়ী জেলে যাবার আগে। ফিরে এসে শুনলাম পুলিশের হাত থেকে বইগুলি বাঁচাবার সম্ভাবনা না দেখে সেগুলি সব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কয়েক মাস পরে একদিন খবর পেয়ে রাস্তায় বসা একটি দোকানে গিয়ে দেখি ছাত্রী সংঘের ষ্ট্যাম্প মারা সেই বইগুলি কম দামে বিক্রী হচ্ছে। হাতে টাকাও নেই যে

সেগুলি আবার কিনে আনি। এমনি ছোট বড় আঘাত অনেক পেয়েছি। কিন্তু সেবার দেওয়া আঘাতটী যেন সবকে ছাড়িয়ে চলে গেল।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য "কিশোর সংঘ" গড়ে তুললাম সমস্ত শক্তি দিয়ে—অর্থ দিয়ে, স্বাস্থ্য দিয়ে—প্রাণ দিয়ে। একদিন সেবা আমার একটি পরিচিতা বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসে জানাল যে তার স্বামী বহু দূরে চাকরী নিয়ে আছেন—একা একা ওর দিন কাটতে চায় না। তাকে কিছু কাজ দিতে পারি কিনা যাতে ও সব কিছু দুঃখ ভুলে থাকতে পারে।

অত্যন্ত সুখী হয়ে উঠলাম। ১৯৪২ সনের আন্দোলন বহুবার আহ্বান জানিয়ে গেছে। জেলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি। "কিশোর সংঘ"কে নিশ্চিন্ত মনে সেবার হাতে দিয়ে যেতে পারব। সত্যিই সেবা সংঘকে ভাল বেসেছে মনে হল কিছুদিন পরে। পরিচালনা সমিতি ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলাম অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে। সংঘের ছেলে মেয়েদের ডেকে বললাম "সেবা মাসীমা রইলেন—এঁর নির্দ্দেশ মতন তোমরা চলবে—কোন রকম দ্বিধা মনে রেখনা"—অভিভাবকদের কাছে সেবাকে নিয়ে যাই। বলি "ছেলে মেয়েদের এর হাতে ছেড়ে দেবেন নিশ্চিন্ত মনে—বড় ভাল মেয়ে এ আমার ডান হাত"। সংঘের টাকা বুঝিয়ে দিলাম ওর হাতে—অনেক টাকা দিয়ে যে সংঘের বই ও আলমারী কিনে ছিলাম তাও ওর বাড়ীতে রেখে এলাম।

আসতে সাহস পাচ্ছেনা। মাসীমা বলেছেন আপনি জেলে গিয়ে খুব অন্যায় করেছেন—আপনার সঙ্গে কোন যোগ রাখা আমাদের উচিত হবে না। আপনি বলেন—দেশকে ভালবাসতে দেশের মানুষকে ভালবাসতে। মাসীমা বলেন রাশিয়াকে চিনতে হবে তাকে ভালবাসতে হবে। ওঁর ঘরে ইউনিয়ান জ্যাক ঝোলান আছে।—আপনি তো জাতীয় পতাকাকে প্রণাম করতে শিখিয়ে ছিলেন। এত দিনে বুঝ-লাম সেবা কেন দেখা করতে এল না—সংঘের ছেলে মেয়েরা যারা এত ভালবাসত তারা কেন এলনা। সেই "জনযুদ্ধে-রই" একজন সেবা? তাছাড়া ওর স্বামী সরকারী চাকুরী করেন। সুলতার স্বামী সরকারী কলেজে পড়াতেন, ও নিজে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গেলেন। ভয়'ত পায়নি। কদিন পরে দেখি আমার বাড়ীর কাছেই একটি মাঠে সংঘের ছেলে মেয়েরা, তাদের অভিভাবকরা দলে দলে এক সভায় যাচ্ছেন। একজনকে প্রশ্ন করে শুনলাম—"আপনি জানেন না—আপনার সংঘের যে আজ উৎসব। আপনিই ত এর প্রতিষ্ঠাত্রী—আপনি যাবেন না? কি উত্তর দিই? উৎসবের বাঁশী কানে আসে—আমার কাছে সেখানকার দ্বার বন্ধ। কে করল বন্ধ—কেন এমন হল? একবার ভাবি ছুটে গিয়ে বলি—তোমাদের পিসীমা'ত এখনও মরে যাননি —তোমাদের কাছেই বসে আছি—এমন করে আমায় ভুলে গেলে কেন? ভয় হল সেবা যদি বলে "ও কেউ নয়—ও

তোমাদের কেউ ছিলনা কোন দিন"। ছেলেরাও সেটাই বিশ্বাস করবে? সেবা'ত সবই পারে।

উৎসব ভেঙ্গে গেলে অনিলা দেবী এসে বললেন—সেবা গাঙ্গুলী'ত কিশোর সংঘ ভেঙ্গে দিল—চিলড্রেণ পার্টি নামে নতুন দল করল।

পুরান সংঘের সব টাকা ও বই নতুন দলের হল। বসে বসে ভাবলাম—একটি ছেলে মেয়েও এতবড় অন্যায়ের প্রতিবাদ করল না? অভিভাবকরা একজনও বলে উঠলেন না কল্যাণী দেবী যখন বাইরে এসেছেন এত কাছে আছেন একবার তাঁকে সভায় এনে তাঁর মত প্রকাশ করবার সুযোগ দেওয়া হোক। "কিশোর সংঘে'র" গচ্ছিত ধন তাঁকে ফেরৎ দিয়ে আবার নতুন দল তৈরী করুন। এতবড় অবিচারকে সবাই নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করলেন।

মনকে আজও সান্ত্বনা দিই—সেবা নিজের ভুল একদিন বুঝতে পারবে। ওর সহকর্মীরা ওকে বুঝিয়ে দেবে—মানুষের কাছ থেকে পাওয়া এতখানি বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করেছে ও। ওর বিবেকই একদিন আমার কাছে নিয়ে আসবে। বছর কেটে যায়—সেবা'ত আর আসে না। তবুও—মানুষকে অবিশ্বাস করতে শিখলাম না।

বাংলার বাইরে একটি বড় সহরে অনেক বাঙ্গালী থাকেন তাঁদের ছোট পরিবার নিয়ে—স্ত্রী পুত্র কন্যা। একদিন খবর পেলাম শ্রীপতি বাবু দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে হাস-পাতালে রয়েছেন। সেই দিনই দুজনে তাঁকে দেখতে

গেলাম। সেখানকার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে জানলাম যে তাঁর জীবনের আয়ু আর কয়েক ঘণ্টায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরে ঢুকতেই দেখি স্ত্রী বসে আছেন চওড়া সিঁদুর মাথায়। শ্রীপতি বাবু আমরা দেখতে গেছি বলে এত আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন আর বললেন যে তিনি যেন একটু সুস্থ বোধ করছেন আর শীঘ্রই সেরে উঠবেন বলে মনে করছেন। স্ত্রীর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পরের দিন বাড়ীতে খবর এল শ্রীপতি বাবু চলে গেছেন পৃথিবীর পরপারে। ব্যাঙ্কের কয়েকটী ছেলেকে ছুটি দিয়েছেন তারা ও শ্রীপতি বাবুর বন্ধু মৃতদেহ নিয়ে শ্মশান যাত্রী হয়েছেন। তাড়াতাড়ি স্ত্রীর কাছে বাড়ীতে গিয়ে দেখি অন্ধকার একটি ঘরে বসে আছেন। শীতকালে অন্ধকার বড় সকাল সকাল এসে যায়। পাশে আর একটি বিধবা মহিলা—তাঁর জীবনেও যখন এমনি গাঢ় অন্ধকার দেখা দিয়েছিল সেই দিনের কথা বলে যাচ্ছেন। কোলে তখন তাঁর ছোট দুই ছেলে। তারা আজ বড় হয়েছে—বৌ এনেছে অনেক টাকার মালিক তারা। শ্রীপতি বাবুর স্ত্রীর বুকে তখন প্রকাণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে—চার পাঁচটী ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে দাঁড়াবেন কোথায়। বড় ছেলের বয়স মাত্র দশ—শ্মশান যাত্রীদের সঙ্গে গেছে পিতার মুখাগ্নি করতে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ শুনলাম 'বল হরি হরি বোল"। অমন জোরে অমন সুরে সবাই চিৎকার করছেন কেন? ধীরে ধীরে একটি গান করে এলেন না কেন? যেমন ব্রাহ্মদের ভেতর করা হয়। কিংবা খৃষ্টানদের মতন একেবারে নীরবে। হিন্দুস্থানীদের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়—"রাম নাম সত্য হ্যায়"। তার ভেতরও অনেক গাম্ভীর্য আছে নাকি? ছেলেকে দেখে মা একবার জোরে কেঁদে উঠলেন—তারপর তাকে নিয়ে গেলেন স্নান করবার জন্য। কাঁদবার সময় কই তাঁর? নিজেও স্নান করে এলেন। বাইরের ঘর থেকে একজন ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন শ্রীপতি বাবুর গ্রামের নিয়ম এখুনি সব গহনা ও লোহা খুলতে হবে। আমাদের ঘর থেকে সেই বিধবা মহিলা বললেন যে তিনি জানেন যে পরদিন সকালে সব খুলতে হয়। বিতর্ক চলল ঘর থেকে বাইরে। সদ্য বিধবা নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন সব। মাথার সিঁদুর নিজেই মুছে ধুয়ে এসেছেন। গহনা পরে সাজবার দিনও'ত তাঁর ফুরিয়ে গেছে। নিজেই তিনি সব খুলে ফেলবেন। এঁরা এমন করে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন কেন? আর এ সব শোনা যায় না। এঁরা যা হয় করুন এই ভেবে সেখান থেকে প্রায় কাউকে না বলেই চলে গেলাম।—তখন শুধু মনে হচ্ছিল মহিলা সমিতির একটি সভায় একজন মহিলা প্রবন্ধ পড়েছিলেন "মেয়েদের জীবনে যখন সব চেয়ে গাঢ় অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসে তখনই যেন সমাজ তার উদ্ধত খড়গ নিয়ে এগিয়ে আসে।"



## ছাত্র আন্দোলন ঃ—

১৯২৮ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবে ভর্ত্তি হয়েছি ছোট বোন বীণা একদিন বলল—"ছাত্র আন্দোলন নতুন করে আরম্ভ হচ্ছে—ছাত্রীদেরও তাতে অংশ নিতে হবে। তুমি ছাত্রীদের এই আন্দোলনে নিয়ে আসার ভারটা নাওনা। ওদের জন্য যদি একটি সঙ্ঘ তৈরী করা যায়। বেথুন কলেজে পড়তে পড়তে আমরা দরিদ্র ভাণ্ডার খুলতে চেষ্টা করেছি—আলোচনা সভা পরিচালনার ভার নিয়েছি আর দেশের বন্যা বা দুর্ভিক্ষে কাপড় জামা সংগ্রহ করে—সেলাই করে স্বর্গীয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে দিয়ে এসেছি। তিনি সস্নেহে পিঠ চাপড়ে আদর করেছেন। সে কাজগুলিত সবই সহজ ছিল। পৃথিবীর অন্য দেশে বিশেষ করে চীন ও রাশিয়ায় ছাত্র আন্দোলন কত প্রবল আকার ধারণ করেছে। বাংলা দেশেও তার প্রভাব আবার নতুন করে এসে পৌঁছেছে। ছাত্রীদের সঙ্গে করে সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এ কাজটি বোধহয় অত সহজ নয়। অতখানি শক্তি খুঁজে পাব কি? লীলাদিরা তখন ঢাকায় দীপালী সঙ্ঘ করেছেন—পাড়ায় পাড়ায় ছাত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন—মেয়েদের লাঠি খেলা প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছেন।

ছাত্র আন্দোলনে পূর্ণ অংশ নিয়ে ছাত্রীদের ভেতর রাজনৈতিক চেতনা আনায় ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার শক্তি সঞ্চয়নে নিজের সামান্য শক্তি নিয়োজিত করার সঙ্কল্প নিলাম।

কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্যাণ্ডেল টাঙ্গিয়ে—বিরাট ছাত্র সম্মেলন হচ্ছে। বাংলার প্রতি জেলা থেকে ছাত্র প্রতিনিধিরা এসেছেন। জহরলালজীকে সভাপতি রূপে আমন্ত্রিত করে আনা হয়েছে। বাংলার তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র সবরকম ভাবে ছাত্রদের উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করছেন। ছাত্রদের মুখে এক আশা, আনন্দ ও উদ্দীপনার ছবি প্রতিভাত হয়ে উঠছে। খুব সুন্দর ভাবে ও সমারোহের সঙ্গে সম্মেলনেব কাজ শেষ হল। আমরা ক'জন ছাত্রী মিলে সমানে সব অধিবেশনে যোগ দিলাম। বীণা ও আমি দুটি প্রস্তাব এনেছিলাম। একটিতে ছাত্ররা যে ছাত্র আন্দোলন আরম্ভ করলেন তাতে ছাত্রীরাও সমান শক্তি নিয়ে এসে পাশে দাঁড়াবে—পিছিয়ে থাকবে না এই কথা বলা হয়েছিল। সহস্র সহস্র ছাত্র আমাদের সেদিন অভ্যর্থনা করে নিলেন—আমাদের প্রতিশ্রুতিতে আনন্দ জানালেন।

অনেক বছর আগে দেশনেতা ৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। আবার ১৯২৯ সনে নিখিল বঙ্গ ছাত্রসঙ্ঘ তৈরী হল। ছাত্র নেতা প্রমোদ ঘোষাল, শচীন মিত্র, বীরেন দাশগুপ্ত প্রভৃতি এর প্রধান উদ্যোক্তা। কার্য্যকরী কমিটীতে তাঁরা ছাত্রীদের পক্ষ থেকে আমাকে ডাকলেন। বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় এর শাখা খোলা হল। শচীন বাবু কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করে চলেছেন। শ্রীসুশীল দেবের সম্পাদনায়

ও শৈলেন বাবুদের উৎসাহে 'ছাত্র' মাসিক পত্রিকাও বার করা হল।

আমরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় ঘরে সব স্কুল কলেজের ছাত্রীদের ডেকে "ছাত্রীসঙ্ঘ" প্রতিষ্ঠা করলাম। প্রথমে সরোজ নলিনী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান হওয়া স্থির হয়েছিল। আরম্ভ হবার কিছু আগে কর্ত্তৃপক্ষ জানালেন তাঁরা সেখানে স্থান দিতে প্রস্তুত নন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদকের কাছে অনুরোধ করতেই তিনি অনুমতি দিলেন। সেদিনের সভার জন্য বড় ঘর একটি ঠিক করে দিলেন। ছাত্র ছাত্রীদের প্রিয় প্রোফেসার ওরফে সর্ব্বপল্লী রাধাকিশন এসেছিলেন সে-দিনের সভায় পৌরহিত্য করতে। তাঁর সেই প্রাঞ্জল উদাত্ত ভাবায় অভিভাষণ শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। "ছাত্রী সঙ্ঘের" কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হল—সমস্ত স্কুল কলেজের প্রতিনিধিদের নিয়ে। অনেকগুলি বিভাগও খোলা হল—যেমন সাঁতারের ব্যবস্থা—লাঠি ছোরা সাইকেল শেখানর ব্যবস্থা—পাঠাগার স্থাপনা ইত্যাদি। প্রথমে অমর বাবু ৺দীনেশ বাবু প্রভৃতি লাঠি খেলা শেখাতেন। পরে প্রাচীন বিপ্লবী শ্রীপুলিন দাশ উত্তর কলিকাতায় ও শ্রীজ্যোতিষ দত্ত দক্ষিণ কলিকাতার ব্যায়ামাগারে সাহায্য করতেন। শ্রীযুক্ত জে, কে, শীল মহাশয়ও অনেক দিন বালিকাদের বক্সিং শেখানর ভার নিয়েছিলেন। কিছুদিন স্বর্গীয় রাজা মনীন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সার্কুলার রোডের বাড়ীর পুকুরে—ও পরে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের হেদোতে ছাত্রীদের জন্য সাঁতার শেখার

ব্যবস্থা হয়েছিল। ডাক্তার কালিদাশ নাগ বরাবর ছাত্রী সঙ্ঘকে স্নেহের চোখে দেখে এসেছেন। বেথুন কলেজের ঘরে ফরাসী ভাষা শিখিয়ে ঐ ভাষার সুন্দর সুন্দর স্বদেশী গান ও কবিতা আবৃত্তি করতেন। হিন্দী শেখানর জন্য তুইটী ক্লাস খোলা হয়েছিল। ছাত্রীদের ভেতর প্রাথমিক চিকিৎসা ও নার্সিং শেখানর ভার নিলেন তুই তিন জন ডাক্তার। স্কটীশ চার্চ্চ কলেজে ও বালিগঞ্জে আমাদের বাড়ীতে ঐ প্রাথমিক চিকিৎসার ক্লাস হোত।

সেণ্ট জন এম্বুলেন্সের কর্তৃপক্ষ এসে পরীক্ষা করে সকলকে সার্টিফিকেট দিলেন। পাড়ায় পাড়ায় আলোচনা সভারও ব্যবস্থা হয়েছিল। ডাক্তার সত্যপ্রিয় ব্যানার্জ্জি, ডাঃ সুরেন দাশগুপ্ত, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল ও ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতন সুধীবৃন্দকে মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ করে আনা হত। সাহিত্যিক ৺শরৎচন্দ্র একদিন কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে ছাত্রীদের আহ্বানে এসে ছাত্রী সমাজের প্রতি তাঁর দাবী জানিয়ে গেলেন। একবার দক্ষিণ কলিকাতার ছাত্রীসঙ্ঘ শাখা একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটী ছাত্রী ও প্রায় সব স্কুল কলেজের মেয়েরা এতে যোগ দিয়েছিলেন। স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষরাও অনেক দিক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। শ্রীযুক্তা মীরা দত্তগুপ্তা ও লীলা মজুমদার আরও কয়েকটী ছাত্রীদের নিয়ে এর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।

নিখিল বঙ্গ ছাত্র সঙ্ঘের উদ্যোক্তারা প্রথমে একটু ক্ষুন্ন

হলেন একটি ভিন্ন সঙ্ঘ করাতে। সব ছাত্রীদের পক্ষে ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হবে না। মেয়ে হোষ্টেলের ছাত্রীদেরও ছাত্র সঙ্ঘে যোগ দিতে অনুমতি দেওয়া হবে না। কিন্তু ছাত্রী সঙ্ঘে যোগ দিয়ে তারা কাজ করতে পারবে—এই সব কথা শচীন বাবুদের বুঝিয়ে বলাতেই তাঁরা বুঝে নিলেন আর ছাত্রী সঙ্ঘকে সাদর অভিবাদন জানালেন। তাঁদের সহযোগিতায় ছাত্রীসঙ্ঘ উন্নতি লাভ করল।

এর অল্প কিছুদিন পরে বাংলার দধিচি ৺যতীন দাশ লাহোর জেলে অনশন করে প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর মৃতদেহ কলকাতায় আনা হল। ছাত্রীসঙ্ঘের সভ্যারা দলে দলে সেই ভোর বেলাকার অন্ধকারে হাওড়া ষ্টেশনে গেলেন—সেখান থেকে কেওড়াতলা অবধি স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ করলেন। শোভাযাত্রার মাঝে মাঝে কোন ধনী হরির লুট দিচ্ছিলেন। পাঞ্জাবী মারাঠী মহিলাদের মধ্যে সেই মাটিতে পড়া পয়সা কুড়িয়ে নিবার জন্য কি ব্যস্ততাই না দেখেছি। তাঁদের প্রশ্ন করেছিলাম কি করবেন ঐ পয়সা দিয়ে। তাঁরা বললেন তাঁদের ছেলেদের গলায় লকেট করে রেখে দেবেন—যাতে তারা বড় হয়ে এমনি ভাবেই দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে। ১৯৪২ সনের আন্দোলনে মনে হয়েছিল—যারা প্রাণ দিচ্ছে তাদের মধ্যে নেই কি সেই মায়েদের ছেলেরা যাদের সেদিনকার হরির লুটের পয়সা বড় সযত্নে বড় আশা নিয়ে মায়েরা পরিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর এল কলকাতায় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন। নেতাজী সুভাষ বোস হলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক। লতিকা দি স্বেচ্ছাসেবিকাদের ভার নিলেন। একদিন ছাত্রী-সঙ্ঘের সভায় মাদ্রাজের ডাক্তার রেড্ডীকে নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। তাঁর অভিভাষণ শেষ হয়ে গেলে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবিকা হবার জন্য ছাত্রীদের অনুরোধ জানান হল। একশতের অধিক নাম পাওয়া গেল। এক মাস আগে থেকে আমাদের ড্রিল কুচকাওয়াজ প্রভৃতি শেখান আরম্ভ হয়েছিল। কুড়ি পঁচিশ জনকে নিয়ে এক একটি ব্রিগেড তৈরী হল। এক একজন আবার এক একটি ব্রিগেডের ভারপ্রাপ্ত অফিসার হলাম। প্রকাশ্য অধিবেশনের কিছুদিন আগে থেকেই ভোর বেলা বাস এসে বাড়ী থেকে নিয়ে যেত। সারাদিন অধিবেশনের কাজ করে রাত্রি অবধি কংগ্রেসের সঙ্গে যে বিরাট প্রদর্শনী হয়েছিল সেখানে সাহায্য করে বাড়ী ফিরতাম। সেবার কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন জহরলালজীর পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। তাঁকে হাওড়া থেকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে এল আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকা দল। কংগ্রেস অধিবেশনের তিন দিন আমাদের কজনকে গেটের ডিউটি দিতে হল। সারা ভারত থেকে নেতারা এলেন, কত প্রাণস্পর্শী অভিভাষণ হল, প্রস্তাব গৃহীত হল। কিছুই দেখতে বা শুনতে পাইনি। বীণা ও অমিতার সঙ্গে একদিন গেটে দাঁড়িয়ে আছি লাঠি কাঁধে নিয়ে। আমাদের কাছে বড় অফিসার একজন বলে গেলেন—খুব

বড় শ্রমিক শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে—জোর করে তারা কংগ্রেস মণ্ডপে ঢুকবে। মেয়েদের দিকটাতে আমাদের আটকাতে হবে। ভেতরে যে মেয়েরা রয়েছেন তাঁদের যেন কোন বিপদ না হয়। মনটা ব্যথা ও দুর্ভাবনায় ভরে উঠেছিল। কংগ্রেসের অধিবেশন হবে, ওদের কেন স্থান নেই? ওরা যখন আসতে চাইছে ওদের আসতে দিতে পারলে বড় ভাল হোত না? কিন্তু তখনত আমাদের ঐসব বিচার করবার মতন সময় নেই। আমরা সামান্য সৈনিক—আদেশ আমাদের মানতেই হবে। পরে শুনলাম শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে ঠিক করে কিছু দূরে ওদের নিয়ে সভা হচ্ছে। নেতাজী তখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বেশ নিগূঢ় ভাবেই। সবাই আমরা নিশ্চিন্ত হলাম।

একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়ে। কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য মা গেছেন দিদিদের সঙ্গে। দূর থেকে মাকে ঢুকতে দেখেছিলেন সুভাষ বাবু। পিতৃদেবের প্রিয় ছাত্র তিনি। মা হলেন তাঁর গুরুপত্নী। সেই জি ও সির পোষাক পরেই তিনি এগিয়ে গিয়ে মার পায়ের ধূলা নিয়ে প্রণাম করলেন।

আর একদিন খুব মজার একটি ঘটনা ঘটেছিল। গভীর রাত্রে সুভাষ বাবু দেখতে বেরিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবকরা রাত্রে তাদের কর্ত্তব্য পালন করছে কিনা যারা ডিউটিতে ছিল তারা প্রশ্ন করল—কে যায়? তিনি উত্তর দিলেন

না। তখন তারা তাঁকে বন্দী করে ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের ভেতরে ইলেকট্রিকের আলোয় দেখল যে স্বয়ং জি ও সি। তাদের জি ও সি যে এই ঘটনায় খুব সুখী হয়েছিলেন সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

তারপর কংগ্রেসের অধিবেশনের কাজ শেষ হয়ে গেলে একদিন তিনি ডাকলেন সব স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকাদের। সেদিন তিনি জানালেন তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা। আমাদের সকলের সাহায্য না পেলে অত বড় দায়িত্ব তিনি সম্পন্ন করতে পারতেন না সে কথাও জানিয়ে দিলেন। সব শেষে আমরা সেদিন তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলাম।

## ১৯৩০ অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্র সমাজ।

ছাত্র সমাজে ইতিমধ্যে ভাঙ্গন ধরেছে। বাংলা দেশে ছাত্রদের দুইটি ছাত্র সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হল। নিখিল বঙ্গ ছাত্র সঙ্ঘকে অনুশীলন দলের নেতারা তাঁদের দলের 'রিক্রুটিং সেণ্টার' করলেন। তাই যুগান্তরের কর্ম্মীরা আর একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান গড়বার প্রয়োজন বোধ করলেন। তখন সৃষ্টি হল 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সঙ্ঘ'। ময়মনসিংহের ছাত্র সম্মেলনে ছাত্র সমাজের ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয়।

আপ্রাণ শক্তিতে ছাত্রী সঙ্ঘকে বাঁচালাম এই দলাদলির হাত থেকে। নিজে দলাদলি করতে বড় অসমর্থ ছিলাম তাই অন্যদের ভেতর এই দলাদলি, নিন্দা, অপবাদ দেখে বড়

কষ্ট পেতাম। এই দুটী ছাত্র সঙ্ঘের ভেতর মিলন সেতু গড়বার জন্য কত যে চেষ্টা করলাম। সবই যেন ভেঙ্গে গেল বারবার। ঠিক এমনি সময়ে এল ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলন। গান্ধিজী ছিলেন এ মহা যজ্ঞের হোতা। সবাই চারিদিকে লবণ তৈরী করে সরকারের আইন ভাঙ্গার কাজে লেগে গেলেন। সরকার ছাড়া কারুর লবণ তৈরী করবার অধিকার ছিলনা। আর লবণ এমন একটা জিনিষ যেটা ধনী থেকে যে পরম দরিদ্র তারও প্রয়োজনে আসে। জীবন ধারণের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য যার ওপর সরকার শুল্ক বসিয়েছেন। দলে দলে হাজারে হাজারে ছাত্র, তরুণ, কৃষক, মহিলা সকলেই এই আইন ভাঙ্গা আন্দোলনে যোগ দিলেন "গান্ধিজী কি জয়, স্বাধীন ভারতের জয়" বলে লাঠির সামনে বন্দুকের সামনে দাঁড়ালেন। দেশ যেন কি এক সোনার কাঠির স্পর্শে অনেকদিনের ঘুমের পর আবার জেগে উঠল। সেই ১৯১৫ সনের সশস্ত্র বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবার পর—১৯২১র অসহযোগ দেখা দিয়েছিল। তখনও দলে দলে ছাত্র স্কুল কলেজ ছেড়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দেশবন্ধু তখন ছিলেন বাংলার নেতা। তারপর এল আবার দীর্ঘ আট নয় বৎসরের ব্যবধানে এই নূতন আন্দোলন—আরও ব্যাপক ভাবে, আরও সুদৃঢ় ভিত্তিতে। কলকাতার ছাত্র ছাত্রীরা গ্রাম থেকে তৈরী হয়ে যে লবণ আসে তাই প্যাকেটে করে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রী করি। খদ্দর নিয়ে নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বিক্রী করি—মেয়েদের বাড়ীতে গিয়ে চরখা দিয়ে

আসি তুলা দিয়ে আসি। আবার সূতা তৈরী হলে গিয়ে নিয়ে আসি। দেশে যখন এমনি একটা প্রবল বন্যা এসে পড়ল তারি আবর্ত্তনে ছাত্ররা কিছুদিনের মতন নিজেদের ভেতর কার বিভেদ ভুলে এক যোগে কাজ করতে সম্মত হলেন। এলবার্ট হলে আবার একটি ছাত্র কনভেনসান আহ্বান করে ছাত্র সমাজের মতামত গ্রহণ করা হল। বাংলার প্রতি জেলা থেকে ছাত্র প্রতিনিধিরা এসে তাঁদের অভিমত জানিয়ে গেলেন। প্রথম ও প্রধান প্রস্তাবে বলা হল যে যতদিন না দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে বা আইন অমান্য আন্দোলন দেশে প্রবর্ত্তিত থাকবে, ছাত্ররা এই একটা অ-স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের পড়াশুনা বন্ধ রেখে দেশের নেতাদের পরিচালিত এই আন্দোলনে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে। এই প্রস্তাবটা আমাকেই আনতে হল ও অন্য একটি ছাত্র কর্ত্তৃক সমর্থিত হল। কংগ্রেস থেকে সত্যাগ্রহ কমিটী করে আন্দোলন পরিচালিত করা হচ্ছে। ছাত্ররাও দুই সঙ্ঘের নেতাদের নিয়ে একটি ছাত্র-সত্যাগ্রহ কমিটী করলেন। বাসন্তী দেবী হলেন আমাদের ঐ কমিটীর সভানেত্রী। সারাদিন কাজ করে রাত্রে তাঁর বাড়ী যেতে হত আলাপ আলোচনার পর, পরের দিনের কার্য্যসূচী স্থির করার জন্য। সভা শেষ হতে রাত্রি বারটা একটা বেজে যেত। ট্রাম বাস না থাকাতে একা হেঁটে ফিরতে কত রাত্রি হত। মা বাবা মেয়ের অপেক্ষায় তখন অবধি বারাণ্ডায় বসে থাকতেন।

কিন্তু কোন দিনের জন্যও তাঁদের এতটুকু অভিযোগ করতে

শুনিনি। সে বছর এম, এ পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় সে কথা বাবাকে বলাতে দুঃখ পেয়েও তিনি কিছু বলেন নি।

একদিন শুধু যদি জেলে নিয়ে যায় তবে কি করে সহ্য করব এই ভেবে উদ্বেগ প্রকাশ করাতে মা বললেন—'ওতো কোন অন্যায় কাজ করছে না। কত ছেলে মেয়ে কত কাজ করছে জেলে যাচ্ছে—তোমার মেয়েও করবে—সেত আনন্দের কথা'—তুমি অত অস্থির হও কেন?

সব স্কুল কলেজে পিকেটিং আরম্ভ হল। অনেক স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষ বাড়ীতে এসে অনুরোধ করতেন যেন তাঁদের স্কুলে বা কলেজে পিকেটিং না করা হয়। তাঁদের অনুরোধ রাখা সম্ভব নয় বললে কেউ কেউ ভয়ও দেখিয়ে যেতেন। ছাত্ররা প্রয়োজনের খাতিরে সমস্তক্ষণই কেউনা কেউ বাড়ীতে আসছেন। বাড়ীতে যেন এক মহা উৎসব পড়ে গেল। ছোট ভাই অমল ছুটে ছুটে এসে খবর দিচ্ছে। বাড়ীতে তখন টেলিফোন না থাকাতে দূরের ডাক্তারখানায় গিয়ে ফোন ধরতে হোত। সেখানকার ডাক্তার বীরেন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দিনের মধ্যে কতবার যে এসে ডেকে নিয়ে যেতে হত। একটি বারের জন্য তাঁকে বিরক্তভাব প্রকাশ করতে দেখিনি। তাঁর ঋণ কোনও দিন পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলেও কোন দিন প্রকাশ করতে দিতেন না। বলতেন এটা যে তাঁর কর্ত্তব্য।

বালিগঞ্জ থেকে উত্তর কলকাতায় গিয়ে কাজ করা বড়

কষ্টকর ব্যাপার হয়ে উঠল। আমাদের ছাত্র অফিস সব মধ্য বা উত্তর কলকাতায়।

কিছুদিন আগে মাকে বলে একটি ছাত্রীদের জন্য মেয়ে বোর্ডিং খুলে ছিলাম। ছাত্রীরা স্থানাভাবে কষ্ট পাচ্ছে বলাতেই মা সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে একটি ছাত্রীনিবাস খুলে ছিলেন। ওপরে ছাত্রীরা থাকত—নীচে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের নিয়ে মা একটি আশ্রম খুলে দিলেন। সুহাসিনী কমলা দাশগুপ্তা কল্পনা প্রভৃতিরা বাড়ী থেকে বা অন্য হোষ্টেলে থেকে স্বাধীন ভাবে কাজ করবার সুবিধা পায় না। তাদের জন্য একটী ব্যবস্থা করাই আমার সত্যিকারের উদ্দেশ্য ছিল। ওরা ছাড়া অন্য মেয়েদেরও রাখতে হয়েছিল—নয়তো খরচ উঠবে কোথা থেকে। আমি সেখানে গিয়ে থাকতে চাই বলাতে অন্য ছাত্রীরা আপত্তি জানাল। আমি গেলে কোন দিন তল্লাসী হতে পারে—ওদের নাম ধাম পুলিশে লিখে নিতে পারে এই ভয় ওদের ছিল।

অনেক দিন পরে জেল থেকে ফিরে এসে শুনেছিলাম—কমলাদের জন্য হোষ্টেল তল্লাস করা হয়েছিল বলে অন্য মেয়েরা একদিন মাকে না বলেই সব আসবাব পত্র বাসন প্রভৃতি নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। মাকে অনেক টাকা লোকসান দিতে হয়েছিল।

নিজেদের ছাত্রাবাসে স্থান না পেয়ে একটি বন্ধুর মধ্য কলিকাতার বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। বন্ধুর বাড়ী—বৃদ্ধা মা ও মেয়ে সেখানে থাকেন। দিনের বেলা, সেই

ভোর থেকে ঘুরে ঘুরে কাজ করি—রাত্রে এসে বন্ধুর ঘরে ক্যাম্প খাটে খাওয়ার পর শুয়ে থাকি।

প্রায়ই কথাবার্ত্তার ভেতর দিয়ে বুঝতে পারতাম যে বন্ধুর মা আমার সেখানে থাকাটা পছন্দ করতেন না। চোখে ভাল দেখতে পান না—সব সময়েই আশঙ্কা—যে তাঁর মেয়েকে বুঝি পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। স্নেহ'ত শুধু শঙ্কাই করে। মার পক্ষে আমার থাকাটা পছন্দ না করাটা একান্ত স্বাভাবিক ছিল। তাই তাঁর জন্য মনে বড় অস্বস্তি ও কষ্ট অনুভব করতাম। তাঁর ওপর কিন্তু কোনদিনও একটু অভিমান হয়নি। একদিন রাত্রে ফিরে এসে দেখি ক্যাম্প খাটটা নেই। পাশের ফ্ল্যাটের মহিলার কাছ থেকে শুনলাম বন্ধুর মা খাটটা সরিয়ে দিয়েছেন যাতে—আমি আর না ফিরে আসি সেখানে। সেদিন মাটিতেই শুয়ে পড়লাম। অনেক রাত অবধি খালি মনে হচ্ছিল—আমার মা হয়তো শুয়ে শুয়ে চোখের জল ফেলছেন আর এই গৃহছাড়া অশান্ত কন্যাকে তাঁর পাশটিতে শোবার জন্য ডাকছেন। নিজের অজান্তে সেদিন চোখে জল এসে গিয়েছিল।

পরের দিন কোথায় যাব ভেবে না পেয়ে সার্কুলার রোডের লেডিস পার্কের মাঠে ঢুকে পড়েছিলাম। ভাবলাম শীত'ত নেই কষ্ট কিছু হবে না। কিছুক্ষণ পরে পার্কের মালি এসে কাউকে থাকতে দেওয়ার নিয়ম নেই বলে সেখান থেকে বিতাড়িত করে দিল।

আবার বন্ধুর বাড়ী এসে বসেছি। এমন সময় এক বাল্য

বন্ধু এসে উপস্থিত হলেন। এম এ পরীক্ষা তাকে দিতেই হবে—টাকা জমা দেওয়া হয়ে গেছে। মা বাপ নেই। বড় দাদার কড়া হুকুম—পরীক্ষা দিতেই হবে। রাতটা আমাদের কাছে কাটিয়ে ভোর বেলায় বাড়ীতে ফিরে যাবে। রাত্রে খেয়ে তিন বন্ধুতে গল্প করছি। দরজায় ধাক্কা দিয়ে একজন ঢুকে বললেন—তিনি পাড়ায় থাকেন একটি পুলিশ কর্ম্মচারী। পরের দিন ভোরে পুলিশ আসবে হানা দিতে। আমরা যেন সতর্ক থাকি। প্রথমতঃ পরীক্ষার্থিনী বন্ধুকে সেখান থেকে সরাতেই হবে। সে বলল "তোমাদের মত কাজ করে ধরা পড়া এক। আর শুধু শুধু বিনা কাজে ধরা পড়ে জেলে যাওয়ায় কোন তৃপ্তি নেই। তাছাড়া দাদা বহু কষ্টে আমার পরীক্ষার টাকা জোগাড় করেছেন"।

দ্বিতীয়তঃ আমাকে ঐ বাড়ীতে পেলে বন্ধুর মার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহীকে আশ্রয় দানের অভিযোগ আনা হবে। রোগে শোকে জর্জ্জরিতা ঐ অন্ধ-প্রায় বৃদ্ধাকে হাজতে নিয়ে যাবে জেলে নিয়ে যাবে। সে কথা যে ভাবতেই পারা যায় না। স্থির করলাম তিন বন্ধুতে রাত্রের মতন কোথাও চলে যাই। সকালে তল্লাসী হয়ে গেলে ফিরে আসব। ঐ বাড়ীর একটি ছোট ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধুর মার জমিদারীর দলিল পত্র ভরা একটি ট্রাঙ্ক ভাড়া গাড়ীর মাথায় বসিয়ে যাত্রা করলাম নিরুদ্দেশের পথে। ঠিক গাড়ীটা চলতে আরম্ভ করবে—বন্ধুর বাড়ীর নীচের ভাড়াটিয়াদের একটি ছেলে এসে বলল তার মামার বাড়ী খুব কাছে—সেখানে গিয়ে রাত্রিটা কাটিয়ে

আসতে। আমরা উৎসাহ ভরে একবারও ভাবলাম না ঐ ছেলেটি সব জানল কি করে।

তাকে সঙ্গে নিয়ে চললাম মামার বাড়ী। সেখানে তখন সকলেই ঘুমিয়ে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে দরজা খোলবার পর একটি ঘরে মাটিতে আমাদের শুতে দেওয়া হল। নিশ্চিন্ত মনে মাথার কাছে ট্রাঙ্কটী রেখে শুয়েছি—তিন জনেই শুনতে পেলাম পাশের ঘর থেকে টেলিফোনে কথা বলছেন মামা অর্থাৎ যাঁর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছি আমরা। তিনি "তারাত এখানেই রয়েছে—এখানেই কি গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা হবে ?"

তিনজনে তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি কয়েকটি কলেজে পড়া ছেলে পাশের ঘরে জেগে কথা বলছে। তাদের অনেক করে অনুরোধ করলাম একটি যেন ভাড়া গাড়ী ডেকে দেয়—আমরা তখুনি চলে যেতে চাই সেখান থেকে। সবাই কিন্তু অস্বীকৃত হল ঐ সাহায্যটুকু করতে। শেযে ঠাকুরের মাথায় ট্রাঙ্কটী তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম সাপের গর্ত্তেই না পা দিয়ে ফেলেছিলাম। চলেছি কলকাতার রাত্রিকালের রাস্তা দিয়ে। পথ ঘাট সব গুলিয়ে গেছে। ঠিক কোনখানে গিয়ে পড়েছি তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সমস্ত রাতটাই হেঁটে চলেছি নয় কোন বাড়ীর রোয়াকে বসে পড়েছি। এত রাত্রে যাবই বা কার বাড়ীতে। ভোরের দিকে বন্ধুর এক পরিচিতার বাড়ীতে বাস্কটি রেখে দিয়ে পরীক্ষার্থিণীকে বাড়ীর দিকে রওয়ানা করিয়ে সকাল আটটা বেজেছে দেখে বন্ধুর বাড়ীর

দিকে ফিরে এলাম। পুলিশ আসে নি দেখে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে রাত্রির অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম মার্চ্চ করে পুলিশ বাহিনী এগিয়ে আসছে। মাসীমাকে ( বন্ধুর মাকে ) বিপদ থেকে দূরে রাখতে গিয়ে সারা রাত্রি রাস্তায় ঘুরলাম। তাতেও কোন সমাধান হলনা। পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বাবু মনে মনে হাসছিলেন "বড় যে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন"। সি আই ডি দের দক্ষতাকে প্রশংসা না করেও পারিনি।

অন্য উপায় না দেখে আমি সাজলাম মাসীমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। শরীর ভাল নেই শুনে তখুনি যেন দেখা করতে এসেছি। সত্যিকারের আমি যে পরীক্ষার্থিনীর সঙ্গে অন্তর্হিতা হয়েছি সেইটা বিশ্বাস করে ও বড় বেশী নিরাশ হয়ে পুলিশবাহিনীর নেতা ফিরে গেলেন!

সেবার মাসীমাকে জেল যাত্রা থেকে বাঁচিয়ে সে গৃহ থেকে বরাবরের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেলাম। ঐ রাত্রের স্মৃতি মনে হলেই এই প্রশ্ন জেগে ওঠে—যে যৌবন শক্তি আগুনে বা শত ঝড়ঝঞ্ঝায় এতটুকু ম্লান হয়নি—যে শক্তি মহত্ব ও ত্যাগের গরিমায় কত উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দিয়েছে—সেই শক্তিই কি করে আশ্রিতদের ধরিয়ে দেবার হীন মনোবৃত্তিকে সহ্য করল? বজ্র নিনাদে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে উঠল না। ভাবলে বড় অবাক লাগে।

ঐ সময়কার আর একদিনের একটি ঘটনা মনে করলে এখনও বড় হাসি পায়। একদিন সাত আটটি ছাত্রীকর্মী নিয়ে

লবণ বিক্রী করে বেড়াচ্ছি—আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছি। একটি অজানা বাড়ীতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় গেছি। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে সামনে দাঁড়িয়ে আমি বলছি "আমরা কংগ্রেস থেকে এসেছি"—হঠাৎ ঘর থেকে চীৎকার করতে করতে একজন ভদ্রলোক বাইরে এসে বললেন "বল্‌ছি নেবে যান—যান যান বল্‌ছি"। সভয়ে সবাই পিছন ফিরে নেবে এলাম। সরু সিঁড়ি—একজনের বেশী দাঁড়ান যায় না। কিউ করে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এবাউট টার্ণ করে ফিরে নেবে গেলাম। প্রথমে ছিলাম আমি—কাজেই শেষে পড়লাম আমি। খালি মনে ভয় হচ্ছিল পেছন থেকে যদি একটা ধাক্কা এসে পড়ে—অবিশ্যি অতখানি ভয় পাবার কারণ হয়ত ছিল না। পেছন ফিরে পালালেই ভয় একটা কেমন যেন এসে যায়। নীচে এসে সবাই মিলে খুব খানিকটা হেসে নিলাম। মনটা হাল্কা হয়ে গেল। অপমানের রেশ আর মনে রইল না কিছুই।

আর এক দিনের ঘটনা! খুব জোরে পিকেটিং চলছে বেথুন কলেজের সামনে ও প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে। বেথুনের গেটে সকাল থেকে সহকর্মীদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করছি।

প্রিন্সিপ্যাল-দিদি এসে প্রথমে খুব বকতে আরম্ভ করলেন। গুরুজন ব্যক্তি—তাছাড়া ছাত্রী সঙ্ঘের সভা করতে দিয়েছিলেন বেথুনের ঘরে। সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে যখন সুভাষ বাবুকে সভাপতি :করে এনেছিলাম তখন তিনিও

এসেছিলেন আমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। তিনি কলেজের অধ্যক্ষ—তাঁর কলেজে পিকেটিং করতে দেখে রাগ হওয়া স্বাভাবিক মনে করে সমানে চুপ করেছিলাম। স্কুলের ছোট মেয়েদের ঢুকতে দিয়েছি—বড়দের যেতে দিচ্ছিনা। কলেজের বড় মেয়েরা দূর থেকে ফিরে যাচ্ছিল। শুধু পরিচিতা দুই একজনকে—"দেখুন—দিদি আমরা ঢুকতে চাইছি কিন্তু পাচ্ছিনা"—বলতে শুনে বড় মর্ম্মাহত হয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে দেখি বহু পুলিশ ও সার্জ্জেণ্ট এসে গেছে। প্রশ্ন করাতে বলল "আপনাদের প্রিন্সিপাল ফোন করাতেই আমরা এসেছি। নয়তো আমরা আসতে পারি না"।

আমাদের বন্দী করে নিয়ে জেল গাড়ীতে উঠিয়ে কত দূর এক গ্রামের ভাঙ্গা বাড়ীর সামনে নিয়ে নাবিয়ে দিল। আমাদের ধরে নিয়ে যাবার পর যে সব ছাত্রীরা ঢুকতে চেয়েও ঢুকতে পারছিল না তারাও ফিরে চলে গিয়েছিল। স্কুলের ছোট ছোট মেয়েরা ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। কন্যা সম ছাত্রীদের পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে শুনে স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিরণ দি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

আমাদের ভাঙ্গা বাড়ীতে রেখে পুলিশের গাড়ী ফিরে চলে এল। ঐরকম নির্জ্জন স্থানে আমরা কতগুলি অসহায় মেয়ে। ঠিক কোথায় আমাদের রেখে গেল বুঝতে না পেরে আমরা রাস্তা ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। হাঁটতে হাঁটতে শ্রান্ত হয়ে উঠেছি এমন সময় দেখি একটি ট্যাক্সি একজনদের কোথায় নাবিয়ে ফিরে যাচ্ছে। তাতে উঠে আমরা ফিরে

এলাম আবার সেই বেথুন কলেজের গেটের সামনে। সমস্ত ছাত্রীরা বন্দেমাতরং বলে অভ্যার্থনা করে নিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেন্দ্র করে চলেছিল আমাদের সংগ্রাম—একদিকে বৃটিশ শক্তি অন্য দিকে ছাত্র সমাজ। সেখানে গেটের সামনে কজন সার্জ্জেণ্ট বসে থাকত। যেই ছাত্ররা পিকেটিং করতে আসত—অমনি তারা ঠিক বাঘ সিংহের মতন ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। অমানুষিক ভাবে তাদের ওপর বেটন দিয়ে আঘাত করে অজ্ঞান করে দিত। তারপর পুলিশের লরীতে ওদের ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে—হাসপাতালে নিয়ে যেত। এই ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনের প্রাত্যহিক ঘটনা। অত অত্যাচার সহ্য করবার মত শক্তি-সম্পন্ন কলেজের ছেলে আর পাওয়া যাচ্ছিল না। স্কুলের ছেলেরা এসে সত্যাগ্রহী হিসাবে নাম লিখিয়ে গেল। বেটন দিয়ে মেরে মেরে সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়ে দেয়। শরীরের সমস্তটা ছড়ে ছড়ে গেছে এই রকম অবস্থায় অরুণাংশু বাবুকে একদিন দেখলাম। স্কুলের ছেলেদের ঐরকম বাঘ ভাল্লুকের সামনে পাঠাতে আমাদের কি যে কষ্ট হোত। কিন্তু এ যে সংগ্রাম—কঠোর সংগ্রাম। একদিকে নিরস্ত্র ভারতবাসী—অন্য দিকে প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশের কামান বন্দুক ও পুলিশ বাহিনী।

একদিন বেথুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। একজন ছাত্রী কর্ম্মী শ্রীমতী ইলা সেন এসে খবর দিলেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে নাকি সেদিন সত্যাগ্রহীদের ওপর গুলী

ছোঁড়া হবে। সেই ছোট ছোট ভাইগুলিকে গুলি করে মারবে। আমরা হেঁটেই ছুটলাম সেদিকে। তার কিছুদিন আগে একটি ছেলেকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে লরীতে করে কোথায় যে নিয়ে গিয়েছিল, কোন হাসপাতালে—ওকে খোঁজ করে পাওয়া যায় নি। ছেলেটী এসেছিল একটি গ্রাম থেকে—সহরে আত্মাহুতি দিতে। নামহীন যশহীন ভাগ্যহীন—পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। এদেরও হয়তো অমনি ভাবে সরিয়ে ফেলবে। অন্ততঃ এইটুকু ওরা জানুক মরবার আগে যে ওদের কাজে গৌরব করার জন্য আমরা আছি—চোখের জল ফেলবার জন্য আমরা আছি।

সেখানে গিয়েই দেখি পাঁচটী ছেলে বন্দেমাতরং বলে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে। আমরা সবাই তাদের ঘিরে দাঁড়ালাম। সার্জ্জেণ্টগুলি তাদের আমাদের থেকে টেনে বার করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল। আমাদের চুলের মুঠি ধরে টানাটানি করছে—ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ এমনি করে তারা চুপ হয়ে গেল। সেদিন সেই ছাত্ররা শুধু বন্দী হল। অবিশ্যি থানায় নিয়ে গিয়েও ওদের ওপর এইরকম অত্যাচার করা হোত বলেও শুনেছিলাম।

শচীন বাবুরা আগেই ধরা পড়ে জেলে গেছেন। নিখিল বঙ্গ ছাত্র সঙ্ঘের সম্পাদক বীরেণ বাবুর নামে পরোয়ানা বার হওয়াতে তিনি গোপনে কাজ করছেন। তাঁর স্থানে অস্থায়ী সেক্রেটারী হয়ে কাজ করতে হল কিছুদিন। ওদিকে প্রাদেশিক ছাত্র সঙ্ঘের অবিনাশ বাবুরাও ধরা পড়েছেন।

সারাদিন পিকেটিং ইত্যাদি করে মাঝে মাঝে রাত্রে আমরা যেতাম সেই কুলিদের বস্তিতে, যারা বিলাতি কাপড়ের বোঝা ষ্টীমার থেকে নামায় বা দোকানে পৌঁছে দেয়। কুলিদের সর্দ্দারদের সঙ্গে দেখা করতে হলে অনেক রাত্রে যেতে হয়। অরুণাংশু বাবুরা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। ফিরতে রাত একটা কি তুটো হত। বন্ধুর বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে দাদার বরানগরের বাড়ীতে গিয়েছিলাম।

আন্দোলন যখন খুব জোরে আরম্ভ হল ঠিক সেই সময়ে মেদিনীপুরের কয়েকটী কর্ম্মী এসে অনুরোধ করলেন যে মেদিনীপুরে যেভাবে পুলিশের অত্যাচার চলছে তাতে মেয়েরা যেন ভীত হয়ে না পড়েন সেই কথা বোঝাবার জন্য আমাদের সেখানে যাওয়া দরকার। বাল্যবন্ধু সুলতা ও লাবণ্য মাসীমার সঙ্গে তমলুক যাত্রা করলাম।

গিয়ে দেখি সেটা যেন একটা স্বপনপুরীর দেশ। ছেলে মেয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই যেন নির্ভিক সৈনিক। যে বাড়ীতে উঠেছিলাম তার সামনেই উঁচু নারিকেল গাছ। পতাকা উড়িয়েছে স্বেচ্ছা সেবকরা। সার্জ্জেণ্টরা বুট জুতা পরে আসতে পারছে না—পা কাদায় আটকে যাচ্ছে। অনেক কষ্ট করে গাছে উঠে পতাকা নাবাতে নাবাতে ছেলেরা অন্য গাছে পতাকা তুলে ফেলছে। সন্ধ্যাবেলা একটি গৃহে মহিলাদের একত্র করা হলে আমরা তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে লাগলাম। স্বেচ্ছা সেবকরা এসে খবর দিলেন যে আমাদের নামে পরওয়ানা বার হয়ে গেছে—পুলিশ

আমাদের খুঁজছে। আমরা সভা শেষ করে মহিলাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম অন্য পাড়ায়। পুকুরের পাশ দিয়ে অন্ধকার রাত্রে ধীরে ধীরে চলে গেলাম অন্যত্র। সেখানে একটি গৃহে গোপন সভা হল। অত রাত্রে কেমন করে সকলকে খবর দিয়ে অত শীঘ্র একত্র করা হোল ভাবলেই বড় আশ্চর্য্য মনে হয়। ইতি মধ্যে প্রথম আশ্রয় গৃহটী পুলিশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে বলে খবর পেলাম। দ্বিতীয় স্থানটাও কিছুক্ষণ পরে ছেড়ে চলে যেতে হল। সারারাত্রি এমনি ভাবে ঘুরে ঘুরে ভোরবেলার ট্রেণ ধরে কলকাতায় চলে গেলাম। পুলিশ নাকি পরের দিনও আমাদের খুঁজেছিল। পরে কলকাতায় ফিরে গেছি শুনে নিশ্চিন্ত হল।

## নারী সত্যাগ্রহ কমিটি—

এই সময় বাংলার মহিলা কর্ম্মীরা মিলে একটি নারী সত্যাগ্রহ কমিটি গঠিত করলেন। বিমলদি ও শান্তিদিরাই উদ্যোগী হয়ে এই দলটী গড়েছেন। প্রতিদিনই খুব বড় সভা বা শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হোত। আমাদের মহিলাদের পরিচালিত শেভাযাত্রায় পুরুষদের ওপর ভীষণভাবে লাঠি চালনা করা হোত। আমরা হয়তো বেঁচে যেতাম লাঠির হাত থেকে। কিন্তু চোখের সামনে পুরুষদের মারতে দেখে শরীর কেঁপে উঠত। মাঝে মাঝে শোভাযাত্রার পথে পুলিশ বাহিনী দাঁড় করিয়ে আমাদের গতিরোধ করা হোত।

প্রায় রোজই একজন দুজন করে ধরা পড়তে লাগলেন। জ্যোতির্ম্ময়ীদি, মোহিনী দেবী প্রভৃতি অনেকে ধরা পড়লেন। একদিন কজন সত্যাগ্রহী মিলে বড়বাজারের বিলিতি কাপড়ের দোকানগুলিতে পিকেটিং করছি। এমন সময় একজন মহিলা এসে খবর দিলেন শ্রীদীনেশ চন্দ্র মজুমদার ও শ্রীঅনুজা সেনগুপ্ত টেগার্টকে মারতে গিয়ে ডালহাউসি স্কোয়ারে ধরা পড়েছেন। অনুজা বাবু—টেগার্ট সাহেবের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু ওঁদের দুজনের কারুরই গুলি টেগার্টের গায়ে লাগতে পারেনি। অনুজা বাবু সেইখানেই মারা গিয়েছেন।

মনে পড়ে গেল কিছুদিন আগেকার কথা। কলকাতায় যখন সাইমন কমিশন এসেছিল এবং সমস্ত দেশ তাদের বয়কট করেছিলেন—বেথুনে এই নিয়ে বড় গোলমাল হয়। বেথুন বোর্ডিংএর মেয়েদের ওপর খুব শাসন চলছিল কলেজের ক্লাসে যোগ দেবার জন্য। দীনেশ বাবু তিনতলায় থাকতেন আমরা ছিলাম সেই বাড়ীর দোতলায়। নানা দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে ও তাঁর বাড়ীর সকলের সঙ্গে আমাদের বাড়ীর প্রত্যেকেরই একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সাইমন কমিশন বয়কটের সময় বেথুনে বীণা আরও কয়েকজনের সঙ্গে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল। অনুজা বাবু আনন্দ বাজারের তরফ থেকে সব খবর নিতে চাইলেন আমাদের কাছ থেকে। দীনেশবাবু সঙ্গে করে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দুজনারি কি শান্ত স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি।

দেখলেই বুঝতে পারা যেত যেন এঁরা এক বিশেষ ধাতুতে তৈরী, বিশেষ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রশ্ন করা শেষ হলে—ধীরে ধীরে নমস্কার করে ওঁরা চলে গেলেন। অনুজা বাবুকে আর দেখতে পাইনি। কিন্তু দীনেশ বাবু কদিন মাত্র আগেও একদিন দেখা করে গেলেন।

কি বলতে চেয়েছিলেন—কি বলতে পারলেন না। সমস্ত কথা অব্যক্ত রেখেই সেদিন চলে গিয়েছিলেন। পৃথিবীতে আর হয়তো দেখা না হতে পারে—সে কথাটি পর্য্যন্ত বলতে পারেন নি। বিপ্লবী দলে যে সব কথা সবাইকে বিনা প্রয়োজনে বলা চলে না। কাজ করতে হবে ঠিক যতখানি করা দরকার। জানতে হবে বা জানাতে হবে ঠিক যতটুকু দরকার। কোন অভিমানের স্থান নেই—কোন বন্ধুত্ব বা স্নেহের দাবী নেই। শুধু কর্ত্তব্য—কঠিন কর্ত্তব্য।

অসহযোগ আন্দোলনে মেয়েদের নাবিয়ে আনার দায়িত্ব ছিল আমাদের ওপর। মেয়েদেরও এই স্বাধীনতার সংগ্রামে পূর্ণ অংশ নিতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় সভা করি আর মহিলা সত্যাগ্রহীর নাম সংগ্রহ করি। এক দিন বন্ধু শোভারাণী এসে জানালেন—আমাদের ঘুরে ঘুরে স্বেচ্ছাসেবিকা সংগ্রহ করতে হয়—সভার আয়োজন করতে হয়। সুভাষবাবুর একটি ছোট মোটর পড়ে আছে—সেইটা আমাদের কাজের জন্য পাওয়া গেছে। আনন্দে যেন দিশেহারা হয়ে উঠলাম। পা যেন আর চলতে পারছিল না। মোটরে চড়তে পাব মাঝে মাঝে—কি ভাল যে হল আমাদের।

এ সব কাজের জন্য ড্রাইভার পাওয়াও শক্ত। তাদেরও গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা থাকে। একটি ছাত্র মোটর চালাতে জানতেন। তিনিই চালাবেন স্থির হল।

প্রথম দিন কিছুক্ষণ ঘুরে একবার মনে হল--মা বাবাকে একটু দেখে যাই। বাড়ীতে এসে ওপরে যাবার পর মা'র সঙ্গে গল্প করলাম—প্রাণ যেন তাঁর আকুল হয়ে উঠেছে মেয়েকে কাছে পাবার জন্য। কিন্তু কাজ বন্ধ করে তাঁর কাছে আসি সে অনুরোধও করলেন না। বাবা আদর করে বিদায় দেবার সময় জানতে চাইলেন গাড়ীটা কার—কোথা থেকে পেলাম। বললাম সুভাষবাবুর গাড়ী ব্যবহারের জন্য পেয়েছি। ভাবলাম বাবা শুনে খুব খুসী হবেন। সুভাষবাবু যে তাঁর বড় প্রিয়। বাবা শুধু বললেন—"অন্য সব কর্ম্মীরা যে হেঁটে হেঁটে কাজ করছে তুমি কেন পারবে না? তাছাড়া মোটরে কাজ করলে অন্যদের চেয়ে নিজেকে বেশী বড় মনে হতে পারে। মনের ভেতর এই আত্মাভিমানকে আসবার সুযোগ দিওনা। এ গাড়ী ফিরিয়ে দিও।" লজ্জায় সেদিন আর বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারিনি। মনে পড়ে গেল আর এক দিনের কথা। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বালিগঞ্জের ষ্টেশনে নেবেছি, বাড়ীতে একটু বিশ্রাম নেব। তারপর মার সঙ্গে যাব—তাঁর বাবার মৃত্যুদিন উপলক্ষে উপাসনায় যোগ দিতে। মা বড্ড করে বলে দিয়েছিলেন যাবার সময়। সেইদিনই সকালে বাবা শুনতে পেয়েছিলেন এক জনকে বলেছি সন্ধ্যাবেলায় তাঁর সঙ্গে এক জায়গায় যাব।

ষ্টেশনে নেবেই দেখি বাবা দাঁড়িয়ে। হাত বাড়িয়ে আমার হাতের বইগুলি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, যেখানে যাব বলেছিলাম—সেখানে গিয়েছিলাম কিনা বা কিছু জানাতে পেরেছিলাম কিনা। তাঁকে জানাতে পারিনি—অথচ মার সঙ্গে না গেলে মা কষ্ট পাবেন বলাতে, বাবা বললেন—"তুমি এখান থেকেই পরের ট্রেণে ফিরে যাও। আমি বাড়ী যাচ্ছি তোমার মাকে বুঝিয়ে বলব। মা যে তোমার মা—তিনি সব বুঝতে পারবেন।" সারাদিন খাওয়াও হয়নি। চলে গেলাম পরের ট্রেণে। রাত্রে ফেরবার পর বাবা তাঁর স্নেহের হাত মাথায় বুলিয়ে বললেন—"বাবা তোমার বড় নিষ্ঠুর না? দেশের কাজে যখন নেবেছ কর্ত্তব্যে কোন ত্রুটি যেন না থাকে বাবাকে যে সেটাও দেখতে হয়।" বাবা আর একদিন বলেছিলেন—"দেশের কাজ যদি করতে চাও পেছনে থেকে কাজ কর। তাহলে নিজেকে বড় মনে করবার সুযোগ পাবে না।" তাই বাবা যে আমার মোটরে চড়ে কাজ করা আর অন্য কর্ম্মীরা হেঁটে করবে—সেটা পছন্দ করবেন না একথাটা আমার বোঝা উচিৎ ছিল। দাদার বরানগরের বাড়ীতে মোটরটা নিয়ে গিয়ে গ্যারেজে বন্ধ করে রাখলাম। আবার বার করলাম কলকাতা ছেড়ে যাবার সময় শোভারাণীর বাড়ীতে রেখে আসবার জন্য। কিছুদিন হল রোজ বিকেলে জ্বর হচ্ছিল। মাথায় এক অসহ্য যাতনা। দাদা ও ভ্রাতৃসম বড় ভগ্নীপতি পরামর্শ করে স্থির করলেন দু'এক মাসের জন্য আমাকে সেকেন্দ্রাবাদে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবেন।

শোভারাণীর বাড়ী মোটরটি রেখে বাড়ীতে এসে বাবার সঙ্গে ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করলাম। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ নাকি খবর পেলেন পলাতক আসামী শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্তকে আমি শোভারাণীর বাড়ী থেকে এনে নিজের বাড়ীতে রেখেছি। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট যিনি বাংলার বিপ্লবীদের সমস্ত কার্য্যকলাপ খুব ভাল ভাবে জানতেন—যাঁর মৃত্যু বৈপ্লবিক দলের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করে তাকে মারতে গিয়ে প্রাণ দিলেন—অনুজা বাবু, দীনেশ বাবু, দীনেশ গুপ্ত, সুধীর বাবু প্রভৃতি। সেদিন কতকগুলি লরী ভরে সার্জ্জেণ্ট আনা হয়েছিল। তারা বাড়ীর চারিদিকের দেওয়াল বেয়নেট দিয়ে যেন ভেঙ্গে ফেলতে আরম্ভ করল। মিঃ টেগার্ট ওপরে উঠবার সময় বীণার কাছ থেকে বাধা পেলেন। টেগার্ট বললেন যে তিনি কল্যাণী দাশকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। বীণা বললেন তিনি নেই ষ্টেশনে গেছেন। টেগার্ট বললেন তিনি গৃহতল্লাসী করতে চান। বীণা বললেন, গৃহকর্ত্তা উপস্থিত না হলে তল্লাসী করতে দিতে পারেন না। তাছাড়া তল্লাসী করবার জন্য ওয়ারেণ্টের প্রয়োজন। টেগার্ট বললেন—তিনি নিজে পুলিশ কমিশনার তাঁর ওয়ারেণ্টের দরকার হয় না। বীণা বললেন—"আমরা কেমন করে জানব আপনি পুলিশ কমিশনার এবং তার প্রমাণ কি? তখন মিঃ টেগার্ট নিরুপায় হয়ে নীচে বাবা ফিরে আসা অবধি অপেক্ষা করে রইলেন। বাবার কাছ থেকে বিজ্ঞপ্তি নিয়ে যাবার সময়

বলে গেলেন—"মিঃ দাশ তোমাকে আমি তোমার শিক্ষিতা পুত্রবধূ ও সাহসী কন্যার জন্য অভিবাদন জানাচ্ছি।"

## ১৯৩২ সালের আন্দোলন—

১৯৩০এর আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হয়েছিল কয়েক মাসের জন্য। আবার আরম্ভ হল ১৯৩২ সনে। ১৯৩০এর আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়েছিল বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব। একদিন দেশবাসী চমৎকৃত হয়ে শুনল—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছে প্রায় একশত বিপ্লবী বাঙ্গালী ছেলে। অল্প কিছু রিভলবার নিয়ে গিয়ে তারির সাহায্যে—প্রহরীদের নিহত করে—অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে চলে যায়।

বিপ্লবীরা টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে কয়েকদিনের জন্য হলেও তাকে ইংরাজ শাসন থেকে মুক্ত করেছিল। ইংরাজ রমণীরা ছেলেমেয়ে নিয়ে নৌকায় গিয়ে বাস করতে লাগলেন। বিদেশ থেকে সৈন্য না আসা পর্য্যন্ত বিপ্লবীদের হাতে চট্টগ্রামের দায়িত্ব এসে পড়ে। তারপর একদল বিপ্লবী চট্টগ্রাম পাহাড়ে উঠে ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করেন বন্দুকের শেষ গুলিটা ফুরিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত। বহু বিপ্লবী যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেন। একই দিনে একই ধারায় বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় এইরূপ সশস্ত্র বিপ্লব আরম্ভ হবার কথা ছিল। কিন্তু

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বাংলার পুলিশ প্রকাণ্ড জাল ফেলে প্রত্যেকটি জেলার প্রতিটি কর্ম্মীকে বন্দী করে ফেললেন।

চট্টগ্রামের পলাতক কর্ম্মীরা ধরা পড়তে লাগলেন। অস্ত্রাগার মামলা আরম্ভ হল। চন্দননগরে লোকনাথ বাবুরা আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। বন্ধু সুহাসিনী বাঙ্গালী বধূ সেজে ওদের আত্মীয়া হয়ে সেখানে ছিলেন। টেগার্ট নিজে খবর পেয়ে ওদের ধরতে গেলেন। একটি ছেলেকে গুলি করে মেরে—সুহাসিনীকে বুট জুতা দিয়ে লাথি মেরে ছিলেন। সুহাসিনী টেগার্টের বিরুদ্ধে নালিশ করেও পরে টাকার অভাবে মামলা তুলে নিতে বাধ্য হলেন।

শান্তি, সুনীতি কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার ব্যাপারে ধরা পড়লেন। বীণা কনভোকেশন হলে বাংলার গভর্ণরের ওপর গুলি চালাতে গিয়ে ধরা পড়লেন। কল্পনা চট্টগ্রামে কিছুদিন সূর্য্য সেনদের সঙ্গে পলাতক হিসাবে ঘুরে ঘুরে কাজ করে শেষে ধরা পড়ে দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হলেন। উজ্জ্বলা দার্জিলিংএ লিবং হত্যার মামলায় ধরা পড়ে ১৪ বছর জেল মাথায় নিলেন। চট্টগ্রামে এক ইংরাজদের ক্লাব আক্রমণ করে প্রীতি ওয়াদ্দার নিহত হন। কল্পনাকে ধরার পর দড়ি দিয়ে বেঁধে সমস্ত সহর ঘুরিয়ে ছিল। শান্তিদের সরকারী আর্দ্দালী প্রকাণ্ড লাঠি দিয়ে ক্রমাগত মারতে আরম্ভ করেছিল। ঢাকায় লীলাদি রেণু, কলকাতায় কমলা সুহাসিনী প্রভৃতি রাজবন্দিনী হয়ে হিজলী গেলেন। বিমল প্রতিভা দেবী একটি ডাকাতির মামলায় ধরা পড়ে—পরে রাজবন্দীণী হলেন। তাঁর গৃহতল্লাসী

করে সহস্রাধিক এলবাম যাতে ছিল চট্টগ্রামের বীরেদের ছবি সবই পুলিশ গরুর গাড়ী করে নিয়ে চলে যায়।

আগে ওদিকে পাঞ্জাবে ভগৎ সিংদের ফাঁসি হয়ে গেছে। ১৯২৯ এর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেবের প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। দেশব্যাপী প্রতিবাদ জানান সত্বেও সরকার ফাঁসী বন্ধ করলেন না। যতীন দাশ বটুকেশ্বর দত্ত প্রভৃতি কয়জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল।

বাংলাদেশে ঢাকায় কালিপদর ফাঁসী হল। চট্টগ্রামে আমানুল্লা হত্যার মামলায় হরিপদ ভট্টাচার্য্য ধরা পড়েন। তাঁর চোখের সামনে। তাঁর বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হল—বৃদ্ধ পিতাকে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে প্রহার করা হল। ওকেও এমন ভাবে মারা হয়েছিল যে ওর একটি চোখই নাকি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

চারিদিকে শুধু গ্রেপ্তার অত্যাচার ও ফাঁসি। গ্রামে ও জেলায় এমন গৃহ নেই যেখানে একজন না একজন ধরা পড়েছেন। শুধু চট্টগ্রামেই প্রায় বাইশ হাজার পুরুষের ওপর অন্তরীণ বা নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়া হল। মেদিনীপুরে ক্রমান্বয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার চেষ্টা হল। ১৮ বছরের প্রদ্যোৎ কুমারেরও ফাঁসী হয়ে গেল।

বিলাতে গোলটেবিলের আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার আইন অমান্য সুরু হয়ে গেল। আন্দোলন আরম্ভ হতেই এবার জেলে চলে গেলাম। বাইরে থেকে

কাজ করলে বেঙ্গল ক্রিমিনেল এমেণ্ডমেন্ট এক্টের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব। তার চেয়ে অসহযোগী-দের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে এলে অনেক সুবিধা।

অনেকের সঙ্গে পরিচয় হবে—কার ভেতরে বিপ্লবের বীজ গুপ্ত আছে তারও পরিচয় হতে পারবে। জেলে যাবার কদিন আগে—যেখানে যাই, মোটরে করে কজন ভদ্রলোক শ্রেণীর ব্যক্তি সামনে এসে দাঁড়ান—মোটরে উঠিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। কদিন এই রকম লক্ষ্য করে এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পেলাম না। একদিন হাজরা পার্কে সভা ডেকে সরকারের আইন ভাঙ্গতে চাইলাম। পার্কে ঢুকতে না পেরে রাস্তাতেই সভা করলাম, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে ভবানীপুর থানায় নিয়ে গেল। ভবানীপুর থানা থেকে কিছুদিন লালবাজার থানায় রেখে পরে প্রেসি-ডেন্সি জেলে পাঠিয়ে ছিল। বিচারে আমাদের আট মাস কারাবাসের শাস্তি হল।

নানা জেল ঘুরে ও বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ১৯৩২ সনের শেষে মুক্তি পেয়ে বাড়ী এলাম। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম দীনেশ মজুমদার, সুশীল দাশগুপ্ত ও শচীন কর মেদিনীপুরের জেলের বিরাট প্রাচীর অতিক্রম করে বাইরে চলে এসেছেন, পরিচালকহীন বিপ্লবীদলকে আবার বাঁচিয়ে তোলবার সঙ্কল্প নিয়ে। তাঁদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা সবাই মিলে করা হল। কত মেয়ে যে তাঁদের আশ্রয় দিয়ে রাখল। একা পুরুষরা থাকলে পুলিশ সন্দেহ করতে পারে। তাই

কেউ বোন হয়ে তাঁদের ভাই করে রাখল—কেউবা বৌদিদি হয়ে আশ্রয় দান করল। কিছুদিন পুরুলিয়ায় কাটিয়ে এসে শেষে চন্দননগরে তাঁরা আস্তানা গড়ে তুললেন। চন্দননগরকে কেন্দ্র করে চারিদিকে যোগসূত্র ছড়িয়ে ফেললেন। সমস্ত জেলার কর্ম্মীদের সঙ্গে দেখা করে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। রাত্রে গোপন সভা বসত, কোন দিন এক গৃহে—কোন দিন অন্য গৃহে।

কোন কোন বাড়ীর মেয়েরা বুঝতেন পলাতক আসামী, কিন্তু কে তিনি তা জানতেন না। কোন দিন আমাদের থেকে জানবারও চেষ্টা করতেন না। মাতৃস্নেহ, ভগ্নিপ্রীতি দিয়ে কদিনের অতিথির জীবনকে সিক্ত করে রাখতেন। আমাদের কত রকম ভিন্ন ভিন্ন সাজে নিয়ে যেতে হোত ঐ পলাতক বন্দীদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের মস্তকাবরণের সাহায্যে কত কিছু যে সম্ভব হোত।

কিছুদিন পরে চন্দননগরের আশ্রয় ছেড়ে তাঁদের চলে আসতে হল কলকাতায়। একদিন চন্দননগরে কয়েকজন পলাতক মিলে নিজেদের ভেতর খেলা করছিলেন—কার হাতের জোর বেশী।

এমন সময় তাঁদের মধ্যে একজন দূর থেকে পুলিশ আসতে দেখে বলে উঠলেন—এবার প্রমাণ হোক কার হাতে বেশী জোর। বিপ্লবীরা কখনও বিনা যুদ্ধে ধরা দেন না। শেষ অবধি লড়াই করে, হয় জয়, নয় পরাজয়কে মাথায় করে নেন।

ওঁরাও সবাই ছুটলেন—পেছনে বন্দুক ছুড়তে ছুড়তে। দীনেশ বাবুর কাছে শুনেছি—হঠাৎ পেছনে ফিরে দেখেন—মনসাগাছের জঙ্গলে সহকর্ম্মী একজন পড়ে গেছেন। মুহূর্ত্তের জন্য ভ্রাতৃস্নেহ, বন্ধুপ্রীতি জেগে উঠে চাইল একবার গিয়ে ওকে তুলে নিতে। কিন্তু কর্ত্তব্য তাঁকে সে দুর্ব্বলতাকে মনে স্থান দিতে দিল না। বাঁচব—পালিয়ে বেড়াব—তৃষ্ণা ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই করব—তবুত বিপ্লবকে বাঁচাতে পারব। তার জন্যই'ত জেলের ঐ লৌহ প্রাচীর ভেঙ্গে বাহিরে আসা।

সহকর্ম্মীরা একে একে ধরা পড়ে গেলেন। সুশীল বাবুও কিছুদিন পরে এক আত্মীয়ের হাতে ধরা পড়লেন।

( ইনি ১৯৪৭ এ শচীন বাবুদের সঙ্গে হিন্দু মুশলমান মিলন চেষ্টায় নিহত হয়েছিলেন )

দীনেশ বাবুকে তিন চার দিন আস্তাবলে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। কোনদিন একটু শুকনো ছোলা, কোনদিন শুধু একটু জল—এই খেয়েই দিন কাটিয়েছেন। অনেক কষ্টে কলকাতায় এসে পৌছলেন। একজন বিপ্লবীদলের কর্ম্মী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে একটি বাড়ী ভাড়া করে দীনেশ বাবুকে আশ্রয় দিয়ে রাখলেন। তখন অর্থাভাব বড় কঠিন মূর্ত্তিতে দেখা দিল। কেউ আর কোন দিক দিয়ে সাহায্য করতে চায় না—বাড়ী ভাড়া দিতে চায় না। সবাই কেমন আতঙ্ক-গ্রস্থ। তাঁর দাদা, ভাইকে সাহায্য করতে এসে কলকাতায় থাকবার স্থান পান না। আবার ফিরে যেতে হয়। আমরা কজন বন্ধু মিলে কাজের অবসরে গৃহ শিক্ষকতার ভার

নিলাম। পরিচয় পেলে কেউ আর রাখতে সাহস পান না। আজ যে বাড়ীতে কাজ ঠিক করি—কদিন পরে পুলিশ গিয়ে গৃহকর্ত্তাকে সাবধান করিয়ে ভয় দেখিয়ে আসে।

কিছুদিন পরে সুনীল বাবুও ধরা পড়ে গেলেন। বিচারে সুনীল বাবুর যাবজ্জীবন জেল হল।

এরপর একদিন ধরা পড়ল দীনেশ বাবুর বিকেল হলেই জ্বর হয়। সেই সময়ে গেলেই দেখা যেত—জ্বরে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে শুয়ে আছেন। মাথার কাছে সাগুর বাটি পড়ে রয়েছে—উঠে বসে খাবারও ক্ষমতা নেই। অনাহার ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে।

তাঁর জন্য একটু দুধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একদিন আমাদের বললেন—"আমার মতন সকলেরি জন্য কি দুধের ব্যবস্থা করতে পারবেন—তা যখন পারবেন না—আমার দুধও বন্ধ করে দেবেন।" খবর নিয়ে জেনেছিলাম একদিনও তাঁকে দুধ খাওয়ান যায়নি। আর একদিন বললেন—সকলের মামলা চালানর যদি সম্ভব না হয় আমি ধরা পড়লেও যেন কিছু করা না হয়। তাছাড়া এবারে আমায় বাঁচাতে পারবেন না। দ্বীপান্তরের আসামী আমি—পালিয়ে এসেছি—আমরা'ত এমনি ধরা দেব না—যতক্ষণ সম্ভব যুদ্ধ করে তবে মরব বা ধরা দেব।

সেই অসুস্থ শরীর নিয়েই রাত্রে উঠে গুপ্ত সভা করতেন। আইন অমান্য আন্দোলন তখন বন্ধ—বিপ্লব সমিতিগুলি মাথা তুলে আর দাঁড়াতে পারছে না। বেশী ভাগ নেতা ও

কর্ম্মী তখন জেলে বা অন্তরীণে। অল্প কয়েকজন যারা বাইরে আছেন—তাঁদের কে কোথায় সব বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। যে কোন সময়ে তাঁরাও বন্দী হয়ে যেতে পারেন। চারিদিকে যেন বড় এক অবসাদের ছায়া।

এই অবস্থার ভেতরে সকলের সঙ্গে যোগসূত্র আবার গেঁথে তোলা খুবই কঠিন কাজ। সমস্ত রাত্রি জেগে পরামর্শ চলত—কাজের ব্যবস্থা চলত। একটু বিশ্রামের কথা বললে বলতেন—একেবারেই'ত বিশ্রাম নিতে হবে। এমনি করে মৃত্যুর সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে কাজ করে চললেন ফুরিয়ে আশা জীবনখানি নিয়ে। শরীরে অত যন্ত্রণার ভেতর মুখে শুধু হাসি—কোন শ্রান্তিই যেন নেই। সবাই বুঝতাম মৃত্যু পথের যাত্রী—দিন যে শেষ হয়ে আসছে। কোনদিন ডাক্তার দেখান সম্ভব হয়নি, যদি তিনি বুঝতে পেরে ক্ষতি করে দেন। বিপ্লবীর জীবন কুসুমের চেয়েও মৃদু—বজ্রের চেয়েও কঠিন। দুটোই দেখেছি তাঁর চরিত্রে। তারপর মাস খানেকের জন্য ভগ্নস্বাস্থ্য মা বাবাকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে গেছি। একদিন বাবা এসে বললেন—কাগজে বের হয়েছে কাল রাত্রে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে আমাদের দীনেশ ধরা পড়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে দুই পক্ষের গুলি চলেছে—তারপর গুলি শেষ হলে দীনেশকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। সঙ্গে জগদানন্দ বাবু ছিলেন—নলিনী বাবু ছিলেন—তাঁরাও ধরা পড়েছেন। জগদানন্দ বাবুর পরে দ্বীপান্তর হয়েছিল।

বাবার দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর চোখেও সেদিন জল। বাবাকে আগে কতদিন বলতে শুনেছি—ঐ দীনেশের জন্যই মেয়েরা আমার ঐ পথে গেছে। যার জন্য মেয়েরা তাঁর কত দূরে চলে গেছে—তারি জন্যই আজ চোখের জল ফেলছেন।

পৃথিবীতে কত কিছুই না সম্ভব হয়।

কলকাতায় ফিরে এসে যে সব বন্ধুরা বোন সেজে আত্মীয়া সেজে তাঁকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল—তাদের আকুল ভাবে কাঁদতে দেখে মনে হয়েছিল সত্যি-কারের বোনেরা আর কত বেশী কাঁদতে পারত এদের চেয়ে? মানুষের এই প্রীতি ও শ্রদ্ধা—এইত বিপ্লবীর জীবনেব সব চেয়ে বড় পাথেয়। এইত তাঁদের ত্যাগের চরম পুরস্কার—সব চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ। নয়তো জীবন-ভোর সাধনার ফল দেখে যেতে পেরেছেন কজন বিপ্লবী?

আমায় যখন ডায়সেসান কলেজের রিভলভার প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করল দীনেশ বাবুর তখন বিচার চলছে। আমাদের দিক থেকে কোন কিছু করা সম্ভব হয়নি। তাঁর দাদা এসেই সব মামলা চালালেন। মাকে দিয়ে শেষ অবধি প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন ও করালেন। কিন্তু প্রাণদণ্ড রহিত করা গেল না। সি আই ডি অফিসেও শুনেছিলাম—"This time, he has to die"

হিজলী জেলে আমরা কিছুই খবর পেতাম না। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে শুধু এইটুকু খবর পেয়েছিলাম।

একদিন বীণা, কমলা, সুহাসিনী, আমি বসে আছি—একজন জেল কর্ম্মচারী এসে খবর দিলেন—"আজ ভোর রাত্রে দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি হয়ে গেল। আরও আগে হবার কথা ছিল। তাঁর অসুখটা নাকি জেলে খুব বেড়েছিল। একটু সুস্থ হয়ে ওঠবার পরই ফাঁসি দেওয়া হোল।"

## বাংলার দুর্ভিক্ষ—

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পেছনে ত্যাগ করে যাবে—কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসন ধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে—তখন কী বিস্তীর্ণ পঙ্ক শয্যা দুর্ব্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।" রবীন্দ্রনাথ—জয়মণি!

তুমি এখন ঘুমিয়ে আছ। তোমায় আজ বড় দুঃখের গল্প বলব। এগুলি গল্প নয়—একেবারে সত্য ঘটনা। তোমার মা নিজে শুনেছে ও দেখেছে।

তোমায় যখন কোলে নিয়ে বসে বসে দুধ খাওয়াই—ভাত খাওয়াই, অনেকদিনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই সব মায়েদের মুখগুলি যাদের বুকে ঠিক তোমারি মতন ছোট শিশুরা এক ফোঁটা দুধের অভাবে শুকিয়ে মারা গেছে। মায়েরা নিজেরাই খেতে পারেনি—বুকের দুধ

তাই শুকিয়ে গেছে। শিশুরা দেখেছি মার বুক থেকে দুধ পাবার জন্য আকুল ভাবে চেষ্টা করছে। তারপর চিৎকার করে করে নিঝুম হয়ে শেষে মার'ই বুকে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ফেলছে। মা হয়তো একবার চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে। তারপর রাস্তার কোন বাড়ীর সামনে ফেলে রেখে আবার চলেছে দলের সঙ্গে "ভিক্ষা দাও মা, একটু ফ্যান দাও মা।" কত মাকে শুনেছি—ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অল্প কয়েকটি পয়সার জন্য সন্তানকে বিক্রী করে দিয়েছে আর একজনের কাছে। যে কিনেছে সে তাকে নিয়ে শুধু ভিক্ষা করে বেড়িয়েছে—খেতে দেয়নি এক দিনের জন্যও। তাকে বুকে নিয়ে নিজে বসে লঙ্গড়খানায় খেয়েছে—তারপর তার শেষ কান্না থেমে গেলে—মাটিতে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে।

কতবার মনে পড়ে সেই গ্রামের মাঠ দিয়ে যেতে যেতে দুপাশে পড়ে রয়েছে অসংখ্য শুধু না খেতে পেয়ে মরা শিশুর মৃত দেহ। সেই সময় রিলিফের কাজ ঘুরে ঘুরে বহু জীবন্ত কঙ্কাল দেখেছি—মৃতদেহ দেখেছি। কিন্তু আজও শিশুর মুখে সেই ঘনায়মান মৃত্যুর ছায়া বা অনাহার ক্লিষ্ট মৃত শিশুর মুখখানি মনে পড়ে কি যে ব্যথায় ভরে যায় সমস্ত অন্তরটা—সে কথা বোঝাব কাকে? মনে হয় মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোন দিন এ বেদনা ভরা স্মৃতি ভুলতে পারবনা। বাংলাদেশে যারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করে ছিল, যাতে অসহায় নিষ্পাপ শিশুরাও তিলে তিলে শুকিয়ে মারা গিয়েছিল—

তাদের বোধ হয় পৃথিবীর কেহই ক্ষমা করতে পারবেনা। ভগবানকেও কবির ভাষা দিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে—

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু—নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ—তুমি কি বেসেছ ভাল ?"

অনাবৃষ্টির ফসল ফলল না—অতি বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়ে গেল। প্রকৃতির বিরোধিতায় মানুষের খাদ্যাভাব হল—মানুষ অনাহারে প্রাণত্যাগ করল। তার ভেতর অনেক বেদনা থাকলেও তাতে জ্বালা নেই। কিন্তু দেশে খাদ্য ছিল—সরকারী গুদামে সে সব পচে গেল—পুকুরে ফেলে দেওয়া হল—পুড়িয়ে দেওয়া হল। বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করা হল না। তাতে বর্ম্মার চালের অভাব মেটান যেত অনায়াসেই। তখনকার অখণ্ডিত ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ থেকে খাদ্য এনে সঙ্কটত্রাণ করা খুবই সহজ ছিল। সরকার বললেন যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে বেশীভাগ যানবাহন নিযুক্ত। দেশবাসীর প্রাণ বাঁচানর কাজে তাই তাদের পাওয়া যাবে না। অথচ গ্রীসে যখন খাদ্যাভাব হল—এমেরিকা থেকে প্লেনে করে সেখানে খাদ্য বিতরণ করে আসা হয়েছে। তাদের দেশের দুর্গতদের ছবি কত বড় করে ইংরাজদের পত্রিকায় বার করা হয়েছে। কত সহজে সেখানে সঙ্কট দূর করা সম্ভব হল। বোম্বাই সহরেও দুধের প্রাদুর্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বাই সরকার আইন করে দিলেন—শিশু ও তাদের মায়েরা খুব অল্প দামে দুধ পাবে। কোন গৃহে বা রেস্তোরায় আইস ক্রিম প্রভৃতি তৈরী করার কাজে

দুধ খরচ করতে পারা যাবে না। অথচ মানুষ যখন হাজারে হাজারে অনাহারে মারা যাচ্ছে—কলকাতার দোকানে দোকানে কত দুধের তৈরী খাবার—রাস্তায় রাস্তায় আইস-ক্রিম। বাংলায় যে তখন ছিল জনগণের বিরোধী সরকার।

বাঙ্গালা দেশ স্বাধীনতা চেয়েছে—সমস্ত ভারতকে এই স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। বাঙ্গালী আইন অমান্য করেছে সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা করেছে। বাংলার মাটি রঞ্জিত করেছে আপন রক্ত দিয়ে। বাংলার সুভাষ—বিরাট জাতীয় সৈন্য বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেছেন ভারতের দিকে "চলো দিল্লী—চলো দিল্লী"

—তাই ইংরাজ সরকার তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন বাংলার জাগ্রত প্রাণ শক্তিকে টুঁটি চেপে মারবার জন্য। প্রত্যেক জেলায় খবর গেল—যে গ্রামে বা মহকুমায় বেশী রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিয়েছে সেখানে অত্যাচারের শকট চালাও বেশী জোরে। "বাঙ্গালীকে অর্দ্ধভুক্ত রাখ—অনাহারে রাখ—বস্ত্রহীন কর"। দুর্ব্বল কঙ্কালেরা বৃটিশ শক্তির সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি পাবে কোথায়? সুভাষ চন্দ্রকে শাস্তি দিতে হবে—তার দেশবাসীকে এই ভয়াবহ দুর্গতি ও মৃত্যুর সামনে নিয়ে এসে। তাহলে বিদ্রোহী আপনি এসে ধরা দেবে। দরিদ্র বাংলার বুক থেকে অন্ন সরিয়ে দাও—তাহলে মৃত্যু ভয়ে ভীত বাঙ্গালীরা দলে দলে যুদ্ধের সহায়তা করবে—সৈনিক হয়ে দেশ দেশান্তরে চলে যাবে। এই হল ১৩৪৯ এর মন্বন্তরের অন্য কয়েকটী কারণ।

এই বিষয়ে কত ভাল বই লেখা হয়েছে ও হবে। সেগুলি বড় হয়ে ভাল করে পড়লেই তোমার কাছে সব স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে। আমি শুধু তোমার ও তোমার যুগের ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য লিখে রাখছি বাংলার মন্বন্তরের কয়েকটী করুণ ঘটনা।

বোম্বাই সহরের আর্থার রোড জেলে বসে বসে অমৃত-বাজার পত্রিকার ছবি দেখছি। কলকাতার রাস্তার ওপরে দলে দলে বসে আছে—বুভুক্ষের দল। কলিকাতা মহানগরীতে তারা ছুটে এসেছে বহু দূর থেকে বহু মাইল হেঁটে—গ্রামে গ্রামে যে মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি দেখতে পেয়েছিল তারা—তারই হাত থেকে হয়তো বাঁচতে পারবে এই আশা বুকে নিয়ে। কিন্তু কোথায় সেখানে তাদের জন্য অন্ন? তাদের জীবনীশক্তি যে শেষ করেই এসেছে। তাই এখানে ওখানে খোলা লঙ্গরখানায় ২৪ ঘণ্টা পরে অল্প একটু খিচুড়ী খেতে পেয়েও তারা বাঁচতে পারল না। কিছুদিন মৃত্যুর সঙ্গে সামনা সামনি সংগ্রাম করে—তারা নগরীর দুধারের বৃহৎ অট্টালিকার সামনে মাটিতে পড়ে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ফেলে দিচ্ছে। কাগজে পড়ে ঠিক যেন সবটা বোঝা যাচ্ছে না। কলকাতায় ত ডাষ্টবিন থেকে খাবার খুঁজে খুঁজে খাচ্ছে—এমন দৃশ্য আগেই বহুবার দেখেছি। কলেজে যাবার সময় বাসে বসে বসে জানলা দিয়ে কুষ্টরোগীর হাতের ধাক্কা খেতে হয়েছে। তারাই কি মরছে—তাদেরি ছবি কি?

জেল থেকে মুক্তি পেয়েই বাংলা দেশে চলে গেলাম।

ষ্টেশন থেকে বাড়ী যাবার পথে দেখি—জীবন্ত কঙ্কাল একজন নয়—দলে দলে হেঁটে বেড়াচ্ছে—শিশু আছে মা আছে—সবই আছে তাদের মধ্যে। ফুটপাথে সারি সারি ওরা কারা শুয়ে আছে? ওরা নাকি ওদের শেষ অন্তিম শয্যায় বিশ্রাম লাভ করেছে। অন্য মানুষরা ত বেশ চলে যাচ্ছে পাশ কাটিয়ে! আবার হাসতে হাসতে গল্প করেও চলে যাচ্ছে! চলতে গিয়ে মরা মানুষের গায়ে পা লাগছে। তবে হাসছে কি করে? পথে পড়ে থাকা মৃতদেহ দেখতে দেখতে নাকি ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সিনেমার টিকিট করতে যে কিউ হয়—তার আশে পাশেও মৃতদেহ দেখা যায়। কর্পোরেশনের গাড়ী নাকি ওদের তুলে নিয়ে যেতে পারছে না—ওরা এত বেশী সংখ্যায়।

কলকাতা সহরটাই কি তবে একটা শ্মশান হয়ে গেল? একে যেন আর চেনাই যায় না। এমনি করে আর কদিন চলবে—কোন যেন পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না কোন দিন। উঃ চারিদিকে কি এক অন্ধকার। ময়লার দুর্গন্ধে রাস্তায় হাঁটা যায় না। সমস্ত সহরে মহামারী দেখা দিতে আর কত দেরী?

তারপর কদিন পরে আরম্ভ হল ধর পাকড়। রাস্তায় মোটর লরী দাঁড়িয়ে সেই জীবন্ত কঙ্কালদের জোর করে গাড়ীতে তুলে নিচ্ছে। তারা চিৎকার করে কেঁদে উঠল—পা জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করল। তারা কোথাও যেতে চায় না। তাদের ত দাবী বেশী ছিল না। তারা শুধু

চেয়েছিল—ধনীর গৃহে যে ফ্যান ফেলে দেওয়া হয় বা গরুকে খাওয়ান হয় তারিরই একটুখানি। ওরা ত ভাত চায়নি—বা গৃহের ভেতর আশ্রয় চায়নি। সে সব যে বড় বেশী চাওয়া। তারা শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহা নগরীর ফুটপাতে শুয়ে মরতে চায়। তাও দেওয়া হবে না কেন? বড় নাকি চারিদিকে কথাবার্ত্তা আলোচনা চলছে। এমেরিকান সৈন্যরা সব দেখে শুনে তাদের স্বদেশে গল্প করে চিঠি দিচ্ছে। ধনীদের দিনরাত ঐ "ফ্যান দাও গো" শুনে ঘুমের একটু ব্যাঘাতও হচ্ছে। মরতে হয় তারা মরুক তাদের গ্রামে গিয়ে কিম্বা টিনের শেড দিয়ে তাদের জন্য সরকার যে আশ্রয় শিবির করেছেন সেখানে। স্বামী স্ত্রীকে খুঁজে পেল না—মা বাবাকে সন্তান ফেলে চলে যেতে হল। কারণ যখন সরকারী গাড়ীতে সকলকে জোর করে তোলা হল—তখন সবাই এক স্থানে ত ছিল না। একটু খাবার পাওয়ার আশায় কে কোন দিকে যে তখন চলে গিয়েছিল। মৃত্যু শীঘ্র একদিন ব্যবধান আনতই। তার আগেই সরকার সে কাজটা করে দিলেন ভালভাবেই। দিনের পর দিন এই দৃশ্য দেখতাম—আর খালি মনে হত—ভাগ্যিস আমাদের রবীন্দ্র নাথ, প্রফুল্ল চন্দ্র আজ তাঁদের বাংলার এই চরম দুর্দ্দশা দেখবার জন্য পার্থিব দেহে বেঁচে নেই। বাংলাকে তাঁরা ভালবাসতেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, অন্তর দিয়ে। বাঙ্গালীর প্রতিটী দুর্ভাগ্যে তাঁরা জড়িয়ে দিতেন নিজেদের নিতান্ত আপনদরদী বন্ধু হিসাবে। বাঙ্গালী জীবনের এই অপুরণীয় ক্ষতি ও

তাঁদের ভয়াবহ পরিণতি দরদী হৃদয়কে কত না ব্যথায় ভরে দিত।

## পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ—

কলকাতায় যখন আর বেশী কিছু করবার রইলনা ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মহোদয়ের চিঠি নিয়ে যাত্রা করলাম পূর্ব্ববঙ্গে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির ( ডাক্তার শ্যামা-প্রসাদ বাবু সভাপতি ও শ্রীভগিরথিমল কানুরিয়া সম্পাদক ) তরফ থেকে সমস্ত কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করতে। বোনঝি ধীরা ও বালিগঞ্জ কলেজের ছাত্রী শান্তিকেও সঙ্গে নিলাম। শান্তি পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে। ও পথঘাট চিনিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সাহায্য করবে।

ভোরবেলা চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস ধরে চলেছি। প্রথমে নামব চট্টগ্রামে। মনের ভেতব এক অদ্ভুত অনুভূতি। পিতৃদেবের জন্মভূমি—বীররক্তে রঞ্জিত চট্টল প্রথম দেখব।

আমাদের মেয়েদের গাড়ীতে—কিছুক্ষণ পরেই এক করুণ কান্না শুনতে পেলাম। কাছে গিয়ে দেখি একটি মেয়ে—ভিখিরী বসে বসে বুক চাপড়ে কাঁদছে। তাকে প্রশ্ন করাতে সে বলল—তাদের গ্রামে যখন আর চাল পাওয়া গেল না—তখন অন্যদের সঙ্গে দল বেঁধে সে ও তার স্বামী সঙ্গে তাদের দেড় বছরের মেয়েটীকে নিয়ে চলে গিয়েছিল কলকাতায়। সেখানে কত বড় লোক—কত বড় বড় তাদের

বাড়ী—সেখানে গেলে নিশ্চয়ই খেতে পাওয়া যাবে এই কথাটাই তার স্বামী তাকে বুঝিয়েছিল। নয়তো সে তার নিজের কুঁড়ে ঘর ছেড়ে আসতেই চায়নি। কলকাতায় গিয়ে স্বামী যেন তার কেমন বদলে গেল। তাকে একলা রাস্তায় বসিয়ে রেখে—কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াত। সে খেল কিনা—কোথায় ঘুমুল কিছুই আর খোঁজ রাখতনা। গোটা দুই মাস একদিনও একটু মাথায় তেল মাখতে পারেনি একদিনও স্নান করতে পারেনি। নিজেই খুঁজে খুঁজে কোনদিন একটু ফ্যান বা খিচুড়ী খেয়েছে। কোলের মেয়েটি তার দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছিল। বুকের দুধ যে ক্রমে ফুরিয়ে আসছিল। বুকের কাপড় সরিয়ে দেখাল—সত্যিই সব পাঁজরা গুলো বার হয়ে পড়েছে। তারপর যা বলল সেটা বড় বেশী করুণ। হঠাৎ একদিন স্বামী এসে বলল—দেশে ফিরে যেতে হবে—মরতে হয় সেখানেই মরবে। কলকাতা থেকে সবাইকে ধরে ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। কেউ বলছে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেবে—কেউ বলছে হাত পা বেঁধে কুয়োতে ফেলে দেবে। তাই তারা ফিরে যাবে—কিন্তু মেয়েটীকে নিয়ে যেতে পারবে না।

প্রথমে নিজের ভাঙ্গা কুটীরে ফিরে যাবে ভেবে মনে যে আনন্দের রেশ দেখা দিয়েছিল—মেয়েকে ফেলে যেতে হবে ভেবে—সব আনন্দ কোথায় চলে গেল।

স্বামীর পা ধরে সে কেঁদে বলেছিল—দেড় বছরের কচি মেয়ে—মার বুকটি ছাড়া আর কিছু জানেনা—দু মাস এক

ফোঁটা বাইরের দুধ পায়নি। মার বুকটা চুষে চুষে তবু বেঁচে আছে। তাকে ফেলে কোথায় যাবে সে। স্বামী তাকে একলা ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে দেখে—ভয়ে ভয়ে সে মেয়েকে রেখে চলে এসেছে। অতবড় সহরে তার থাকতে যে বড় ভয় করে। কত লোক কত রকমে যে তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। আবার একদিন সে মেয়ে স্বামী নিয়ে স্বগৃহে ফিরে যাবে সেখানে সে রাণী, গৃহকর্ত্রী—মাতা। এই আশাতেই না সে সব প্রলোভন জয় করে ফিরে আসতে পেরেছে।

মেয়েকে বিক্রী করে তার স্বামী পাঁচ শিকে পেয়েছে। সেইটুকু সম্বল করে তারা ফিরে যাচ্ছে। এক একটা কথা বলে আর কেঁদে ওঠে মেয়ের শোকে। বারবার আমায় জিজ্ঞেস করছে—যে তার মেয়েকে যে কিনল সে কি খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে তাকে? কলকাতায় দেখেছি এমনি সন্তান কেনা বেচা হয় সুবিধার জন্য। শিশু কোলে থাকলে মায়ের সুবিধা ভিক্ষার জন্য। তাই যার সন্তান নেই সে অপরের সন্তান কিনে ভিক্ষে করে বেড়ায়—তার শেষ নিঃশ্বাসটুকু বন্ধ হয়ে গেলে—তাকে ফেলে রেখে আবার চলে যায় নতুন শিশুর সন্ধানে। এই নিষ্ঠুর সত্যটা আর তাকে শোনাতে পারিনি। নতুন মার প্রথম সন্তান। তার বুকে কি অসহ্য বেদনা। সে কথা মনে করলে আজও চোখে জল আসতে চায়। আজ হয়তো সেই অভাগিনী মা পৃথিবীতে আর নেই। পঞ্চাশ লক্ষ লোকের সঙ্গে সেও

শেষ হয়ে গেছে। কিম্বা ভাগ্যচক্রে ওর জীবন দীপটা নিভতে পারেনি। তার বুক জুড়ে আবার সন্তান এসেছে। অতীত দিনের সেই ঝড় ঝাপ্টার দিনগুলি কাটিয়ে আবার সূর্য্যের আলো দেখতে পেয়েছে। আঙ্গিনায় শিশু খেলে বেড়াচ্ছে— কর্ম্মশ্রান্ত স্বামীকে সে খেতে দিচ্ছে। কিন্তু সেদিনের কান্নাটা যে বড় সত্য ছিল। ভুলতে পারবনা কোনদিন। কয়েক ষ্টেশন পরে স্বামী তাকে নাবিয়ে নিয়ে গেল। পথের বন্ধু আমরা কে কোথায় মিলিয়ে গেলাম। আর কি দেখা হবে ?

আমাদের গাড়ীতে যাচ্ছিলেন একটি কলেজের মুশলমান প্রিন্সিপালের কন্যা। কলকাতার কলেজে পড়তেন—ফিরে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে আগেকার ঘটনাটা ভুলতে চেষ্টা করলাম। আমাদের জন্য খাবার আনালেন— এক সঙ্গে খেলাম। তারপর গোয়ালন্দে ষ্টীমারে উঠে যখন বসেছি তিনি অনুরোধ করলেন "একটু গান করুন না আপনারা।" তাঁরই অনুরোধে "বন্দে মাতরং" গানটী করলাম। উপাসনার সময় যেমন সাধক স্থিরভাবে সমাহিত চিত্তে বসে থাকেন তেমনি করে সেই মুশলমান ছাত্রীটীও বসে রইলেন। গান শোনানটা যেন সার্থক হয়ে উঠল। কি শ্রদ্ধার সঙ্গেই না গানটী শুনলেন। আজ তার কথা মনে হলে খালি মনে হয় কয়েক বছর পরে বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িকতার হলাহল উঠল—তা কি সেই ছাত্রীর মনকেও বিচলিত করে তুলেছে ? আজও কি তিনি তেমনি নিবিষ্ট মনে, তেমনই

শ্রদ্ধানত হৃদয়ে বসে শুনতে পারবেন "বন্দে মাতরং—সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্"।

চট্টগ্রাম যাবার ট্রেণে উঠলাম রাত্রিবেলা। এত ভীড় যে লোকেরা কামরায় উঠতে না পেরে গাড়ীর ছাতেও উঠে বসে আছে। কোন রকমে তৃতীয় শ্রেণীর মেয়ে গাড়ীতে উঠে পড়লাম। একটিও বাতি জ্বলছে না—অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে পরস্পরকে নাম ধরে ডেকে উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিচ্ছিলাম। ধীরা ও শান্তি দাঁড়িয়ে থেকে আমার জন্য একটু স্থান করে দিল। আলো না থাকাতে কেউ আর বাথরুমে যাচ্ছেন না পাছে ফিরে এসে স্বস্থানে বসতে না পারেন। কারণ তখন চলছিল "জোর যার মুল্লুক তার" অন্ধকারে একবার উঠতে গিয়ে চারিদিক থেকে প্রতিবাদ শুনে বসে পড়লাম। মাটিতে যারা বসেছেন বা শুয়েছেন তাঁরা সশব্দে চিৎকার করে উঠলেন। কিছুক্ষণ পরে চারিদিকের দুর্গন্ধে বসে থাকা এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়ল। এরির মাঝখানেই শুনতে পেলাম কোন মহিলার পুঁটুলী থেকে নাকি সর্ব্বস্ব চুরী গেছে। অদৃশ্য মহিলার চিৎকারে সমস্ত গাড়ীটা মুখরিত হয়ে উঠল। যে চুরী করেছে সে যদি রেখে না দেয় তবে তার এবং তার দশ পুরুষের সর্ব্বনাশ হবে—এই সবও শুনতে পেলাম। ভোরের আলোয় যদি দেখা যায় সেই খোয়ান জিনিষগুলি আমার পাশেই পড়ে রয়েছে তবে আমার কি দুর্দ্দশাই না হবে এই ভেবে শিউরে উঠি আর চারিদিকে



একে দেখে মনে হল—"দুঃখের প্রতিমূর্তি"।

হাত দিয়ে দেখি। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর পত্র নিয়ে যিনি সব আশ্রয় কেন্দ্র পর্য্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছেন তিনি কি না ধরা পড়বেন একটা তেলের ডিবা বা লাল গামছা চুরি করে।

কিছুক্ষণ পরে শুনতে পেলাম "থাক্ থাক্ আমায় আর উপদেশ দিতে হবে না—ভারী আমার ইস্কুলের মাষ্টারণী এসেছেন। তা হলে না হয় বুঝতাম" এর উত্তরে ছাত্রীর গলাও শুনলাম। ব্যাপারটী নাকি এই। নিদ্রার সঙ্গে আর লড়াই করতে না পেরে ছাত্রী পা সমেত অৰ্দ্ধেক শরীর জানলার বাইরে দিয়ে মাথাটী একজনের বাঁধা বিছানার ওপরে রাখতে গেছেন। স্বত্বাধিকারী প্রতিবাদ করে উঠেছেন। ছাত্রী তাঁকে দুটি নীতি কথা শোনাতে গিয়ে ঐ ভাষণটা শুনতে পেলেন। মনে মনে ভাবলাম ছাত্রী বি,এ ক্লাসে পড়েন—মাষ্টারের পদ পেতে'ত বেশী দেরী নেই। তবে মাষ্টার হলেই কি এর চেয়ে বেশী আশা করতে পারতেন ঐ মহিলার কাছ থেকে? মাষ্টারকে সম্মান দেখানর মতনও শিক্ষা আছে কি ওঁর ভেতর?

ঘুমের যখন কোন আশাই নেই—তখন বসে বসে কত কথাই না ভাবতে লাগলাম। এই যে রেল যাত্রীদের ভেতর এক প্রবল স্বার্থান্বেষিতা দেখা যায়—এটা যারা শিক্ষার কোন আলোই পায়েনি—সংসারে শুধু যারা প্রবঞ্চনাই পেয়ে এসেছে তাদের ভেতর দেখতে গেলে মনে কোন রাগই হয় না। শুধু হয় একটু অনুকম্পা। রেলের ভেতরে ওরা স্বাধীন জীবনকে ভোগ করতে চায়। একজনের যতটুকু

দাবী তার এতটুকুও ছাড়তে চায়না। সে আগে গাড়ীতে উঠে যতটুকু স্থান জোগাড় করেছে তার থেকে—তিলার্দ্ধ স্থানও সে কাকেও দেবেনা। কিন্তু যারা নিজেদের শিক্ষিতা বলে প্রচার করে কথায় কথায় আমাদের বলে "How ignorant these people are" সেই ইঙ্গ ভারতীয় মহিলাদের ভেতর স্বার্থপরতা এমন ভাবে প্রকটিত হতে দেখেছি। তাদের সঙ্গে এক গাড়ীতে ভ্রমণ করতে পেয়ে ভারতবাসী যেন ধন্য হয়ে উঠেছে—এইরূপ মনোভাব তারা পোষণ করে। জানলার ধারটা—সমস্ত বেঞ্চিটা তাদের প্রাপ্য—ভারতীয় মহিলারা তাদের এই অবিচারকে ভয়ে ভয়ে বরাবর মেনে নিয়েছে। একবার দেখেছি একটি বেঞ্চি জুড়ে একজন এংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা শুয়ে আছেন আর একটি বেঞ্চে চার পাঁচটী ছেলে মেয়ে নিয়ে একটি ভারতীয় মা বসে আছেন। প্রতিবাদ করার মত তাঁর মনের সাহস নেই। আমি বলাতে বলেছিলেন "ও একজন মেম সাহেব—ওকি জেগে বসে থাকতে পারে? এই ভারতীয় মহিলাই হয়তো অন্য ভারতীয়ের সঙ্গে কত রুদ্ররূপ গ্রহণ করতেন—একে একে কত ঘটনাই না মনে আসতে লাগল। একবার কলকাতা থেকে বোম্বে ফিরে যাবার পথে এলাহাবাদে দুটি এংলো ইণ্ডিয়ান ও তিনটী ভারতীয় মহিলা উঠলেন। কারুরই স্থান নির্দ্দিষ্ট করা ছিলনা। এংলো ইণ্ডিয়ান মহিলারা উঠেই দুটি বেঞ্চে বিছানা করে বসলেন। ভারতীয়েরা ট্রাঙ্কের ওপর নিজেদের স্থান করে নিলেন। আমি প্রতিবাদ

করাতে—বাকি সমস্ত পথই আমাকে কত রকম ভাবেই না হাসি বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। হাওড়া ষ্টেশনে একটি বাঙ্গালী মেয়ে উইমেন্স অক্সিলিয়ারী ফোর্সে কাজ করেন—আমার গাড়ীতে উঠেছিলেন। স্থান নির্দ্দিষ্ট না থাকাতেও তাঁকে উঠতে দিয়েছিলাম। সমস্ত গাড়ী তাকে যত্ন করেছিলাম—কারণ গাড়ীতে ওঠবার সময় তার দিদি অনুরোধ করে বলেছিলেন—যেন তাকে দেখা শুনা করি। চাকুরীর খাতিরে এংলো ইণ্ডিয়ান মহিলাদের খাতির করতেই হবে এই ধারণা বশতঃ কিম্বা অন্য কারণ জানিনা—তিনি নতুন বন্ধুদের সঙ্গে হাসি গল্প চা খাওয়া প্রভৃতি আরম্ভ করলেন।

অন্য ভারতীয় মহিলাদের আমার বেঞ্চে বসতে দিয়েছিলাম তাদের সঙ্গেও ওরা গল্প আরম্ভ করে দিলেন—"টোমারা নাম কেয়া—টোমলোক কিধার যাতা।" তাঁরাও উৎফুল্ল হয়ে ওদের সঙ্গে ভাব করে ফেললেন। মনে মনে লজ্জা পেলাম—ওদের নিজেদের ভেতর কত পরস্পর প্রীতি কিন্তু আমাদের ভেতর সেটার কত অভাব। শরৎ বাবুর সেই রেঙ্গুনের জাহাজের গল্পটা মনে পড়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব বিজাতীয় ভাবাপন্ন এংলো ইণ্ডিয়ানদের ২৪ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে সরিয়ে দেব—এই আশা মনের ভেতর পোষণ করতে করতে আর পরাধীনতাকে অভিশাপ দিতে দিতে বাকি পথটা এসেছিলাম। মুখেও যেন একবার

বলেছিলাম—"You too have to quiet our India." ২৪ ঘণ্টার অনেক বেশী হয়েছে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর। কিন্তু তাদের এ দেশ ছেড়ে যাবার নোটিশ দিতে পারিনি। কোন দিন পারব কিনা জানিনা। এদের মতনই আর একজন মহিলা, একবার বালিগঞ্জের একটি বাড়ীতে ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে গান করতে করতে দুর্ভিক্ষের অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে ঢোকবার পর—ওপর থেকে চাকরকে ডেকে বলেছিলেন সব কুকুর ছেড়ে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ ছয়টী বুল ডগ ছাড়া পেয়ে আমাদের ওপর ছুটে এসেছিল। সেদিনও ভেবেছিলাম এদের মতন মানুষদের স্বাধীন ভারতে স্থান থাকবে কিনা এমনি শত-স্মৃতি জড়িত ঘটনাগুলি একে একে চোখের সামনে ভাসতে লাগল। চিন্তা স্রোতে কোথা থেকে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। হঠাৎ দেখি রাত্রির কুহেলিকা জাল সরে গিয়ে উষার প্রথম আলো দেখা দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ চট্টগ্রামে এসে থামাতে আমরা জিনিষ পত্র নিয়ে নেবে পড়লাম। রাত্রির সমস্ত গ্লানি তখন প্রভাতের আলোয় কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। নতুনকে পাবার সঙ্গেই পুরাতন যে কখন বিদায় নিয়ে নেয়—যাবার সময় জানিয়েও যায় না। নতুন দিনের আলোয় সেই রাত্রের সর্ব্বহারা মহিলাও হয়তো সকলকে আশীর্ব্বাদ করে বলেছেন "তোমরা শান্তি পাও—তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের আত্মাও যেন শান্তি লাভ করে।" সকলেরই যেন মনে হল "এদিন

আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার, আজি প্রাতে সূর্য্য ওঠা সফল হল কার" পিতৃদেবের বাল্য-স্মৃতি জড়িত—শত শত বীর রক্তে পূত চট্টলকে ভোরের আলোয় প্রণাম করলাম।

যাঁদের বাড়ী উঠব—তাঁরা আমাদের কোন চিঠিই পাননি। তবে সকাল থেকে সি, আই, ডি দের ঘোরা-ঘুরিতে কোন অতিথির আগমন হতে পারে বলে ধরে নিয়েছিলেন। ডাক্তার গৃহস্বামী ভ্রাতৃস্নেহে অভ্যর্থনা করে নিলেন। সব রকম সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করেছিলেন। জাপানের আক্রমণের ভয়ে সে সময়ে সহরে কোন মহিলারা থাকতেন না। তাঁদের সকলকে গ্রামে কিম্বা অন্যত্র সরান হয়েছিল।

কদিন ঘুরে ঘুরে সব সাহায্য কেন্দ্রগুলি দেখে রিপোর্ট লিখি আর কলকাতার কাগজে পাঠাই। কোথায় কেমন কাজ হচ্ছে—কোথায় কি প্রয়োজন—তার ব্যবস্থা করতে হবে কলকাতায় ফিরে গিয়ে। পাঞ্চ-জন্য অফিস থেকে শুনলাম প্রথম যখন দুই একটী মানুষের অনাহারে মৃত্যু হল—সে সব প্রকাশ করার জন্য সরকার থেকে সম্পাদকের ওপর কড়া নোটিশ এসেছিল। ভবিষ্যতে যেন কোন দিন আর ঐরূপ মৃত্যুর খবর বার না করা হয়।

এক একটি সাহায্যকেন্দ্রে এক হাজার কি দুই হাজার করে বুভুক্ষু সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ভাঙ্গা টিনের কৌটা বা মাটির ভাঁড় হাতে।

ছোট টিনের এক কৌটা করে বাজরী গম বা চালের সঙ্গে ডাল মিশিয়ে খিচুড়ী দেওয়া হচ্ছে। এক এক কেন্দ্রে বুভুক্ষুরা আট দশ মাইল দূর থেকে হেঁটে আসছে ২৪ ঘণ্টা পরে এক কৌটা খিচুড়ী খাবে বলে। অনেকের কাছে শুনেছি—উপোষের সময় প্রথম কদিন তারা খুব এক যন্ত্রণা অনুভব করে। তারপব ক্ষুধার অনুভূতিটাও ধীরে ধীরে কমে আসে। অল্প একটু খিচুড়ী খেয়ে যন্ত্রণাটা যেন আবার বেড়ে যায়।

একদিন একটি কেন্দ্রে গিয়ে শুনি দলে দলে ক্ষুধাতুরা সব ফিরে যাচ্ছে। মুখে তাদের কী এক হতাশার চিহ্ন। খবর নিয়ে জানলাম সেদিন সেখানে "ষ্টোরস" থেকে চাল ডাল পাঠান হয়নি। তাই কিছু রান্না হতে পারেনি। ষ্টোরে গিয়ে দেখি খাতায় লেখা রয়েছে অত মণ চাল ও ডাল অমুক কেন্দ্রে পাঠান হল। পথ থেকে তাদের কোথায় সরিয়ে ফেলা হয়েছে কেউ বলতে পারলনা। মনে মনে ভাবলাম মনুষ্যত্বের কোন্ স্তরে নেমে গেলে এতগুলি বুভুক্ষুদের ২৪ ঘণ্টা পরের খাবার থেকে বঞ্চিত করতে পারা যায়। এদের ভেতর যেটুকু প্রাণ শক্তি আছে তাই দিয়েও যদি সরকারী গুদামগুলি লুট করতে পারত।

সার্কেল অফিসারের বাড়ী ও অফিসে ছুটাছুটি করে জানলাম যে কাপড়ের গাঁট সব গুদামে পড়ে রয়েছে। অথচ শীতের রাত্রে আশ্রয় শিবিরে একটু কাপড় গায়ে দিতে পারছে না ছেলে মেয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। কবে যে সে সব খোলা

হবে ও বিতরণ করা হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সার্কেল অফিসার অনেকবার দুঃখ করে বললেন আমাদের যে এমন দুর্দ্দিনই পড়েছে দেশে—যাতে তাঁর নিজের জন্য ভাল ঘি বা মাখন পাওয়া একটা শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর শরীরে সেজন্য দুর্ব্বলতার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।

স্থানীয় কর্ম্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে জানলাম সরকার যাদের চাল ক্রয়ের জন্য এজেণ্ট করে ছিলেন তারা অল্প দামে চাষীদের থেকে চাল কিনে অনেক লাভ রেখে সরকারের কাছে তা বিক্রী করতেন। সরকার আবার সেগুলির ওপর কিছু বেশী দাম ধরে জন-সাধারণের কাছে বিক্রী করতেন। যাদের কাছে চাল জমান ছিল বা চালের আড়ৎ ছিল— তারা চালের দাম আরও বেড়ে গেলে তবে বিক্রী করবে এই আশায় বাজার থেকে সব চাল সরিয়ে ফেলল। দরিদ্র গ্রামবাসী হঠাৎ দেখল দোকানে বা হাটে চাল নেই। যাদের টাকা আছে তাদের কাছে চাউল বিক্রেতা বহু মূল্যে চাল বিক্রয় করল। রাত্রে গোপনেই হয়তো ১০৮ টাকা মণ দরে কোন ধনীর গৃহে চাল পৌঁছে দিল। গ্রামবাসী অনাহারের ভয়ে প্রথমে জমি বিক্রী করল—তারপর গহনা কাপড়—গরুবাছুর সবই বিক্রী করল। ছুতোর বা স্বর্ণকার তার যন্ত্রপাতি বিক্রয় করে দুর্মূল্যে চাল কিনল। জেলে তার জাল বিক্রয় করে দিল। গৃহস্থ তার বাড়ীর ছাতের টিন পর্য্যন্ত বিক্রী করে শেষে যখন সর্ব্বহারা হয়ে গেল—তখন স্ত্রী সন্তান পর্য্যন্ত বিক্রী করতে প্রস্তুত হল।

নয়তো তাদের নিয়ে অনাহারে দিন কাটাতে কাটাতে অসহ্য যন্ত্রণার ভেতরে ভিটে মাটিতে পড়ে মারা গেল। যারা কাছের সহরে এসে পৌঁছিল তাদের মরবার দিনগুলি একটু পরে এল মাত্র। প্রতি গ্রামে নাকি বহু সংখ্যায় তাঁতি মারা গেছে—বহু পুরোহিত, জেলে, স্বর্ণকার, স্কুলের ছাত্র ছাত্রী বা শিক্ষক—শুধু এক মুঠা চালের অভাবে মারা গেছে। কত পরিবার এখনও পাতা সেদ্ধ করে খেয়ে আছে। যাদের জমি নেই—যারা গ্রামবাসীদের সেবা করে বেঁচে থাকত—যেমন পুরোহিত, নাপিত, তাঁতি প্রভৃতি। এদের ভেতরিই মৃত্যু সংখ্যার হার বেশী। শুনতে শুনতে ভাবতাম—এ সব কি সত্যি ঘটনা? না গল্প শুনছি বসে বসে।

একদিন একটি কেন্দ্রে খাদ্য বিতরণ দেখতে গিয়েছি। কয়েকজন ভদ্রলোক মিলে একটি কঙ্কালসার দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে এসে দাঁড় করালেন আমাদের সামনে। এদের বাড়ীতে মা বাবা জেঠা পিসীমা ভাই বোন নিয়ে চোদ্দ পনরো জন লোক ছিলেন। রোজ একটি করে অনাহারে মারা যেতে যেতে শেষ অবশিষ্ট পিসিমাও পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন। ও শুধু একা বেঁচে রয়েছে। জীবনী শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। তার দিকে তাকাতে পারিনি বা কাছে ডেকে সান্ত্বনার কথাও শোনাতে পারিনি। কোন কবি বা সাধক কোন ভাষা দিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন বলে মনে হয় না। ওর দুঃখকে রূপ দিতে গিয়ে



পরিবারের যাঁরা তখনও জীবিত ছিলেন তাঁদের ক্ষমতা ছিলনা মৃতদেহের সংকার করবার। নদীর ধারে শুধু ফেলে আসতেন। কুকুর, শৃগাল ও শকুনীদের ভেতর মানুষের দেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যেত।

৺রবীন্দ্রনাথের লেখনীও বোধহয় নিশ্চল হয়ে যেত। যে দুদিন পরে যাবেই—তাকে বাঁচানর চেষ্টার লাভ কি? তাকে যেতে দেওয়াই ভাল।

কিছুক্ষণ পরে একজন মহিলা একটি ছোট শিশু সন্তানকে ও আর একটি তিন চার বছরের ছেলেকে এনে আমার কোলে দিয়ে বললেন—"তুমি এদের নিয়ে যাও। তোমরা থাকতে এরা না খেয়ে মরবে? আমি মা হয়ে কি করে বুকের ওপর এদের মরতে দেখব"? তাঁর স্বামীকে দেখালেন কিউয়ে দাঁড়িয়ে একটি পাত্র হাতে। আমি সভয়ে ওদের মাটিতে বসিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

আমার এই ঘোরাঘুরির জীবনে—ওদের নিয়ে কোথায় রাখব? পরিচয় দিলেন—গ্রাম সম্পর্কের কাকার মেয়ে। স্বামী বি,এ পাশ, রেঙ্গুনে ভাল কাজ করতেন। সর্ব্বস্ব খুইয়ে চলে এসেছেন হাঁটা পথে। পথে দুটী ছেলে মেয়ে মারা গেছে। দেশে ফিরে চাকরীও পাননি। অভাব দারিদ্র্য শোক পরিশ্রম সব মিলিয়ে তাঁর শরীরকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। মহিলাটি বাপের আশ্রয়ে কিছুদিন ছিলেন। দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে আজ সপরিবারে পথে এসে বসেছেন। বি,এ পাশ স্বামীর মুখে অপমানের চিহ্ন, দেখে মনে হল—পরাধীনতার অভিশাপই বটে। স্ত্রীকে কিউয়ে দাঁড়াতে দেন না—ছেলে মেয়ে নিয়ে রোজ নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন ঘণ্টা তিন চার।

এই রিলিফের কাজে আবার কয়েকমাস পরে চট্টগ্রামে

গিয়েছিলাম। অনেকের কথা প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছি। কিন্তু এই পরিবারের কথা ভয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। সেই দুর্ব্বল জীর্ণশীর্ণ স্বামী বেঁচে আছেন কিনা—মার বুকে ক'জন সন্তানের মৃত্যু ঘটেছে—সব কথা মনে হয়েছে—কিন্তু স্বেচ্ছায় এড়িয়ে গেছি। দুঃখের কাহিনী শোনবার জন্য মনের শক্তিরও ত প্রয়োজন হয়। আমার বোধহয় সে শক্তিও ফুরিয়ে এসেছিল। কিম্বা একটা সম্পর্কে জড়িত ছিলাম বলেই মনের এত দুর্ব্বলতা ?

কলকাতা থেকে কিছু পুরান কাপড় নিয়ে গিয়েছি অনাত্মীয়দের জন্য—পিতৃদেবের দেওয়া নতুন কাপড় নিয়ে গেছি আত্মীয়দের দেবার জন্য।

অনাত্মীয়দের বস্ত্র বিতরণের স্থানে গিয়ে দেখি পুরান ছেঁড়া জামা কাপড় হয়তো পাঁচশত। কিন্তু খবর পেয়ে লোক এসেছে অন্ততঃ পাঁচ হাজার। কাকে বাদ দিয়ে কাকে দিই। সকলেরি যে সমান অবস্থা।

মায়েরা ছেলে কোলে নিয়ে আমায় ঘিরে ফেলেছে। কেউ হাত ধরে টানছে কেউ পা ধরছে। ধীরারা এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ঘরে চলে গেল। স্বেচ্ছাসেবকেরা আমায় বাঁচাবার জন্য দুর্গতদের লাঠি দিয়ে মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। আবার তারা ছুটে এসে আমায় ধরে টানাটানি করছে। এত আঘাত পেয়ে ওরা পাবে হয়তো একটি পুরাতন ছিন্ন জামা। কতজন যে ব্যর্থ মনে ফিরে গেল। সব শেষ হয়ে গেলে মনে হল হাত দুটোয় যেন ব্যথা অনুভব

করছি। তাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য অতজন মিলে ক্রমাগত আঘাত করেছে। শরীরের চেয়েও মন যেন অনেক বেশী শ্রান্ত হয়ে উঠত। কিছুদিন আগে দেখেছি একজন মহিলা তাঁর মেয়ের জন্য একটি গহনা কিনলেন তার দাম শুধু পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। শুনেছিলাম কোন একটি ছোট ষ্টেটে রাণীর সন্তান না থাকাতে কয়েকটি কুকুর পুষেছিলেন। তাদের দেখা শোনা করবার জন্য নিযুক্ত ইংরাজ কর্ম্মচারীর মাহিনা নাকি পাঁচশত টাকা। কুকুরদের জন্য প্রতিদিন কত টাকার মাংস ও রুটী কেনা হত।

ধনী তার টাকা নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। আর অন্য দিকে কি দুর্বিসহ জীবন যাত্রা!

সেইদিন একটি বাড়ীতে অতিথি হয়ে সন্ধ্যাবেলা বসে আছি। এমন সময়ে কয়েকটি মহিলা এসে বললেন যে তাঁরা কাপড় বিতরণ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তাঁদের অভাবের দিকে তাকিয়ে যেন কিছু সাহায্য করি। নিজেদের ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়া কাপড় থেকে কিছু কিছু দিলাম। একটি মহিলা (ইনিও) বর্ম্মা থেকে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ফিরেছেন—তাঁকে ভুল করে দুটি কাপড় দিয়ে ফেললাম। কিছুক্ষণ পরে তাঁর দেওর কন্যা এসে কাপড়ের জন্য অনুরোধ করাতে তাঁকে বললাম "আপনার দুটি কাপড় থেকে একটি ওকে দিন।" তারপর তাঁদের দুজনের ভেতর চিৎকার ও কান্না দেখে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। কন্যা কেঁদে বলেন—আমার একটিও নেই—জেঠি মাতা বলেন—একটি ছিঁড়ে

গেলে—তখন কোথায় অন্য কাপড় পাব—কে আমায় দেবে? আমি কি তখন বস্ত্রহীনা থাকব? ঘটনাটি মনে এত আঘাত করে ছিল।

দুর্ভিক্ষ যে কত সংসার ভেঙ্গে দিয়েছে, মানুষের কত সুন্দর প্রবৃত্তি স্নেহ ভালবাসা প্রীতি সব ধুয়ে মুছে ফেলেছে এই ঘটনাটি তারিরই একটি দৃষ্টান্ত। একদিন হয়তো এমন দিন তখন ছিল এই জেঠিমাই কত স্নেহ ভরে নিজের কাপড় পরিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে দিয়েছেন। সেদিন দেওয়া তাঁর কাছে কত সহজ ও আনন্দের ব্যাপার ছিল। আজ চারি-দিকের নগ্ন দারিদ্র্য তাঁকে কোথায় নাবিয়ে এনেছে। একটি কাপড় ছিঁড়ে গেলে আর নতুন করে পাবার সম্ভাবনা নেই। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তাঁর মনে এত আকুলতা। কন্যার চোখের জল তাঁকে এতটুকুও বিচলিত করতে পারল না।

মানুষের মৃতদেহ মনের ভেতর এক বিভীষিকার সৃষ্টি করত। কিন্তু মানুষের আত্মার এই মৃত্যু মনের ওপর বড় এক বেদনার ছাপ রেখে যেত। সেগুলি ভোলা বড় শক্ত।

অনেক দুঃখের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কিছুদিন পরে চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে গেলাম। যাবার সময় মনে হল—চট্টগ্রামের শত সহস্র দীন দরিদ্রকে না খাইয়ে মারা হয়েছে সত্যিই। তবে এদের সঙ্গে কি তার সর্ব্বজয়ী প্রাণকেও টুটি চেপে মারতে পেরেছে ব্রিটিশের অপরাজেয় শক্তি?

ফেরবার পথে ঢাকা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, বরিশাল প্রভৃতি অনেক দেশ ঘুরে এলাম। সব জায়গাতেই দেখেছি অল্প কিছু দুর্গতদের ঐ বিশ্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের কবল থেকে যদি বাঁচান গিয়ে থাকে—তার জন্য দায়ী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-দের আপ্রাণ প্রচেষ্টা। চারিদিকের ঘনায়মান অন্ধকারের মাঝখানে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি উজ্জ্বল স্তম্ভের মতন দাঁড়িয়েছিল। চট্টগ্রামের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মতন—কুমিল্লা চাঁদপুরেও রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। নিখিল ভারত মহিলা কনফারেন্সের বাংলা শাখা—হিন্দু মহাসভা, হিন্দু মিশন, ব্রাহ্ম সমাজ রিলিফ মিশন প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান তাঁদের অল্প বেশী সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন দুর্গতদের সেবা কার্য্যে। কমিউনিষ্ট দলের ছেলে মেয়েরাও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ভেতর দিয়ে খুব কাজ করছিলেন। বেঙ্গল রিলিফ কমিটী প্রায় সব স্থানেই কোথাও খাদ্য—কোথাও চাল বা কোথাও বস্ত্র বণ্টনের কেন্দ্র খুলেছিলেন। রেল বিভাগের সাহায্য খুব অল্পই পাওয়া যেত। ঢাকায় গিয়ে শুনি বহু বস্তা চাল ষ্টেশনে এসে পড়ে রয়েছে। সরকার থেকে সেগুলিকে ষ্টেশন থেকে বার করবার ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে না। ওখানকার কর্মীরা ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে তার করে ঘটনাটি জানিয়েছেন। অনেক স্থানে দেখলাম হিন্দুদের জন্য ভিন্ন লঙ্গরখানা—মুশলমানদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। কোথাও আবার দেখেছি সবাই একত্রে খাচ্ছে।

বেঙ্গল রিলিফ কমিটী থেকে নির্দ্দেশ দিল যেন হিন্দু মুশলমানকে সমান ভাবে সেবা করা হয়।

## ২৪ পরগণা ভ্রমণ :—

পূর্ব্ববঙ্গ ঘুরে এসেই গেলাম ২৪ পরগণার দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামগুলি দেখতে। ট্রেণে করে ডায়মণ্ড হারবারে গিয়ে—সেখান থেকে সালতি করে খাল দিয়ে দিয়ে ভেতরের গ্রামে চললাম। সালতিতে বসে দেখতে দেখতে যাচ্ছি—মাঝি ডাকছে "আরে ভাই—মিয়াঁ—আজ কজন মরল তোমার ঘরে। ভেতর থেকে উত্তর এল—আজকে নিয়ে ছয় জনা হল। পরিবার কবে গেছে? উত্তর সে তো তিন চার দিন হল গেছে। আজ বড় মেয়েটাও গেল।" সালতি আমাদের এগিয়ে চলেছে। মাঝির প্রশ্নের আর শেষ নাই। মাঝি একবার দেখিয়ে দিল—ঐ দেখেন মা গাছে লাউ ধরেছে—কিন্তু ঘরে খাবার লোক নাই। ফলটা হবার আগেই সকলের শেষ হয়ে গেছে। বড় সাধ করে অমুকের বৌ গাছটা লাগিয়েছিল মা। তাকিয়ে দেখি—শূন্য একটি ভাঙ্গা চালাঘর—কিন্তু চালের ওপর বড় একটা লাউ ঝুলে রয়েছে। কত গ্রাম পার হয়ে গেলাম—সন্ধ্যায় একটা ঘরেও বাতি জ্বলছে না। গ্রাম নাকি সব শূন্য হয়ে গেছে। মাঝি বলল দু একটি ঘরে যদি মানুষ একটি দুটি থাকেও—উঠে বসে সন্ধে জ্বালবার ক্ষমতাও তাদের নেই। ঘরেতেই তারা মরে

থাকবে। কুকুর শেয়ালে গন্ধ পেয়ে টেনে নিয়ে আসবে। সবাই আমরা নির্ব্বাক নিস্তব্ধ বসে আছি। একজন সঙ্গী সব শেষে মাঝিকে প্রশ্ন করলেন—তার ঘরে কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা।

খুব সহজ ভাবেই হেসে বলল—"ঘরে আর কাউকে রাখতে পারলাম কৈ? একাই আছি। তবে কদিনেরি বা? আপনারা সহরের বড়লোক বাবুরা এসেছেন—তাই সালতি চড়ছেন। নয়তো কেই বা এখানে চড়ে—চালাতেই বা পারব কদিন? শরীরে আর কি আছে? আমি মরে গেলে ঘরের বাইরে দেহটাকে টেনে এনে আকাশের নীচে রাখবে এমন কেউ নেই। দুর্গন্ধে ঘরটা ভরে থাকবে এই দুঃখ"।

সালতি থেকে নেবে একটি গ্রামের ভেতরটায় ঘোরা হচ্ছে। হঠাৎ ভেতরের পুকুরে কিসের একটা শব্দ। একটি গ্রামের বধূ—পরণে তার বস্ত্র ছিল না। গাছের বড় বড় পাতা জড়িয়ে ছিল। পুরুষ মানুষদের আসতে দেখে জলের ভেতর গিয়ে লজ্জা নিবারণ করল। সকলে তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করে গেলাম।

তারপর আমরা গেলাম শ্মশান দেখতে। একতলার মতন উচু মৃতদেহের স্তূপ। কাঠ কেনার পয়সার অভাবে মৃতদেহ কেউ পোড়াতে পারেনি। এমনিই রেখে চলে গেছে। শ্মশানের জমিতে আর পা দিতে পারলাম না। দাঁড়ালেই মানুষের মৃতদেহের ওপর পা দিতে হয়।

মৃতদেহের ওপর মৃতদেহ। কারুর হাত দেখা যাচ্ছে, কারুর পা—কারুর মাথা। বেশীক্ষণ ঐ দৃশ্য দেখবার মতন মনের শক্তি যেন হারিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সালতিতে চড়ে চলে গেলাম সেখান থেকে। পথে দেখি আর একটি সালতিও ফিরে যাচ্ছে। তাতে একটি মেয়ে বসে। সে বলল—তার দিদি এক ঘণ্টা আগে মরে গেল। আর কেউ নেই। সেই দিদির দেহটা সালতিতে চড়িয়ে শ্মশানে ফেলে রেখে বাড়ী যাচ্ছে। বাড়ীতে আর কেউ নেই—সে একেবারে একা। ওর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও দেখলাম না। চোখের জল কি তবে ওদের শুকিয়ে গেল? জন্ম থেকে যে দিদির সঙ্গে খেলা করেছে ঝগড়া করেছে—পাশাপাশি ঘুমিয়েছে। তাকে কোথায় ফেলে দিয়ে এল সন্ধ্যার এই অন্ধকারে। কাল যে চলে যাবে—বা যাকে যেতে হবে—সে আর কাঁদবে কার জন্য? শুধু ত একদিন বা দুদিনের ব্যবধান।

গ্রামের পথে দু চারটি অর্দ্ধমৃত দেহও দেখলাম। সমস্ত শরীরে মাছি বসে আছে। দুর্ব্বল হাত দিয়ে তাদের সরাবারও শক্তি নেই। চট্টগ্রামের রাস্তাতে দেখেছি—হৃৎপিণ্ড তখনও ধুকধুক করে চলছে—কিন্তু পায়ের অনেকখানি শেয়ালে খেয়ে গেছে। চিৎকার করবার শক্তি পর্য্যন্ত তার ছিল না। অথচ সেই রাস্তা দিয়ে নাকি সারারাত্রি পুলিশের লোক টহল দিয়ে বেড়িয়েছে।

একটি সরকারী আশ্রয় শিবিরে দেখেছি—বৃদ্ধা এক



বাংলার দুর্ভিক্ষের দিনে কলকাতার রাজপথে এমনি বহু মৃতদেহ
পড়ে থাকতে দেখলাম।

মহিলাকে রাত্রে শেয়াল এসে কামড়ে খেয়ে গেছে। ডাক্তার তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন যে অমুক মহিলাকে অমুক দিন শেয়ালে খেয়ে গেছে। সেই আঘাতের তিনি চিকিৎসা করেছেন।

মানুষের জীবনে এত বড় ও শোচনীয় দুরবস্থা জগতে আর কোথাও হয়েছে বলে শোনা যায়নি। মহাযুদ্ধে অংশ নিয়ে—( তার মত না নিয়েই ) যুদ্ধ কি শুধু ভারতবর্ষকেই করতে হয়েছে ?

পৃথিবীর আর যে সব দেশ যুদ্ধ চালাল সেখানে ত যুদ্ধের এমন ভয়াবহ পরিণতি দেখা দিল না ? শুধু বাংলাদেশকে এত বড় শাস্তির বোঝা বহন করতে হল কেন ? কে এর উত্তর দেবে ? বাংলা দেশ স্বাধীনতার সংগ্রামে যতখানি ত্যাগ করেছে—এই কি সেই ত্যাগের মূল্য ?

২৪ পরগণা থেকে ফিরে আসার পর—বেঙ্গল রিলিফ কমিটীর অর্থে একটী রোগ প্রতিশেধক মূলক বিভাগ খোলা হল। সমগ্র বাংলায় দেড় শতাধিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হল। ঔষধ যন্ত্র ও পথ্য কলকাতা থেকে পাঠান হত। স্থানীয় ডাক্তারদের অল্প বেতনে নিযুক্ত করে চিকিৎসা কেন্দ্র চালান হত। তাঁরা নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠাতেন। তাঁদের সাহায্য করবার জন্য প্রত্যেক স্থানে সেবাদল গঠিত হল। প্রতিটী কেন্দ্রে একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মী—তাঁর সঙ্গে কুড়ি পঁচিশ জন কর্মী। তাঁরা ডাক্তার বাবুকে সাহায্য করতেন—গ্রামের অসুস্থদের বাড়ীতে পথ্য

দিয়ে আসতেন—রিপোর্ট তৈরী করে কলকাতার কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতেন—কলকাতা থেকে ঔষধাদি নিয়ে যেতেন। একটি কেন্দ্রের অধীনে আবার উপকেন্দ্র খোলা হল। কয়েকটী স্থানে মহিলারাও সেবিকাদল গঠন করে কাজ করতে লাগলেন। এক একটি মহিলা পরিচালিত কেন্দ্রে মহিলারা ওষুধ তৈরী করতেন—ইন্‌জেকশান প্রভৃতি দিয়ে ডাক্তার বাবুকে সাহায্য করতেন। চাঁদপুর, মালন্দা, ডায়মণ্ড হারবার, সরিষা প্রভৃতি স্থানে মহিলাদের কাজ খুব প্রশংসনীয় হয়েছিল। সরিষাতে রামকৃষ্ণ আশ্রমের পরিচালনায় যে সেবিকাদল গড়ে উঠেছিল—তাঁরা প্রতিদিন তিন চার হাজার দুর্গতদের খাদ্য বিতরণের কাজ করতেন। শিশুদের ভেতর দুধ ও বস্ত্র বণ্টনের কাজটাও তাঁরা সুশৃঙ্খলার সঙ্গে করতেন। একদিনের জন্যও তাঁদের কাজে এতটুকু বিশৃঙ্খলা দেখতে পাইনি। সাইকেল ব্যবহার করে ছাত্রীরা গ্রামের অসুস্থদের ঘরে রুগীর পথ্য দিয়ে এসেছেন। তাঁরা যে গ্রামগুলির সেবার ভার নিয়েছিলেন—সে সব স্থানে অনাহারে মৃত্যুর একটি ঘটনাও ঘটতে পারেনি।

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে শুনেছিলাম যে বাংলার গভর্ণর স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন যে সেখানে খুব ভাল কাজ হচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনুরোধ করে এসেছিলেন যে সরকারী গুদামে (কোনরূপ পোকায় খাওয়া) বহু মণ গম পড়ে রয়েছে সেগুলি যেন বুভুক্ষুদের খাওয়ান হয় খিচুড়ীর সঙ্গে মিশিয়ে। এ ব্যাপারটী প্রথমে

বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হয়েছিল। স্বাধীন দেশে ডাক্তারী পরীক্ষায়—সেগুলি পরিত্যক্ত হয়—সেগুলি জন্তুদের পর্য্যন্ত খেতে দেওয়া হয় না। আর এখানে মানুষের জীবনের এতটুকু মূল্য নেই বাংলার যিনি রক্ষাকর্ত্তা তাঁর কাছে। পরাধীন দেশে তাহলে সবই সম্ভব হয়।

কোন কোন গ্রামে শিল্পকেন্দ্র খোলা হল। বুভুক্ষুদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হত—কিম্বা তারা যাতে নিজেরা উপার্জ্জনক্ষম হতে পারে সে বিষয়ে যন্ত্রাদি দিয়ে বা অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হত। দুর্ভিক্ষের গোড়া থেকে সব কেন্দ্রে যদি একটি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা হত এবং শিল্পকেন্দ্র খোলা হত—তবে ওদের তৈরী শিল্পদ্রব্যের বিক্রয় লব্ধ অর্থ দিয়ে সাহায্য কেন্দ্রগুলি বেশী দিন চালান সম্ভব হত। তা হয়নি বলে প্রত্যেক রিলিফ কমিটির অর্থ একদিন ফুরিয়ে গেল। কিন্তু মানুষের পুনর্বসতি কাজ একেবারে অসম্পূর্ণ থেকে গেল। ১৩৪৯ র মন্বন্তর এমন ঝড়ের মতন এল—তার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। এর ভেতর দিয়ে একে কাজে লাগিয়ে যাঁরা একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি নিয়ে আসতে পারতেন তাঁরা সব ছিলেন কারাগৃহে। পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করবার মতন সময় বা অবসর পাওয়া গেল না। সরকারী অর্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরে ঐরূপ ব্যবস্থা করা খুব সহজ ছিল। কিন্তু যে সরকার ঐ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল—তার কাছে আর কতটুকু আশা করতে পারতাম। তারা'ত চেয়েছিল বাঙ্গালীকে একটা জীর্ণ পঙ্গু

জাতি করে রাখতে। বাঙ্গালী যাতে আর কোন দিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে—মেরুদণ্ড তার ভেঙ্গে যাক চিরদিনের মতন—এই ছিল তাদের কাম্য।

## মেদিনীপুর :—

রোগ প্রতিশেধক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী হিসাবে বহু জেলা ও গ্রাম ঘুরতে হয়েছিল। সব স্থানে ঐ এক দৃশ্য—হাজারে হাজারে গৃহহারা অন্নহীন বস্ত্রহীন জীবন্ত কঙ্কাল দল। বর্দ্ধমান মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি ঘুরে শেষে মেদিনীপুরের তমলুকে এসে প্রথম নাবলাম। সেখানে নেবে দেখি নদীর তীরে একটি খোলা জমিতে বহু নৌকা ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। খবর নিয়ে জানলাম—ঐগুলি সেই সব নৌকা যেগুলি বৃটিশ সরকার ১৯৪২ সনের আন্দোলনের পর বাজেয়াপ্ত করে রেখেছিলেন। মেদিনীপুরের ওপর দিয়ে যখন প্রবল ঝড় ও বন্যা চলে গেল—দরিদ্র দেশবাসী আকুলভাবে মিনতি করেছিল সরকার যেন সাময়িকভাবে হলে'ও ঐ নৌকাগুলি যেন তাদের ব্যবহার করতে দেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাদের এই ভিক্ষা নির্ব্বিকারভাবে উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন। যদি এই নৌকাগুলি সরকার ব্যবহার করার অনুমতি দিতেন—সহস্র দেশবাসী নাকি নিজেদের বাঁচাতে পারত বন্যার হাত থেকে—মৃত্যুর হাত থেকে।

তমলুকে ও কাঁথিতে নৌকা করে খালের ভেতর দিয়ে

দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে চিকিৎসা কেন্দ্র ও অন্য সাহায্য কেন্দ্রগুলি দেখতাম। কোন রাত্রে গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় নিতাম—কোনদিন বা নৌকাতেই রাত্রিবাস করতাম। খালের ওপর দিয়ে নৌকায় যেতে যেতে শুধু দেখতাম দুপাশের জমিতে মানুষের হাড় ও মাথার খুলি। সঙ্গে সঙ্গে দেখতাম চিল শকুনীদের উৎসব। মানুষের মাংস খেয়ে শুধু হাড়গুলি তারা ফেলে যেত। চারিদিকে প্রকৃতির শোভা কি চমৎকার। কিন্তু মানুষের জীবনের কি শোচনীয় পরিণতি। হঠাৎ একটি লাল পাড় শাড়ী দেখতে পেয়ে নৌকাটিকে কাছে নিয়ে যেতে বলা হল। কাছে গিয়ে দেখি সদ্যমৃতা একটি কিশোরী বধূ। তার কিছু পূর্ব্বেই বোধ হয় তার প্রাণ শূন্য দেহটিকে আত্মীয়েরা ফেলে রেখে গেছে। আগেই বলেছি মৃতদেহ সৎকার করবার মতন শক্তি ছিল না সেদেশের মানুষের। মৃত্যুটা এত সহজ হয়েছিল বলে মৃতের প্রতি সম্মান দেখানর মতন মানুষের মনের অবস্থাও ছিল না। আজ যে রেখে আসছে মৃতদেহকে কাল তাকেই ফেলে আসবে ঠিক অমনি করে। তাই মৃতের প্রতি এত ঔদাসীন্য। সদ্যমৃতার দেহ দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছে দু তিনটী অতি পুষ্টকায় কুকুর। তাদের দেখে মনে হয় অতি সযত্নে পালিত সাহেব বাড়ীর কুকুর।

সহযাত্রীরা ঐ দৃশ্যের একটি ছবি তুলে নিলেন। যে চোখগুলি দিয়ে আমরা দেখে নিলাম ঐ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য—তারাও একদিন কালের আবর্ত্তে বন্ধ হয়ে যাবে। তবে এত বড়

নিষ্ঠুর সত্যের সাক্ষ্য দেবে কে ? মানুষের লিপিকেও হয়তো অস্বীকার করার চেষ্টা হবে। কিন্তু ছবির কালিতে যা অঙ্কিত হয়ে গেল—তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারুরই নেই। তাই বহু ছবি তুলে আমরা সেইগুলি দিয়ে এলবাম তৈরী করে রেখেছি—তোমরা দেখবে বলে।

কিছুদূর গিয়ে দেখি একজন বৃদ্ধা মহিলার মৃতদেহটীকে শকুনীরা মিলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। বাংলার বধূর কত লজ্জা—কত সম্ভ্রম। কোনদিন সে ঘরের বাইরে আসেনি মাথায় আবরণ না দিয়ে। অসূর্য্যম্পশ্যা নারী সে—তাকে খোলা মাঠে অনাবৃত অবস্থায় কত শত দৃষ্টির সামনে ফেলে রেখে গেছে। বাঙ্গালী বিধবার কত আচার কত শুচিতা। শকুনী গৃহ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলে সে স্থান অপবিত্র মনে করে গঙ্গার পূতবারি ছড়িয়ে দিয়েছেন। আজ তাঁর দেহ নিয়েই শকুনীরা উৎসবমগ্ন। মনে হল যেন এঁদের আত্মা চিৎকার করে বলছে "আমায় লজ্জা থেকে বাঁচাও—অশুচি অবস্থা থেকে বাঁচাও"।

চোখের জল আর যেন বাঁধ মানতে চাইল না। সহকর্ম্মী একজন বললেন—বাংলা দেশে জলের অভাব নেই—অনেক জল—অনেক নদী। আগুন দরকার। আগুন দিয়ে চারিদিক জ্বালিয়ে দিতে পারেন না ?

সত্যিই ত চোখের জল ফেলে বুকের আগুন নিভিয়ে দিয়ে লাভ কি ? ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের "জীবন বেদ"

পড়েছিলাম—আগুন দরকার—মানুষের কাজে ও জীবনে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই বুঝতে হবে—যে সে মানুষ মরতে বসেছে।

মৃতদেহ দেখতে দেখতে বোধ হয় ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। কিসের যেন এক অবসন্ন ও শ্রান্ত ভাব। কাঁথিতে আমাদের সঙ্গে নৌকায় বসে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল একটি কংগ্রেস কর্ম্মী—বয়েস সতেরো কি আঠারো। অতটা পথ এক সঙ্গে চলেছি। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া—অন্য সময়ে স্থির হয়ে বসে ছিল। একটি বারের জন্যও তাকে হাসতে দেখিনি। অন্য আর একটি সঙ্গীকে প্রশ্ন করাতে জানতে পারলাম যে ১৯৪২ র আন্দোলনে অনেকের সঙ্গে ওকেও জেলে যেতে হয়। তারপর দুর্ভিক্ষের সময় কংগ্রেস কর্ম্মীর বাড়ীর লোক বলে ওর বাবা মা ভাইবোনরা সরকারী সাহায্য কেন্দ্র থেকে কোন কিছু সাহায্য পেলেন না। প্রত্যেক কর্ম্মীর বাড়ীর লোকদেরই বলা হত—"কংগ্রেস নেতাদের কাছে যাও—তাঁরা তোমাদের অভাব দূর করবেন"। কাজেই ওর বাবা মা ও আত্মীয়েরা সকলেই অনাহারের সঙ্গে যুদ্ধ করে—শেষকালে মারা গেছেন। জেল থেকে ফিরে এসে দেখে—বাড়ী ওর শূন্য পড়ে আছে। গিয়েছিল ভরা সংসার দেখে—ফিরে এল শূন্য গৃহে। এর মুখে হাসি আশা করব কি করে? সত্যিই তা পারি না। মনে মনে ভাবলাম—দেশ একদিন সমস্ত ঝড় ঝাপ্টা কাটিয়ে আলোর মুখ দেখতে পাবে—একদিন হয়তো অমানিশার কালরাত্রি ঘুচে গিয়ে পূর্ণিমার

স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখা দেবে। দেশ আমাদের স্বাধীন হবেই। কিন্তু মহাকাল ওর জীবনের এই অপূরণীয় ক্ষতির ছাপকে কি দিয়ে মুছে দেবে? কোনদিনই তা পারবে কি?

কাঁথিতে হিন্দু মিশন পরিচালিত একটি আশ্রয় কেন্দ্র দেখতে গেছি। কর্ত্তৃপক্ষ একটি ছোট রুগ্ন মেয়েকে এনে দাঁড় করালেন। কয়েকটি স্কুলের ছাত্র বাড়ী ফেরবার পথে দেখতে পেয়েছিল যে একজন মা মাটি খুঁড়ে তার মেয়েটীকে পুতে ফেলছে। সবটা ভরে ফেলে—মাথাটা যখন ঢাকতে গেছে—ছাত্ররা দেখতে পেয়ে চিৎকার করাতে মা ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেছে। গ্রামের অন্য লোকরা মেয়েটাকে উদ্ধার করে হিন্দু মিশনে দিয়ে গেছে।

মেদিনীপুরে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় মনে হত—এর ওপর দিয়ে উপর্য্যুপরি কতগুলি ঝড় ঝঞ্ঝাই না গেল। সে সবগুলিকে সামলে নেবার মতন শক্তি মেদিনীপুর পেল কোথা থেকে?

শুনেছি স্বর্গীয় বীরেন্দ্র শাসমল নাকি গ্রামে গ্রামে কাজ করে গ্রামবাসীর সচেতন মনে এক অনির্ব্বান শক্তির আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই মেদিনীপুরের কৃষক—ছেলে মেয়ে—প্রতিটী মানুষ—প্রতি আন্দোলনে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে! মেদিনীপুরের জাতীয় আন্দোলনের গতি তাই এত সাবলীল বাধা মুক্ত। মেদিনীপুরের অধিবাসী কেউ নাকি সি আই ডির কাজ করেনি এ কথাও শুনেছি। জানিনা এটা কতখানি সত্য। কিম্বা অনেকের ত্যাগের গরিমায় দুই এক জনের কালিমা ঢাকা পড়ে গেছে।



সন্তানের মা অনাহারে মারা গেছেন। সন্তানের মুখে বহুদিন এক মুঠো অন্ন দিতে পারেন নি পিতা। আমায় বললেন—অনাহারের প্রথম কদিন পেটে অসহ্য জ্বালা হোতো। এখন সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে এসেছে। কথা বলতেও বড় কষ্ট হয়। চোখে খুব অল্প দেখেন।

এমনিই বড় গরীব দেশ মেদিনীপুর। যাদের কোন জমি জমা ছিল না—কোনও ক্রমে একবেলা খেয়ে থাকত—তারা এই দুর্ভিক্ষে হয়ে গেল—পথের ভিখারী। দরিদ্র গৃহস্থ যাঁরা পথে এসে দাঁড়াতে পারলেন না—যেমন শিক্ষক কেরাণী বা সামান্য বেতনের কর্ম্মচারী—তাঁরা পরিবার সহ গৃহের ভেতরই তিলে তিলে প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁদের এ অবস্থাটা কল্পনাও করতে পারা যায় না। শুনলাম ১৯৪১ সনের আন্দোলনে মেদিনীপুর থেকে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন বা সাহায্য করেছিলেন—তাঁদের সে অপরাধের জন্য অনেক মূল্যই দিতে হয়েছে। তাঁদের বাড়ীতে যখন তল্লাসী করতে এসেছিল পুলিশ বাহিনী—যাবার সময় কাপড় জামা গহনা এমন কি গরু বাছুর পর্য্যন্ত নিয়ে চলে গেছে। প্রতিবাদ করেও প্রতিকার পাওয়া যায়নি। তাছাড়া প্রতিবাদ জানান হবে কার কাছে? যারা প্রতিকার করবে তারা নিজেরাই যে অপরাধী। একবার আমাদের একটি কর্ম্মীর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও কিন্তু শুনতে পাইনি। অন্য সঙ্গীরা বললেন যে তিনি জেলে যাবার পর তাঁর বাড়ী লুট করে সর্ব্বস্ব নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। রান্না করবার জন্য একটি পাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। জমি যা ছিল তাও সরকার নীলাম করে নিয়েছিলেন। আজ তাই তাঁকে এই দৈন্যের ভেতর দিয়ে দিন যাপন করতে হচ্ছে। কিন্তু এখনও তিনি একজন কংগ্রেসের অক্লান্ত কর্ম্মী। শত অত্যাচার অবিচারও

তাঁর জীবনের ভেতরকার ঐশ্বর্য্যকে নষ্ট করতে পারেনি। তাঁর পুত্র কন্যারা অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। অথচ তাদের মা শুধু চোখের জল ফেলেছেন কিন্তু স্বামীর ওপর একদিনের জন্যও এতটুকু অভিযোগ বা অভিমান করেননি। এই সব শুনে খালি মনে হত—রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটা লাইন।—

"বীরের এ রক্ত স্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন"?

কংগ্রেস কর্ম্মীরা যাঁরা আস্তে আস্তে মুক্ত হয়ে বাইরে আসছিলেন—তাঁরাই এই জনসেবার ভার গ্রহণ করছিলেন। কত গৃহ থেকে লুট হয়েছে—কত মহিলার ওপর অত্যাচার হয়েছে তার যে তালিকা তাঁরা প্রস্তুত করেছিলেন তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। মেদিনীপুরের মহিলা কর্ম্মীদের সঙ্গে ১৯৩২ সনের আন্দোলনে অনেকদিন যখন এক জেলে ছিলাম—তাঁদের কাছেও মেয়েদের ওপর অত্যাচারের কথা শুনেছিলাম। সমাজে যাদের স্থান নেই এমন মেয়েরাও স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার দেখে প্রতিবাদ করতে গিয়ে কত লাঞ্ছনাই না পেয়েছিলেন। বীণা ধরা পড়বার পর স্পেশাল ট্রাইব্যুনেলের সামনে যে বিবৃতি

দিয়েছিলেন তাতে উল্লেখ করেছিলেন—**শ্রীমতী** অম্বিকা দেবীর ওপর অত্যাচারের কাহিনী।

কিন্তু ১৯৪২ সনের আন্দোলনে অত্যাচারটা যেন আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন হিন্দু অফিসার মুশলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে হিন্দু মহিলাদের ওপর কত অত্যাচারই না করেছিলেন—সবই শুনতে পেলাম।

মাতঙ্গিনী দেবীর মৃত্যু বরণ ত মেদিনীপুর বাসীর কাছে এক অমর কাহিনী হয়ে আছে। স্থানীয় কর্ম্মীদের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনাটি শুনতে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। মাতঙ্গিনী দেবী গৃহে গৃহে গিয়ে আহ্বান জানিয়ে এলেন—স্বাধীনতার যুদ্ধ বেধেছে সবাইকে তাতে যোগ দিতে হবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে চারিদিকের গ্রাম থেকে দলে দলে জনতা শোভাযাত্রা করে তমলুক অভিমুখে আসতে আরম্ভ করল। আসবার পথে বড় বড় গাছ দিয়ে রাস্তা সব বন্ধ করে দিয়েছিল। শত্রুবাহিনী যাতে শীঘ্র আসতে না পারে। মাতঙ্গিনী দেবী সহস্র সৈন্যদলকে পেছনে রেখে পতাকা হাতে এগিয়ে চললেন। একটি রাজপ্রাসাদ কেন্দ্র করে পুলিশ বাহিনী তাঁদের গতিরোধ করবার চেষ্টা করল। দূর থেকে গুলি এসে তাঁর ডান হাতে লাগল, তখন অন্য হাতে পতাকা নিয়ে চললেন। শেষে বুকে গুলি লাগাতে পথের মাঝেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মেদিনীপুরের মাটি ধন্য হয়ে উঠল।

দিনের বেলা সব কেন্দ্রগুলি দেখে বেড়াই আর রাত্রে

গোপনে কর্ম্মীদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। ১৯৪২এ মেদিনীপুরে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখনও সেই সরকার গোপনে কাজ করে যাচ্ছিলেন। কর্ম্মীরা একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—তিনি হয়তো অর্থসচিব। আর একজন হয়তো গোপন বিচারালয়ের বিচারপতি। একটি গ্রামের জমিদার বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করেছিলেন। জাতীয় সরকার তাঁর কাছ থেকে সেই অপরাধের জন্য এক হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। অমুক লোকটীর অমুক অপরাধের জন্য বিচারালয়ে ছয় মাসের জেল হয়েছে। সেই ছয় মাস তাকে বন্দী অবস্থায় কোথায় রাখা হল—পুলিশের লোক কিছুতেই জানতে পারল না। মেদিনীপুরের কর্ম্মীদের এই অসামান্য কর্ম্মশক্তি দেখে মাথা আপনিই নত হয়ে উঠত। একদিন সত্যিই আমাদের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। বিচারালয়, অস্ত্রাগার, সরকারী অফিস সবই আমাদের নিজেদের হবে—এই কল্পনা করে সেদিন মনে কি আনন্দই না পেয়েছিলাম। কল্পনায় স্বাধীন ভারতের এক অপরূপ রূপ দেখতে পেয়েছিলাম সেদিন।

বাংলার এই দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালীর অর্থ-নৈতিক জীবনটাকে ভেঙ্গে দিয়েছিল সত্যিই। কিন্তু তার চেয়েও যেন বেশী ক্ষতি করেছিল তার নৈতিক জীবনের। অভাব দারিদ্রতা সব মিলিয়ে মানুষকে অনেক নীচে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এইটাই বাঙ্গালীর সব চেয়ে বড়।

নৌকা করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন অনেক দিনের পুরান

সহকর্ম্মীকে দেখতে পেলাম। আগে তাঁর ছিল অটুট স্বাস্থ্য অফুরন্ত কর্ম্মশক্তি ও উদার মনোভাব। এত বছর পরে দেখি তাঁর সেই স্বাস্থ্য আর নেই। সেই মানুষ যেন কেমন করে কতখানি বদলে গেছেন। বিশেষ করে অনুরোধ করলেন তাঁর গ্রামে নৌকা বাঁধবার জন্য। তাঁর বাড়ীতে একদিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করতেই হবে। পুলিশ তাঁর বাড়ী থেকেও অনেক কিছু লুট করে নিয়ে গিয়েছে বলে শুনলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন বোম্বাইয়ের শ্রীমূলরাজ মেটা। তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলাকে সেবা করবার জন্য বাংলাদেশে এসে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। শেষে বাংলা সরকারের বন্দীশালায় অনেকদিন আতিথ্য স্বীকার করতেও হল। পথে যেতে যেতে পুরান দিনের সহপাঠি শ্রীযুক্ত মেটার থেকে দশটী টাকা চেয়ে নিয়ে হাট থেকে বাজার করে নিলেন। বললেন বাড়ী পৌঁছেই টাকাটি দিয়ে দেবেন। অনেক রাত্রে আহার শেষ করে ফিরে আসবার সময় তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম সেই দশটী টাকা ফিরিয়ে দেবার কথা। তিনি খুব সহজভাবেই জানিয়ে দিলেন যে টাকাটী তিনি ফেরত দেবেন না। পরে যদি সম্ভব হয় পাঠিয়ে দেবেন ইত্যাদি। ঘটনাটি হয়তো সামান্য। কিন্তু কি রকম এক দুঃখের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল। কত লজ্জা কত গ্লানি। সেই যৌবনের উচ্ছ্বলিত সজীব সুন্দর প্রাণ এমনভাবে মরে গেল কি করে? দুর্ভিক্ষের করাল হস্তে পার্থিব দেহের মৃত্যু বেশী দুঃখের—না যৌবনের

এই অপমৃত্যু বেশী দুঃখের—এই প্রশ্নটাই বার বার মনের কোণে দেখা দিচ্ছিল।

এই ধরণের মৃত্যু আরও বহু স্থানে দেখতে হয়েছে। মেদিনীপুর একটি সরকার পরিচালিত মহিলা আশ্রয় কেন্দ্রে দেখতে গিয়েছিলাম। প্রায় এক হাজার মহিলা, ছেলে মেয়ে নিয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই স্বামীরা দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেই নিজেদের সংসারের দায়িত্ব ভার বহনে অপারগ মনে করে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। হয়ত কোন জায়গায় কোন কাজ জোগাড় করে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন। কিম্বা জীবন সংগ্রামে শেষ অবধি লড়াই করে শেষে প্রাণত্যাগ করেছেন। বেশীভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদেরই শুধু খাওয়ানর ব্যবস্থা হয়েছিল। পুরুষরা তাই সংখ্যায় মারা গেছেন অনেক! অন্যান্য কেন্দ্রের মতন এখানেও মেয়েদের প্রশ্ন করলাম—"তোমরা ত সেদিনও সুখে না হোক কোনও মতে স্বামী পুত্রকন্যা নিয়ে দুটি খেয়ে বেঁচে ছিলে। আজ তোমাদের এমন অবস্থায় আনল কে? সবাই সেই একই উত্তর দিত—আমাদের ভাগ্য—আমাদের গত জীবনের কর্ম্মফল। কলকাতার খাবারের দোকানের সামনে ভিখারী দলকে কখনও কখনও বলতাম—যাওনা দোকানটা লুট করে একদিনের জন্যও খেয়ে নাওনা। ওরা বলত—গত জন্মের পাপের ফলে এ জন্মে এই দুর্গতি। আবার পরের জন্মের দুঃখ বাড়িয়ে রাখব কেন? মেদিনীপুরের সেই আশ্রয় শিবিরে মেয়েদের দেখে মনে হত—এঁদের

বাঁচিয়ে রেখে সমাজের কিছু লাভ হল কি না। সমাজের ভার স্বরূপ করে তাদের বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি? স্বামীর শোক, ঘর ভাঙ্গার দুঃখ যেন এরা ভুলতে বসেছে। বড় সাহেব অফিসার এলে--তারা শুধু তাদের ছোটখাট অভিযোগই জানাবার জন্য উৎসুক। সাহেবকে তারা বলতে লাগল--"সাহেব তুমি আমাদের বাবা"। কে তাদের বন্ধু, কে তাদের শত্রু তাও তারা বুঝতে পারে না। ওরাই যে ওদের এই অবস্থার জন্য দায়ী তাও বোঝবার মতনও ওদের মনের শক্তি নেই। গরু মেরে জুতা দানে কোন মহত্ব আছে কি?

তোমাদের ত কোনদিন বেশী কিছু দাবী ছিল না—স্বামী পুত্র নিয়ে মাথা গোঁজবার আশ্রয়—দুবেলা পেট ভরে দুটি অন্ন—আর পরবার মতন একটু বস্ত্র। তবু তোমাদের সেই ছোট সংসারটী আজ ভেঙ্গে গেল। কে এর জন্য দায়ী? ওদের মনের ভেতর কিন্তু এ সব প্রশ্ন আসত বলেও মনে হল না। ওদের কিছু কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না কেন এই কথা বারবার জিজ্ঞাসা করেও কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন উত্তর পেলাম না। ওদের ভেতর আত্মসম্মান জাগিয়ে তোলা দরকার নয় কি? বসিয়ে খাইয়ে ওদের আত্মাকে যে মেরে ফেলা হচ্ছে। চট্টগ্রাম ও আরও অন্য স্থানে বহু অভিযোগই শুনতে পেয়েছিলাম। ঐরকম মেয়েদের জীবন নিয়ে খেলা চলেছে। চট্টগ্রামে একজন বললেন—সন্ধ্যার অন্ধকারে পথে দাঁড়িয়ে থাকবেন দেখবেন কি দৃশ্য। সত্যিই

দেখি সারি বেঁধে ওরা কারা চলেছে—কোথায় চলেছে, কেন চলেছে? কে তার উত্তর দেবে? মেয়েদের অসহায় অবস্থার সুযোগ কি এমনি করেই নিতে হয়? তাদের শরীরকে মরতে না দিয়ে আত্মাকে মারলে কি সমান অপরাধই হয় না?

শুধু ঐ দরিদ্র সমাজের নিম্নস্তরের মেয়েদেরই অমন অবস্থা হল তা নয়। গৃহস্থ ঘরের অনেক মেয়েরাও অনাহারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কোথায় যে নেবে গিয়েছিল। তাই খালি মনে হয় যে দুর্ভিক্ষ আমাদের নৈতিক জীবনে এই যে ক্ষতি রেখে গেছে তা কি দিয়ে এবং কেমন করে পূরণ করা যাবে? এ ক্ষতির পরিমাপও যে করা চলে না। বাংলাদেশে বহু জেলে তাঁতি, কামার, স্বর্ণকার মারা গেছে। তাতে সমাজের অনেকখানিই ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের ঐরকম অস্বাভাবিক মৃত্যু যে সমস্যার সৃষ্টি করে গেল তার সমাধান কোথায়? তাছাড়া অভাব ও দুর্যোগে চরিত্রের বল হারিয়েছি—প্রলোভনকে জয় করবার শক্তি হারিয়েছি। একনিষ্ঠ কর্ম্মীদের ভেতরও দেখেছি দুর্ব্বলতা কতরকম প্রকাশ পেয়েছে। একজন কর্ম্মী রাজবন্দী ছিলেন - কত ত্যাগ কত বীর্য্য তাঁকে মহীয়ান করে তুলেছিল। তাঁকেও দেখেছি জীবন সংগ্রামে সম্পূর্ণ পরাজিত। দুর্ভিক্ষ সংসারের নানা বন্ধনে জড়িত জীবনে এক বিভীষিকার রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি তাই বাঁচবার জন্য ও পরিবারকে বাঁচাবার জন্য আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এই যে গ্লানি—ত্যাগীর জীবনের এই



প্রশ্ন করে জানলাম—ইনি এতদিন জমি, বাড়ীঘর, স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে সুখেই জীবনযাত্রা চালিয়ে এসেছিলেন। দুর্ভিক্ষ তাঁকে পথের ভিখারী করে দিয়েছে। আগের দিন রাত্রে শোক, অভাব ও অনাহারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নিজের জীবনদীপ নিজের হাতেই নিভিয়ে দিয়েছেন।

কালিমা এ যে কাউকে বলবার নয়। এ দুঃখ যে প্রকাশ করতে পারা যায় না। তারা যে আমাদের বড় আপন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য বন্ধন—এ বন্ধন গড়ে উঠেছে সমান চিন্তা সমান দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে। তাই তাঁদের ছোট করতে পারিনি কোন দিন।

কিন্তু এত দৈন্যের মধ্যেও মহত্বের দীপ্তি কি দেখতে পাইনি একটু? পেয়েছি বৈকি। গাঢ় অন্ধকারেও কয়েকটী জীবনকে দেখেছি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে।

ঢাকার কোন মহকুমার কর্ম্মী বেঙ্গল রিলিফ কমিটি অফিসে আসেন মাসের প্রথম দিকে। নীরবে আসেন রিপোর্ট দেন ও চলে যান। নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা কোনদিনই এঁকে বলতে শুনিনি। একদিন শুক্রবার এসে সব ঔষধ পথ্যাদি নিয়ে গেলেন। যাবার আগে পুনর্বসতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করলেন—বেঙ্গল রিলিফ কমিটি থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া যেতে পারে কিনা প্রশ্ন করলেন। যারা বেঁচে রইল তাদের কি করে স্বগৃহে স্ব-কাজে নিযুক্ত করা যায় সে সম্বন্ধে অনেক ভেবেছেন। জেলেকে তার জাল যদি কিনে দেওয়া যায় বা ধার স্বরূপ জাল কেনবার টাকা দেওয়া যায়—তবে আবার সে স্বাভাবিক জীবন ধারণে সমর্থ হয়। আলোচনা করে তিনি চলে গেলেন। রবিবার নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে পৌঁছেই তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে সুরু করে। দু তিন দিনের ভেতরেই তিনি কর্ম্মজীবন শেষ করে চলে গেলেন। পরে শুনেছিলাম যে তিনি কোন

বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হওয়ার পর বিদ্যালয়টী বন্ধ হয়ে যায়। বেশী ভাগ ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল। যারা ছিল তারাও মাহিনা দিতে অসমর্থ ছিল। বহু দিনই তাই তাঁকে অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়েছিল ও কাজ করতে হয়েছিল। কোনদিন তাঁর নিজের জন্য কোন সাহায্য তিনি আমাদের থেকে দাবী করেন নি। নিজে না খেতে পেয়ে কতদিন আর কাজ করতে পারবেন—গ্যালপিং থাইসিস হয়ে মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিবারের স্ত্রী পুত্রদের কি অবস্থার ভেতর পড়তে হল সে কথা আর ভাবতে পারিনি—চেষ্টাও করিনি কখনও।

মেদিনীপুরের একটি কর্ম্মী—অল্প দিনের জেল খেটে বাইরে এসে—একটি গ্রামের চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনার ভার নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। সেই চিকিৎসা কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে গ্রামে গ্রামে সেবাদল গঠন প্রভৃতি অনেক কাজই করছিলেন। কিছুদিন হল চিঠি পত্র রিপোর্ট অন্য নামে আসাতে খবর নিয়ে জানিলাম—হঠাৎ তাঁর যক্ষ্মা রোগ দেখা দিয়েছে। শয্যাশায়ী হয়ে কলকাতার কাছে এক গ্রামে পড়ে আছেন। তিনি দরিদ্র কর্ম্মী। তাঁর জন্য স্যানিটারিয়াম ব্যবস্থা করা খুবই কষ্টকর ছিল। তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম কদিন পরে। যাঁকে দেখেছি স্বাস্থ্যবান তরুণ—গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছুটে ছুটে কাজ করেছেন—আজ বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে আছেন অনেক দিন থেকে অল্প অল্প জ্বর হচ্ছিল। পরিশ্রম ও খাদ্যাভাবে অসুখ খুব

বেড়ে যায়। একদিনও তাঁর নিজের অসুখ বা সাহায্যের কথা লিখে চিঠি দেননি। বাঁচবেন না মনে করে একবার শুধু দেখতে চেয়েছিলেন। গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেছে—কাগজে লিখে দিলেন—

দিদি—আমি এমনভাবে মৃত্যু কামনা করিনি। আমি চেয়েছিলাম—সংগ্রাম ক্ষেত্রে সৈনিকের মতন দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে বরণ করব।

আর একটি সহকর্ম্মীকেও বড় মনে হয়। বহু বৎসর পরে যখন জেল থেকে বার হয়ে এসেছিলেন তখন তিনি এলেন পঙ্গু হয়ে। জেলের ভেতর ত আঘাত পেয়ে একটি পা তাঁর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই একটি পা নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি কাজ করতেন অহোরাত্র নির্যাতিত বন্দীদের সাহায্যের চেষ্টায় আর দুর্গতদের সেবায়। একবার শুধু বলেছিলেন—"যদি কোনদিন বুঝতে পারি আমাকে দিয়ে দেশের কাজ আর হবে না—আমি অন্যের ভার হয়ে পড়েছি—সেদিন এই ভাঙ্গা জীবনটাকে শেষ করে দেব"। একদিন দেখি বাড়ীতে—সিঁড়ি দিয়ে কষ্ট করে উপরে উঠে আসছেন। পরের দিন সন্ধ্যায় বন্দী-সাহায্য কমিটীর একটি জরুরী সভা। অন্য যে কোনদিন যেতে পারি কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যায় যাওয়া কিছুতে সম্ভব নয় বলে ক্ষমা চাইলাম। ধীরে ধীরে তিনি চলে গেলেন। তারপর প্রায় দিন কুড়ি চলে গিয়েছে। খবরের কাগজে দেখতে পেলাম—"অমুক মুক্ত রাজবন্দী অমুক স্থানে গাছে গলায় দড়ি দিয়ে নিজের জীবন শেষ

করে দিয়েছেন"। এঁর কথা মনে হলেই মনে হয় আমাদের কস্‌বার বিপ্লবী আলোক দাদাকে।

আর একটি ছেলের কথা মনে হলে প্রণাম করতে ইচ্ছে করে। তার নাম ছিল গোরা। ছোটবেলা থেকে এক্‌জনদের বাড়ীতে থেকে মানুষ হয়েছে। খুব ডানপিটে ছেলে। প্রায়ই পাড়া থেকে ওর নামে নালিশ আসত। অমুকের বাড়ী থেকে ঘোড়া বার করে নিয়ে ঘুরে এসেছে। স্কুলের বেঞ্চি কে ভেঙ্গে রেখে গেছে। মাষ্টার মশাইরা বললেন—এ কাজ গোরা ছাড়া আর কারুর নয়। তারপর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে গোরা বৈপ্লবিক দলে যোগ দিয়েছিল। যত কিছু সাহায্যের কাজ সব কিছুই গোরাকে দিয়ে করান সম্ভব হোত। রিভলভার এক বাড়ী থেকে করাতে হবে। গোরাকে খবর দেওয়া মাত্র কেমন করে যেন সরিয়ে কোথায় নিয়ে গেলো। পুলিশ তল্লাসী করে কিছু পেল না। এমন কাজ নেই যা ওকে দিয়ে করান যেত না। প্রত্যেক বাড়ীর বৌ ও মেয়েদের ও বন্ধু তাদের যা কিছু ফরমাস সব ওকে দিয়ে করান হত আর বাড়ীতে যে অসুখই হোক না কেন—সকলেই দেখতো গোরা খবর পেয়ে সেখানে বসে আছে। তাই তাকে ভালবাসত বৃদ্ধ বৃদ্ধা বাড়ীর বৌ মেয়েরা—সব ছেলে মেয়েরা। বিশেষ করে গরীবদের সে ছিল বন্ধু। পুলিশের লোকরাও নাকি তাকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। বহু বছর জেল খেটে যখন সে ফিরে এল—মনটা তার তেমনি সবুজ ছিল। কিন্তু শরীরটা গিয়েছিল একেবারে ভেঙ্গে। কলকাতায় আমাদের

বাড়ীতে রাখা হল—ভাল খাওয়া ও চিকিৎসা দিয়ে যদি তাকে আবার সুস্থ করিয়ে তোলা যায়। প্রায় বলত—কাকিমা আমি যদি কারুর কাজে না লাগতে পারি তবে আমি এ জীবনটাকে রেখে কি করব? কতদিন তাকে কত বুঝিয়েছি। শীঘ্রই সুস্থ হবে—আবার আগের মতন দেশের কাজে লাগাবে জীবনটাকে।

—একদিন সন্ধ্যায় তার বাড়ীতে আসবার কথা। সেদিন সে এল না। তারপর অপেক্ষা করে করে অনেক বছর কেটে গেছে। সে আর ফিরে এলনা। বোধ হয় যে জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্ত সে দিয়েছিল দেশের সেবায়, মানুষের সেবায়—সেটা অকেজো হয়ে পড়াতে তাকে শেষই করে দিল। তার কাছে যা অকেজো প্রয়োজনহীন—তার মূল্যই বা কতটুকু? হোক না সেটা তার নিজের রক্ত মাংসের শরীর?

বাংলার এই দুর্ভিক্ষের দিনে সামান্য কাজ করবার যে সুযোগ পেয়েছিলাম—তার জন্য কত যে কৃতজ্ঞ হয়ে রয়েছি দুজনের কাছে—একজন ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও আর একজন শ্রীভাগিরথমল কানুরিয়া। এঁদের কাছ থেকে সুযোগ না পেলে হয়তো কোন কিছু করতে না পেরে শুধু বুক ভরা দুঃখ নিয়েই ফিরে যেতে হত সেই সুদূর প্রবাসে বোম্বাইতে।

এই সময় থেকে কাজের ভেতর দিয়ে আর একটি অভিজ্ঞতা লাভ করলাম সেটা ভাবলে মনটা সত্যিই ভারাক্রান্ত

হয়ে ওঠে। জন সাধারণের অর্থের বা অর্থ দ্বারা ক্রীত জিনিষের হিসাব চাইলে কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে উঠতেন। মনে পড়ে একটি কেন্দ্রে গেছি সেখানকার কাজ দেখতে। বহু বৎসরের কর্ম্মীর হাতেই সব ভার দেওয়া ছিল। কাজের ও অর্থের হিসাব চাইলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বললেন "আপনিও আমার কাছে হিসাব চাইবেন তা কখনও আশা করিনি। আমার সংসারের অবস্থা ত আপনি জানেন" জানি সবই—মেয়ে বড় হয়েছে অর্থাভাবে বিবাহ দিতে পারা যাচ্ছে না—স্ত্রী অসুস্থা চিকিৎসা হয় না। ছেলে মেয়েরা দুবেলা খেতে পায় না। কিন্তু আমিও যে নিরুপায়। জন সাধারণের দেওয়া অর্থের একটি পয়সারও যে আমাদের হিসাব দিতে হয়। কত নিষ্ঠুরই যে তখন হয়েছিলাম। মনে হয় আর একটি ঘটনা। একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কমিটির সভায় কমিটিরই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাশিয়ার জন্য প্রতি গৃহের দরজার বাক্স ধরে "রাশিয়াকে নিয়ে মদৎ করিয়ে বলে এক পয়সা চার পয়সা করে যে কয়েক শত অর্থ সংগ্রহ করেছিলাম তার হিসাব ও যথাস্থানে পাঠান হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন প্রায় এক বছর পরে করাতে কি অপমানটাই না মাথায় পেতে নিতে হয়েছিল। এই অর্থ-ভাণ্ডারের সম্পাদক চিৎকার করে প্রতিবাদ করে উঠলেন—আমার ঐ হিসাব চাওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে। আমি অত্যন্ত হীন ও হিংসা প্রবণ মানুষ। কোন সভ্যই আমার হয়ে একটি কথা বললেন না বোম্বেতে আর একটী

রাজনৈতিক দল পরিচালিত প্রদর্শনীর জন্য খুবই পরিশ্রম করলাম। এক মাস ধরে প্রায় প্রতিদিনই রাত্রে পরিচালক সমিতির সভা বসত। প্রদর্শনীর এক সপ্তাহ কালীন কার্য্য-সূচীর (গান বাজনা) ব্যবস্থা করলাম। তারপর চার বৎসর হয়ে গেল—আজ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ একটি সভা ডাকলেন না বা হিসাব দিলেন না। কোন সময়ে মনে করিয়ে দিলে বিরক্ত হতেন।

মাঝে মাঝে মনে হয়—তবে কি আমরা এখনকার কর্ম্মক্ষেত্রে একেবারে অনুপযুক্ত? কমলার সঙ্গে দেখা হলে শুনি ওর জীবনেও এইরকম সমস্যা এসে গেছে। অমৃত বাজারের ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে বীণাকে কি তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে না যেতে হয়েছে ও এখনও হচ্ছে। ওর ইউনিয়ন ছিল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত। অথচ শেষ অবধি সংগ্রাম করতে হল ওকে প্রায় একা। একদিকে প্রচুর অর্থ ও সরকারের অনুগ্রহ—অন্যদিকে নিঃসম্বল বীণা তার নীতিগত মতবাদ নিয়ে। জানিনা শেষ পর্য্যন্ত কে জয়ী হবে? অর্থ না আদর্শ?

আর একটি কথাও বারবার মনে হয় যখন এখনকার কর্ম্মজীবনের কথা ভাবি। পরস্পরকে আমরা এত আঘাত দিতে ভালবাসি কেন? কেউ হয় তো উদ্যোগী হয়ে কোন একটি বড় কাজের দায়িত্ব নিল। আমরা প্রতি পদে তার ত্রুটি খোঁজবার চেষ্টা করি। সার্থকতা সে যতখানি দিল তার জন্য এক বিন্দু কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে—উৎসাহ না দেখিয়ে

শুধু কোথায় ব্যর্থতা আছে বা হতে পারত তাই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করি। ছোটখাট ত্রুটি নিয়ে তাকে বিব্রত করলে যে তার কর্ম্মজীবনকে আমরা মেরে ফেলছি সেটা বুঝতে পারি না। এবারে এত আঘাত পাওয়ার পর সে আর কর্ম্ম প্রেরণা খুঁজে পাবে না তার ভবিষ্যৎ জীবনে। যে কেউ দায়িত্ব নেয়—তাকে বিচার করব তার সততা দিয়ে তার কর্ত্তব্য নিষ্ঠা দিয়ে। তাকে জানাতে হয় যে সকলের পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আছে তার ওপর। নয়তো বড় কাজ কাউকে দিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তাকে বিশ্বাস করা—তাকে সাহায্য করার অর্থ প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এই পরস্পরকে আঘাত করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করা হয়ে যায়। এই যে আমরা শুধু অন্যকে অভিযোগ করেই চলি তার পেছনে কি শুধু স্নেহের অভাব না আরও কিছু? বুঝতে পারি না কিছুতেই। পরস্পরকে কেন আর একটু বুঝতে চেষ্টা করি না?

## উদ্বাস্তু শিবির ঃ—

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে বাবাকে দেখতে কলকাতা যাবার পথে আসানসোলে এক হপ্তা থাকা কালে দিদির সঙ্গে বর্দ্ধমান রেফিউজি ক্যাম্পগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে গেলাম। মোটরে সরকারী অফিসারদের স্ত্রীরাও যাচ্ছেন ক্যাম্পগুলি দেখতে। ক্যাম্পগুলিতে আসার আগে তাঁরা



বাংলার ঘরের কুলবধু আজ ঘরের বাইরে এসে সন্তান নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ভ করতে বাধ্য হয়েছেন।

বললেন "আমরা কিন্তু যাচ্ছি ঝি সংগ্রহ করতে। বড় কষ্ট পাচ্ছি ভাই ঝি চাকরের অভাবে। মনটা যে কি এক দুঃখ ও অপমানে ভরে গেল তা এখনও ভুলতে পারি না। ওঁরা সর্ব্বস্ব হারিয়ে এসেছেন—স্বাধীনতার মূল্য দিয়েছেন। সবইত ওঁদের ছিল—ঘর বাড়ী জমি গরু বাসন বিছানা বাক্স। সামান্য একটী জিনিষ হারিয়ে গেলে কত আমাদের ক্ষোভ। তবুও আমরা বুঝব না সর্ব্বস্ব হারানর কতখানি ব্যথা? এঁদের এত বড় ক্ষতি পূরণ করব আমরা বাড়ীর ঝি চাকর করে! তারপর যদি এরা কোনদিন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে আমার বাড়ীতে—তখন বলব "ঝি চাকরদের স্পর্দ্ধা সীমা ছাড়িয়ে গেছে।"

শিবিরগুলি ঘুরে ঘুরে এক জিনিষই দেখলাম। ছেলে মেয়েদের গায়ে জামা নেই। বৃদ্ধারা বলছেন—বিছানা লেপগুলিও ওরা আটকে রাখল—শীতে বড় কষ্ট মা"। প্রত্যেকটী মায়ের কোলে ও আশে পাশে অন্ততঃ চার পাঁচটী ছেলে মেয়ে। তাঁদের কাপড় ময়লা ও জীর্ণ। একটি বড় ব্যারাকে সাত আটটী পরিবার আশ্রয় নিয়ে আছেন। কেউ মাটির হাঁড়িতে—কেউ পুরাণ কড়ায় রান্না করছেন। উপযুক্ত পুরুষদের মাসিক ভাতা বন্ধ হবার খবর এসেছে। অথচ ওদের উপার্জ্জন করবার কোন ব্যবস্থাই নেই। একজন ভদ্রলোক দেখালেন কিছু কাঠের জোগাড় করে তিনি একটি তাঁত তৈরীর চেষ্টা করেছেন—কিন্তু দুমাস ধরে বহু আবেদন করেও সরকারের থেকে তাঁতটী শেষ করবার খরচ বাবদ

সামান্য টাকাও পাচ্ছেন না। সকলের কাছে এক অভিযোগ শিশু সন্তানদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। যে কোন অসুখ হলেই একটা জল বিশেষ ওষুধ দেওয়া হয়। কত শিশু যে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। মৃতদেহ সৎকার করবার কোন ব্যবস্থা নাই। আশে পাশের জমিতে সৎকার করবার অনুমতি নাই। অস্থায়ী বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখি—যেখানে ২০ জন বসতে পারে সেখানে অন্ততঃ একশত জনকে বসান হয়েছে। মাষ্টার মশাইএর হাতে প্রকাণ্ড বেত। ঐ অবস্থায় বসে আবার বেতের আঘাত ওরা সহ্য করবে কি করে? খালি মনে পড়ত সেই দুর্ভিক্ষের সময়ের চিত্রগুলি। তখনও শুধু দলে দলে হাজারে হাজারে ভিখারীর বেশে মানুষকে দেখেছি। আবার সেই দৃশ্য এমনভাবে দেখতে হবে দেশ স্বাধীন হবার পর? তখন সান্ত্বনা ছিল—দেশ স্বাধীন হলে মানুষকে এই এক অস্বাভাবিক অবস্থার ভেতর আর কোনদিন আসতে হবে না। যাঁরা বাড়ী ঘর ছেড়ে এসেছিলেন—তাঁরা হয়তো একদিন আবার গ্রামে ফিরে গিয়ে ঘর বাঁধতে পারবেন কিন্তু এঁরা ত আর ফিরে যেতে পারবেন না। সামান্য দু'চার টাকায় এঁরা যে সব বিক্রী করে এসেছেন। না করলেও তাঁদের ঘর বাড়ী কি আর ফিরে পাবেন? পেলেও শুধু ভাঙ্গা বাঁশ ও খড় বিহীন ঘরখানি। একজন মহিলা বললেন—খাটের নীচে অনেক মণ সুপারী রয়ে গেল। আর একজন বললেন—গোলায় ধান রয়েছে কত—এখানে কতদিন যায়—রান্নাই চড়ে না ছেলে মেয়েরা কেঁদে কেঁদে

শুতে যায়। পুরাণ টিনের কৌটা জোগাড় করে যেদিন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—এক একটি পাবার জন্য মহিলাদের ভেতর কি চিৎকার—কি কাড়াকাড়ি।

দুর্ভিক্ষের সময় একটি ছেড়া জামা পাবার জন্য মহিলারা কি অবস্থার না সৃষ্টি করেছিলেন। চারিদিক থেকে এমন ভাবে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছিল যে দানের পর্ব্ব শেষ হবার পর দেখি আমার হাত দুটি আঘাতে আঘাতে লাল হয়ে গিয়েছে। সব হারাতে হয়েছে—যা সামান্য পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে আর কেউ বঞ্চিত হতে চান না। যেদিন দিদিরা মাথার চিরুণী সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন—লাইন করে মাথায় কাপড় দিয়ে বড় ঘরের মহিলাদের আসতে দেখে—দিদির চোখে জল এসে গিয়েছিল। উঃ বুকে তাঁদের কি অপমানের জ্বালা। সামান্য একটি চিরুণীর জন্য ঘণ্টা ধরে লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকা। সবাই মিলে দেখলাম একটি বিধবা মহিলাকে—কাপড়ে তাঁর রক্তের দাগ—স্বামী পুত্র আত্মীয় সকলকেই হত্যা করা হয়েছিল তাঁর সামনে। তিনি আজ এত বড় বিশ্বসংসারে একা। সব শিবিরগুলি ঘুরে বিকালে মোটর করে বাড়ী ফেরবার সময় আবার শুনলাম "দেখলেন ত কাণ্ডটা—ওখানে অত কষ্ট করে রয়েছে—তবু বাবা মারা মেয়েদের দিল না আমাদের বাড়ীতে কাজ করবার জন্য"। ঝি চাকর হওয়াতে কিসের অপমান?

কলকাতায় গিয়ে আশে পাশের শিবিরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখি সেই একই অবস্থা। সকলের মুখে কি এক বিষাদের

ছায়া। কোন দিকে এতটুকু আলো নেই। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি মনে করছেন—যারা আসছে তাদের আসার কোন দরকারই ছিল না—তারা যেন এখুনি ফিরে যায়। পাকিস্থান সরকার সমস্ত রকমের সুখের ব্যবস্থা করে দেবেন।

বুভুক্ষু উদ্বাস্তুদল জহরলালজী এসেছেন শুনে তাঁর কাছে আবেদন জানাতে এলেন। পথে তাঁদের ওপর লাঠি চলল। মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে ফেলে দিল স্বাধীন দেশের পুলিশ বাহিনী। ছাত্ররা প্রতিবাদ করতে গিয়ে গুলির আঘাতে প্রাণ দিল। উদ্বাস্তুদের একজন কর্মী শেয়ালদহ ষ্টেশনে অনশন করলেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে বীণা ও আরও দশজন বিশিষ্ট কর্মীর সঙ্গে দেখা করলাম। গুলি বন্ধ করতেই হবে—ছাত্রদের মৃতদেহ জনসাধারণের হাতে দিয়ে দিতে হবে। ১৪৪ ধারা সহর থেকে উঠিয়ে ফেলতে হবে। শেষের দাবীটার উত্তরে বললেন ডাক্তার রায়—"১৪৪ ধারা উঠিয়ে দিয়ে রাজ্য শাসন করতে পারব না—তোমরা এসে এই চেয়ারে বস"।

আর একদিনও যখন বলতে গেছি—ষ্টেশনে উদ্বাস্তু একজন এতদিন অনশনে আছেন—একবার তাঁর কাছে চলুন"। আমায় বারবার বললেন পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী—"ওদের যদি সত্যি ভাল চাও—ওদের ফিরে যেতে বল"। খুলনার সেই প্রোফেসারের দুটি মেয়ের কথা জেনেও তিনি কি করে বলতে পারেন যে সবাই স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে ফিরে যাক? পূর্ব্ব বাংলার হিন্দুকে স্বাধীনতার মূল্য

কতখানি দিতে হয়েছে তাত জানি। আজও তার শেষ হল না। শুধু তারা দিয়েই চলেছে—পুরস্কার শুধু লাঞ্ছনা—অপমান—অভাব দারিদ্র্য।

বীণা ট্রেণে করে আসতে শুনতে পেল—সালঙ্কারা সুসজ্জিতা পশ্চিম বঙ্গের মহিলা বলছেন "আমাদের অমুক জায়গার বস্তিতে ওরা এসে বসেছে। খেতেই পায় না আবার ভাড়া দেবে কোথা থেকে?—সেখানে কি নদী ছিল না সব ডুবে মরতে পারল না—এখানে আমাদের হাড় জ্বালাতে কেন এল"?—এখন একা বসে থাকলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই সব শিক্ষকদের ম্লান ব্যথাতুর মুখগুলি। পাকিস্তানে ছাত্র নেই—বিদ্যালয় বন্ধ। চলে এসেছেন দলে দলে। চাকুরীর সন্ধানে দিন রাত্রি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ কেউ একবার মাত্র সামান্য টাকা পেয়েছেন সরকারের থেকে। সঙ্গে যা এনে ছিলেন সব ফুরিয়ে গেছে। সকাল থেকে উঠে ওঁদের জন্য পশ্চিম বাংলার বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠিতে আবেদন করি। খুব অল্প স্থান থেকেই উত্তর আসে।গ্রামে কত বিদ্যালয়ের অভাব। অর্থবান গ্রামবাসীরা যদি এঁদের নিয়ে নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করেন—কাগজে আবেদন করি। লোক-সেবক, যুগান্তর ছাপাল। অন্য কাগজরা কিছুই করিল না।

এক বছর পরে আবার প্রবাসে ফিরে এলাম। মাঝে মাঝে ভাবি—সেই সব শিক্ষক বন্ধুরা আজ কি সমুদ্রে কুল পেয়েছেন? বড় জানতে ইচ্ছা করে। যাঁদের জন্য শত চেষ্টা করেও

কিছু করতে পারিনি—তার মধ্যে থেকে একজনের চিঠি পেলাম হঠাৎ "দিদি বাংলা দেশ থেকে বহু দূরে একটি চাকুরী পেয়েছি—জীবনের চরম দুর্দিনে আপনাকে পাশে পেয়ে ছিলাম সে কথা কোন দিনই ভুলব না। আপনার স্বাস্থ্য ও সুখ কামনা করি"। এমনি আরও চিঠি পেয়েছি।

এঁদের এই শুভ ইচ্ছা ও মঙ্গল কামনা প্রবাসী জীবনের কত দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। এখন ত আপ্রাণ পরিশ্রমের ও নিঃস্বার্থ কাজের বিনিময়ে শুধু পাই তীব্র সমালোচনা ও অভিযোগ। এতটুকু প্রীতি দরদ সহানুভূতি শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি নেই। প্রাণটা যেন হাঁফিয়ে ওঠে।

**সমাপ্ত**

# বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে যে টুকু দেখেছি—

প্রথম তাঁকে দেখেছি দূর থেকে দর্শকদের পাশে বসে। বর্ষামঙ্গল উৎসব হল—তিনি নিজে আবৃত্তি করলেন—"নাচেরে আমার হৃদয় ময়ূরের মত নাচেরে"। তারপর দেখলাম তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বসবার ঘরে। ছাত্রীদের এক সভায় তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবার জন্য দেখা করতে গেলাম এক বন্ধু ছাত্রীর সঙ্গে। কোন পরিচয় পত্র নেই—শুধু দুটি ছাত্রী এসেছে শুনে দেখা করতে এলেন। প্রণাম করতে গিয়ে মনে হল—মানুষের পা এত সুন্দর হয়—এত শুভ্র এত নরম। বললেন "তোমরা তোমাদের সভায় নিয়ে যেতে চাও—খুব আনন্দ হল—কালই আমি শান্তিনিকেতনে ফিরে যাচ্ছি। এর পর যখন আসব তখন মনে করে আমায় নিয়ে যেও। ছাত্র ছাত্রীদের দাবী আমার ওপর অনেক খানি তাকে আমি অস্বীকার করবার ক্ষমতা রাখিনা—তারাও যেন সব টুকু আদায় করে নেয়।"

তারপর তাঁকে দেখলাম তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের ছাত্র সভায়। সমস্ত বাংলার ছাত্র ছাত্রীদের হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি ছাত্র সমাজের সেই প্রণাম গ্রহণ করে আমাদের অভিনন্দন করলেন।

১৯৩৩ সনে রাজবন্দী হবার আগে অল্প কিছু দিনের জন্য মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলছি। এমন সময় খবর এল মেয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দামানে পাঠান হবে। দাদা কাগজে আন্দামানের বিরুদ্ধে লেখা, কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা প্রভৃতি নিয়ে খুব ব্যস্ত রইলেন। শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শান্তি নিকেতনে গেলাম বিশ্বকবির কাছে সব কিছু জানাতে। তিনি কিছু যদি করতে পারেন এই আন্দামান যাওয়া বন্ধ করার ব্যাপারে।

যাওয়া মাত্র আমাদের ডেকে পাঠালেন তাঁর সেই ঘরে যেখানে বসে লিখে চলেছেন তাঁর অমর সাহিত্য। সমস্তটা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন প্রথমটায়। "আমার দেশের মেয়েদের আন্দামানে পাঠাবে বৃটিশ সরকার? না এ আমরা কিছুতেই হতে দেব না।" তখুনি অমিয় বাবুর থেকে কাগজ নিয়ে নিজের কলম দিয়ে দুখানি তার লিখে দিলেন আমার হাতে। একখানি নীচে তুলে দিলাম তাঁর দেশবাসীরা দেখবে বলে।

C. F. Andrews
[illegible]
112 Gower Street
London

Please exert utmost influence in trying immediately to save Miss Bina Das from brutal punishment of transportation to the Andamans. Stop. Andaman Commission definitely reported against deportation of women prisoners. Stop. Have cabled personally to Lady Jackson.

Rabindranath Tagore

সেদিন প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে গল্প করলেন আমাদের সঙ্গে। বীণার কথাই বেশীভাগ। জেলে কি পড়ে—কিরকম ভাবে রেখেছে সব জানলেন। তাঁর গান কবিতা সাহিত্য আমাদের জেল জীবনের কত বড় সম্পদ সেকথা বলাতে মুখটা আনন্দে ভরে উঠল। শেষের দিকের কথায় একবার বললেন "বৃটিশ সরকার চিরদিন আমায় অবহেলা করে গেল— একবারও তার অতিথি করে নিলনা" বন্ধুবর উত্তর দিলেন—"হয়তো অতখানি সাহস রাখেনা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট"। পরে ওখানকার মেয়েদের কাছে সব গল্প শুনলাম। কনভোকেশন হলে বীণা যেদিন গভর্ণরকে গুলি করলো—কি এক উত্তেজনার ভেতরে না সেদিন তিনি রাত্রি কাটালেন। অনেক রাত্রি অবধি ঘুমুতে পারেননি—কোন কোন ছাত্রীকে দেখে প্রশ্ন করেছেন "পারবি তোরা ঐরকম সংহার মূর্ত্তি ধারণ করতে?" তারপর এই চিঠিটিও দিয়ে ছিলেন আমায়।



ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়াসু

দ্বীপান্তরবাসের দুঃখ থেকে কল্যাণীয়া বীণার বিমুক্তি পাওয়ায় আমার মন নিশ্চিন্ত হল। তাকে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিয়ো।

ইতি ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেক বছর পরে বীণা ও আমি যখন দুজনেই মুক্তি-লাভ করে বাইরে এসেছি—প্রিন্সিপ্যাল অনিল বাবুর মারফৎ জানতে পারলাম তিনি বীণাকে দেখতে চেয়েছেন। বাবাকে নিয়ে বীণা খোকা ও আমি শান্তিনিকেতনে গেলাম। তখন তিনি একটা বড় অসুখ থেকে উঠেছেন। বড় যেন শ্রান্ত। তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন "শুধু সংসারই করছ না দেশের সেবাও করছ"। অনিল বাবু উত্তর দিয়ে বললেন দুই করছেন। মন্দিরা পত্রিকা আরম্ভ করে তাঁর আশীর্ব্বাদ

দেয়ে পাঠিয়েছিলুম ও তিনি কবিতায় আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছিলেন সে কথা মনে করিয়ে দিলেন অনিল বাবু। বীণার সঙ্গে কিছুক্ষণ হেসে কথা বললেন। সেই তাঁর সঙ্গে পৃথিবীতে শেষ দেখা।

## মহাত্মাজীর সঙ্গে পরিচয়ঃ—

বালিকা বয়সে বীণার সঙ্গে মহাত্মাজীকে দেখতে গেছি। মা দিদিরা গিয়েছিলেন। বীণাকে কোলে বসিয়ে কত যে আদর করলেন। তারপর কলকাতা কংগ্রেসে তাঁকে দেখলাম। স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে প্রদর্শনীর দোকানে দাঁড়িয়ে আছি। হেসে আমাদের সঙ্গে অল্প দু' একটি কথা বলে চলে গেলেন। সঙ্গে ৺ কস্তুরীবাইও ছিলেন।

তারপর যখন আন্দামানে অনশন আরম্ভ হল আমরা যারা বাইরে এসেছিলাম তারা কমিটি করে আন্দোলন চালাতে লাগলাম। গান্ধিজীকে বাংলা দেশে এসে একটা ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলাম। উত্তরে তিনি এই চিঠিটি লিখলেন আমায়। বড় সযত্নে রেখে দিয়েছি এত বৎসর।

Dear Sister,

You are laying the burden on the wrong shoulder? I can only work in my own humble way. When I was in Bombay I discussed the matter with Indubhai's Baby. I have already given my opinion. That Kunga's strike is ill-advised & quite wrong. You will

serve the cause
better by pleading
with the Kisans
to give up the
hunger strike.
[illegible] yours sincerely
M K Gandhi
11/2/39

শেষ তাঁকে দেখলাম যখন ১৯৪৪ সনে বাংলার দুর্ভিক্ষের একটি বিবরণী নিয়ে তাঁর কাছে পুণার কিছুদূরে পাঁচগনীতে উপস্থিত হলাম। চিঠিতে যে সময় দিয়েছিলেন ঠিক সেই সময়ে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এক মিনিটের পরিবর্ত্তন হয়না তাঁর কর্মসূচির।

বাংলা দেশের অবস্থা সব শুনলেন—দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত যে ছবির এলবাম তৈরী করেছিলাম সেটি দেখলেন। মেদিনীপুরের জাতীয় সরকারের ইতিহাস শুনে বললেন—

"সমস্ত ভারতবর্ষে যদি এইরকম জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করতে পারা যেত।" নির্দ্ধারিত সময় চলে গেলে চরকা কাটতে বসলেন। তারপর ওখানকার অধিবাসীদের নিয়ে একটি সভা করলেন। সেই তাঁর সঙ্গে প্রথম কথা ও শেষ কথা।